ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪২০:২১

শিলাইদহ খোরশেদপুরের ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মন্দির
পূর্ব বাংলায় খাজা নাজিম উদ্দীনের শাসনকাল
বাংলার মুসলিম প্রশাসনে হিন্দু কর্মচারীদের অবস্থান
সুবা বাংলার কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোর বিন্যাস
নয়াবাদ মসজিদে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণির মোটিফ
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল উদ্ভবের প্রেক্ষাপট (১৯৬০-১৯৭২)
নারীর মর্যাদা সমুন্নীতকরণে 'মাহর'-এর ভূমিকা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট
হাসান আজিজুল হকের গল্পে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ
শওকত ওসমানের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ
বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ও প্রতিবাদী নারী
সেলিনা হোসেনের যুদ্ধ উপন্যাসে ইতিহাস ও নারী
বাংলা গীতিকবিতা ও আরবি কাসিদা
আইবিএস-এ নারী গবেষক: গবেষণার ধরন ও প্রকৃতি
বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা (১৯৯১-২০০১)
বাংলায় খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার (১৫০১-১৯৪৭)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
সংখ্যা ২১, ১৪২০

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
এম শহীদুল্লাহ্

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, একবিংশ সংখ্যা ১৪২০
প্রকাশকাল আগস্ট ২০১৪

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক
মো. জিয়াউল আলম
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫
ফোন: (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫
ফ্যাক্স: (০৭২১) ৭১১১৮৫

সম্পাদনা সহকারী
এস.এম. গোলাম নবী
উপ-রেজিস্ট্রার, আইবিএস, রা.বি.

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মুদ্রক
উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
গ্রেটার রোড, রাজশাহী। ফোন: ০৭২১-৭৭৩৭৮২

মূল্য
টাকা ১৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক
এম শহীদুল্লাহ্
প্রফেসর ও পরিচালক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক
সহযোগী অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

এম. জয়নূল আবেদীন
প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বরোচিষ সরকার
প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সুলতানা মোস্তাফা খানম
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সনজীব কুমার সাহা
প্রফেসর, মার্কেটিং বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খন্দকার ফরহাদ হোসেন
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তাফা কামাল
সহযোগী অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জাকির হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মো. কামরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগের ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ
ফোন: (০৭২১) ৭৫০৯৮৫
ই-মেইল: ibsru@yahoo.com

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালে সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে;
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে;
- বাংলা ও ইরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় অনুর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে;
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমএলএ, এপিএ এবং শিকাগো অথবা হার্ভার্ড স্টাইল অনুসরণ করতে হবে;
- প্রবন্ধের পরিসর ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুইকপি পাণ্ডুলিপি সফ্‌ট কপিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" এবং ইংরেজি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে Times New Roman/Tahoma। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ) অবশ্যই থাকতে হবে।

সূচিপত্র

মো. আতিয়ার রহমান	শিলাইদহ খোরশেদপুরের ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মন্দির	৭
মো. আ. লতিফ ভুঁইয়া	পূর্ব বাংলায় খাজা নাজিম উদ্দীনের শাসনকাল	২৯
মো. আমিরুল ইসলাম	বাংলার মুসলিম প্রশাসনে হিন্দু কর্মচারীদের অবস্থান: প্রেক্ষিত মোগল আমল	৫৭
মোহাম্মদ নাজিমুল হক	সুবা বাংলার কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোর বিন্যাস	৬৯
নূরুল আমীন	নয়াবাদ মসজিদে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণির মোটিফ	৮১
মোহাঃ রোকনুজ্জামান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল উদ্ভবের প্রেক্ষাপট (১৯৬০-১৯৭২) : একটি পর্যালোচনা	৯৩
সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন	নারীর মর্যাদা সমুন্নীতকরণে 'মাহর'-এর ভূমিকা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট	১১১
চন্দন আনোয়ার	হাসান আজিজুল হকের গল্পে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ	১২৩
মোরশেদুল আলম	শওকত ওসমানের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ	১৪৫
নূরে এলিস আকতার জাহান	বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ও প্রতিবাদী নারী	১৬৫
শামীম আরা	সেলিনা হোসেনের যুদ্ধ উপন্যাসে ইতিহাস ও নারী	১৮৫
মুহাম্মদ মতিউর রহমান	বাংলা গীতিকবিতা ও আরবি কাসিদা: একটি পর্যালোচনা	১৯৯
মোঃ মাহমুদ আলম	আইবিএস-এ নারী গবেষক: গবেষণার ধরন ও প্রকৃতি	২২১
মো. সুলতান মাহমুদ	বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা (১৯৯১-২০০১) : বিএনপি ওআওয়ামী লীগ সরকারের তুলনামূলক পর্যালোচনা	২৩৯
মোঃ আব্দুল হান্নান	বাংলায় খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার (১৫০১-১৯৪৭)	২৫৯

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

শিলাইদহ-খোরশেদপুরের ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মন্দিরঃ ইতিহাস ও প্রত্ন-স্থাপত্যিক সমীক্ষা

মো. আতিয়ার রহমান*

Abstract: Gopinath temple, one of the valuable antiquities of Kumarkhali under Kushtia district is an extant brick built structure of 'Dalan' style erected in the early eighteenth century. It consists of a flat roofed rectangular hall with a room at both sides and veranda in front, but distinguished from interior arrangement having 'chala'style. One of the earliest structures of single *Ratna* type of Gapinath temple named Gopinath Moth is still extant in ruinous condition. This temple is located on the south bank of Gopinath Dighi at the Khorshedpur bazar, about one kilometer away from the south of Tagore's Shilaidah Kuthibari. The contributions of Raja Ramkanta Roy and his wife Maha Rani Bhavani of Natore, Bhushana Raj Sitaram Roy and Tagore in constructing and repairing the temples are worth-mentioning.The mauseleum of Shah Makhdum Khorshed-ul-Mulk, a renowned sufi-saint and Islam preacher is adjacent to the temple. Now the temple stands with its original structure in the place meantioned. This paper aims at discussing the temple and other structures with its tradition, history and architectural features.

ভূমিকা

কুষ্টিয়া জেলার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মন্দির বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন। গোপীনাথ মন্দির নানা কারণে গৌরবময় ইতিহাসের অধিকারী। ভূষণার রাজা সীমারাম রায়, নাটোরের মহারাজা রামকান্ত রায়, মহারাণী ভবানী, কলকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর জমিদারগণ বিশেষত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্মৃতি-বিজড়িত গোপীনাথ মন্দির বাংলাদেশের স্থাপত্য ইতিহাসে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কুমারখালি উপজেলার দুই নম্বর শিলাইদহ ইউনিয়নভুক্ত ও বিশিষ্ট দরবেশ খোরশেদ উল-মুল্‌ক্[১] এর স্মৃতিধন্য খোরশেদপুর গ্রামের বাজার সংলগ্ন গোপীনাথ দীঘির দক্ষিণ পাড়ে মন্দিরটি অবস্থিত (চিত্র ১)। মন্দিরের প্রায় আধা কিলোমিটার উত্তরে শিলাইদহ কুঠিবাড়ির অবস্থান। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ দেবমূর্তির নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে গোপীনাথ মন্দির। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে

---

* ড. মো. আতিয়ার রহমান, প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

গোপীনাথবাড়ি নামে একটি কমপ্লেক্স গড়ে উঠে। বিশালাকার একটি দীঘি, দু'টি মঠ, দু'টি দোলমঞ্চ এবং পুরোহিত ও সেবকনিবাস, রন্ধনশালা-অতিথিশালার জন্য বহু কক্ষ, মন্দিরাঙ্গনের বেষ্টনী প্রাচীর ও একটি সুরম্য তোরণ সমন্বয়ে কমেপ্লেক্সটি নির্মিত। ভূষণার প্রজাহিতৈষী রাজা সীতারাম রায়, নাটোরের রাজা ও শিলাইদহের ঠাকুর জমিদারদের অবদানে কমপ্লেক্সটি নির্মিত হয়েছিল। জমিদার-রাজাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতায় গোপীনাথবাড়ি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি মৃতপ্রায়। এই ঐতিহাসিক প্রাচীন নিদর্শনটির জৌলুস আজ আর নেই। বিভিন্ন গ্রন্থে মন্দিরটি উল্লেখিত হলেও এর ইতিহাস ও স্থাপত্য বিবরণ সর্বত্রই অনুপস্থিত। অযত্নে-অবহেলায়, মনুষ্য উপদ্রব আর কালের আঘাতে এবং যথাযথ সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসের পথে ধাবমান গোপীনাথবাড়ির মূল্যবান প্রত্নসম্পদের ইতিহাস-স্থাপত্যের একটি ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ গ্রন্থিত হওয়া আবশ্যক। আলোচ্য প্রবন্ধ তারই প্রয়াস।

শিলাইদহ-খোরশেদপুর নামকরণ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম ও সাহিত্য সাধনার আদি তীর্থ শিলাইদহ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক গ্রাম ও ইউনিয়ন, যার অধীনে ঐতিহ্যবাহী খোরশেদপুর গ্রাম। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির প্রায় পাঁচশ' মিটার দক্ষিণে খোরশেদপুর গ্রামটি বৃটিশ আমলে জেলা ও থানা সৃষ্টির পূর্ববধি তিন নম্বর বিরাহিমপুর পরগণার অধীনে ছিল। শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও সদর কাছারির অবস্থান ছিল খোরশেদপুর গ্রামেরই উত্তর পাড়ায়। গ্রামের উত্তরে পদ্মা ও গড়াই নদীর সঙ্গমে বুনোপাড়ার কাছে নীলকর সাহেবদের একটি প্রাচীন কুঠিবাড়ি ছিল। সেকালে নীলকরদের এই কুঠি এলাকাই 'শিলাইদহ' বলে অভিহিত ছিল।[২] পাড়া এবং কুঠি দুটিই এখন পদ্মাবক্ষে বিলীন। শেলী নামক জনৈক নীলকর পদ্মার দহে নৌকাডুবিতে মারা যান। তারই নামে স্থানটির নাম 'শেলীর দহ', যার থেকে পরবর্তিতে পাড়ার নাম হয়ে যায় 'শিলাইদহ'। অথচ "শিলাইদহ অঞ্চলের প্রকৃত নাম– খোরশেদপুর, কশবা, হামিরহাট এ তিনটি মৌজা বা গ্রাম সরকারি দলিলপত্রে প্রচলিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের সাহিত্য সাধনার তীর্থস্থানরূপে শিলাইদহের নাম এতই প্রসিদ্ধ করে তুলেছেন যে, গ্রামের বা মৌজার আসল নাম যেন একদম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পোষ্ট-অফিসের নাম পর্যন্ত শিলাইদহ।"[৩] এই প্রসঙ্গে অমিতাভ চৌধুরী যথার্থই লিখেছেন, "আদি নাম খোরশেদপুর তলিয়ে গেছে ঐ পাড়ার নামে আড়ালে। আসলে কুঠিবাড়ি ও কাছারি বাড়ি নিয়ে শিলাইদহ পল্লী খোরশেদপুর গ্রামেরই অংশ।"[৪] বহুল প্রচলিত একটি জনবিশ্বাস মতে, খোরশেদ উল-মুল্‌ক নামক জনৈক সুফিসাধক কর্তৃক গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত- কখন তা কেউ জানে না; সম্ভবত মুঘল শাসনের সূচনা পর্বে। গ্রামে সাধকের দরগা আছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে তাঁর দরগায়। সাধক খোরশেদ উল্‌-মুল্‌কের নামানুসারে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছিল খোরশেদপুর। গ্রামের প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ এই দরগা। অনেক আগে থেকেই গ্রামের সর্বশ্রেণির অধিবাসিরা দরগায় এসে তাঁর জন্মোৎসব পালন করত, মানত করত, শিরনী

দিত। আজও এর প্রচলন আছে। এই মহান সাধকের দরগার শান্ত-স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দরগার উপর একটি পাকা বেদী নির্মাণ করে দরবেশের স্মৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৫] জমিদারি সূত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মতৎপরতার ফলে সমৃদ্ধ হয়েছিল শিলাইদহ ও খোরশেদপুর গ্রাম।

ঐতিহাসিক পটভূমি

গোপীনাথ মন্দির দুটি পর্যায়ে দুটি ভিন্ন শৈলীতে নির্মিত। প্রথম পর্যায়ের নিদর্শনটি এক-'রত্ন'[৬] শৈলীর এবং পরবর্তিটি নতুন 'দালান' শৈলীর মন্দির-শ্রেণীর অন্তর্গত। দুটি ইমারতই আঠার শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত। এই উভয় শ্রেণির মন্দিরস্থাপত্য পনের শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষোল শতকের মধ্যে উদ্ভূত বলে ধারণা করা হয়, যার চরম উৎকর্ষ ঘটে আঠার শতকের মধ্যে।[৭] এই সময়ে অর্থাৎ আধুনিক যুগে রত্ন-শৈলীর সাথে নতুন শ্রেণির 'দালান' মন্দির নির্মাণ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ফলে সতের শতক হতে ঊনিশ শতকের মধ্যে 'রত্ন, 'চালা', চাঁদনি কিংবা 'দালান' শৈলীর অজস্র মন্দির তৈরি হয়। এইজন্য কোন কোন দালান মন্দিরের লিপিতেও 'দালান' শব্দটি উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়।[৮] বাংলার চিরাচরিত মন্দির শিল্পের সারিতে এক নতুন শৈলীর সংযোজন এই 'দালান' মন্দির। শৈলীটির সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে ইউরোপীয় প্রভাবে এবং এর সমতল ছাদ 'রত্ন'-শৈলীর ক্রমনিম্ন বক্রপৃষ্ট-আচ্ছাদনের স্থলাভিসিক্ত হয়।[৯] প্রশস্ত আয়তনযুক্ত লম্বা হলঘর-তুল্য গর্ভগৃহ, সম্মুখে খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা এবং কড়ি-বরগার[১০] সাহায্যে নির্মিত সমতল ছাদ'র সাথে সরল ও ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা বাঁকা কার্নিশ দালান মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১১] তবে আধুনিক কালে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও 'সমতল ছাদ এবং সরল ও ক্ষেত্র বিশেষে সামান্য বাঁকা কার্নিশযুক্ত মন্দির সুপ্রাচীন গুপ্তযুগ থেকেই নির্মিত হয়ে আসছে।'[১২] অবশ্য, গুপ্তযুগে নব-উদ্ভূত মন্দির-স্থাপত্যের গোড়ার দিকে শুধুমাত্র 'দালান'ই ছিল দেব বিগ্রহের প্রধান অধিষ্ঠান বা গর্ভগৃহ।[১৩] কিন্তু আঠার ঊনিশ শতকে নির্মিত অসংখ্য দালান মন্দিরের গর্ভগৃহ ছিল সমতল ছাদযুক্ত প্রশস্ত আয়তনের লম্বা হলঘর, বিশেষ করে দূর্গা ও কালী মন্দিরগুলোর, এবং এর সামনের সংলগ্ন ঢাকা বারান্দা– এই দুটি অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এগুলোকে চণ্ডিমণ্ডপও বলা হোত।[১৪]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার[১৫] দালান মন্দিরকে 'একটি মাত্র কক্ষ বিশিষ্ট' বলে উল্লেখ করে থাকলেও এই শ্রেণির একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট মন্দিরের উদাহরণও বিরল নয়। বিশেষ করে, আলোচ্য গোপীনাথ মন্দিরসহ কুমারখালিতে বিদ্যমান মন্দির-স্থাপত্যের অধিকাংশই একাধিক কক্ষ-বিশিষ্ট 'দালান' মন্দির-শৈলীর অন্তর্গত।[১৬] গোপীনাথ মন্দিরটি আয়তকার নকশায় সমতল ছাদ, সামনে খিলানকৃত লম্বা বারান্দা বিশিষ্ট গর্ভগৃহ নিয়ে গঠিত। এর তিন কক্ষযুক্ত গর্ভগৃহটি অবশ্য বেশ প্রশস্ত আয়তনের। এরূপ মন্দিরকে সাধারণত 'দালান' মন্দির বলা হয়।[১৭] গোপীনাথ মন্দিরের অলঙ্করণে বিশেষত প্রবেশপথের শীর্ষস্থ চুন-বালি বা পলেস্তারা ভাস্কর্যও ইমারতটিকে দালান মন্দিরের পর্যায়ভুক্ত করে। পূর্বে মন্দির অলঙ্করণে চুন-বালির ব্যবহার জানা থাকলেও ইংরেজ আগমনের পর উপকরণটির বহুল

প্রচলন ঘটে এবং এতে সৃষ্ট সৌন্দর্য টেরাকোটা সজ্জার সমকক্ষতা অর্জন করে।[১৮] তবে মধ্যযুগের ন্যায় এই গোপীনাথ তথা আধুনিক যুগের মন্দিরেও পলেস্তারার সাথে সাথে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীযুক্ত টেরাকোটা বা পোড়ামাটির অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য এর পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছে। এইসব মন্দিরের নির্মাতা ছিলেন সমকালিন বাংলার ধনাঢ্য জমিদার ও ব্যবসায়ীরা। এইজন্য মন্দিরগুলো সাধারণত রাজা-জমিদারদের প্রাসাদ-সংলগ্ন ছিল। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সমসাময়িক বাংলায় নীল-কুঠিয়ালদের বাসভবন নির্মাণেও এই 'দালান' রীতির প্রভাব দেখা যায়। এই রীতির ইমারত নির্মাণের সুবিধা হ'ল– সীমিত সময়ে ও অর্থে এটি সমাধা করা সম্ভব হয়। এইজন্য আঠার শতক থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগে অধিক সংখ্যায় 'দালান' শৈলীর মন্দির নির্মিত হয়। দালান মন্দিরের বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করে গোপীনাথ মন্দিরকে এই রীতির মন্দির স্থাপত্যের সূচনাপর্বের নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা যায়। কাজেই দেবালয়টি মন্দির-স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তবে গোপীনাথবাড়ির এই পরবর্তি মন্দিরটি 'দালান' রীতির আন্তর্গত হলেও এর গর্ভগৃহের অভ্যন্তরের ছাদ সমতল না করে বাংলার চারচালা কুঁড়েঘর রীতির কৌশলে নির্মিত, যদিও বাইরের দিক হতে সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই অঞ্চলের 'দালান' মন্দির নির্মাণের বিচারে এই কুড়েঘর রীতির বৈশিষ্ট্যটি গোপীনাথ মন্দিরকে একটি বিশেষত্ব প্রদান করেছে। এছাড়া একটি-মাত্র কক্ষের পরিবর্তে একাধিক কক্ষের সমাবেশ ও সমতল কার্ণিশ নির্মাণে এর স্বাতন্ত্র্যতা রয়েছে। কাজেই শুধু ঐতিহাসিকভাবেই নয়, স্থাপত্যিক দিক হতেও স্বতন্ত্র ধারার দালান রীতির এই ইমারতটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুতরাং গোপীনাথ মন্দির কুমারখালিতে নির্মিত দালান মন্দিরগুলোর মধ্যে উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

১. গোপীনাথ মন্দিরের আদি ইতিহাস

কল্যাণ রায় কিংবদন্তিঃ রাজা সীতারাম রায়ের জমিদারি আমলের কথা। শিলাইদহের নিকটবর্তি ও পদ্মা তীরের কল্যাণপুর গ্রামের এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত তাঁতীর নাম ছিল কল্যাণ রায়। কল্যাণ রায় ছিলেন নিঃসন্তান ও বৈষ্ণব ধর্মমতের অনুসারী। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাশী থেকে রাধা-কৃষ্ণের একটি যুগলমূর্তি এনেছিলেন। আরেকটি পেয়েছিলেন কাশী রাজের নিকট থেকে।[১৯] এই দুটি যুগল মূর্তিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দু'টি মন্দিরে। বিগ্রহ পূজার মাধ্যমে সন্তানহীনতার দুঃখ ভুলে থাকর প্রয়াস পেয়েছিলেন কল্যাণ দম্পতি। বিগ্রহ দু'টির নাম রাখা হয়েছিল গোপীনাথ-গোপীরাণী এবং রাধানাথ-রাধারাণী।

কাশীর জগন্নাথ দেবের পূজা-পার্বনের বিধি অনুসারে কল্যাণ রায় রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ও স্নানযাত্রা সকল ধর্মীয় বিধি-রীতি পালন করতেন। কিন্তু কয়েক বছর পরই কীর্তিনাশা পদ্মার ভাঙনে তার অট্টালিকা ,ধনদৌলত ও মন্দির সবই ধ্বংস হয়ে যায়। কল্যাণ রায় কেবল বিগ্রহদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে খোরশেদপুর গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি একটি খড়ের ঘর তুলে বিগ্রহের পূজার্চনা করতে থাকেন।[২০] এমতাবস্থায় রাজা সীতারাম রায়[২১] জমিদারি পরিদর্শনকালে খোরশেদপুরে উপস্থিত হন। তিনি কল্যাণ রায়ের বিগ্রহভক্তি ও

ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে মঠ ও রন্ধনশালা নির্মাণসহ একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিয়েছিলেন বহু অর্থ ব্যয়ে। এই বৃহদাকার দীঘিটি আজও গোপীনাথ দীঘি নামে প্রসিদ্ধ। গোপীনাথ দেবের সেবা-পূঁজা নির্বাহের জন্য রাজা সীতারাম রায় এক হাজার টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তিও উৎসর্গ করেছিলেন।[২২] তিনি কারুকার্য মণ্ডিত প্রকাণ্ড একটি কাঠের রথও তৈরী করে দেন বিগ্রহের স্নান যাত্রার জন্য। রথে খোদিত সুন্দর কাঠের মূর্তিগুলো ছিল সমকালিন কাঠ খোদায় শিল্পের উলেখযোগ্য নিদর্শন।[২৩]

২. জমিদারি আমলে গোপীনাথ মন্দিরঃ সতের শতক থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ অবধি উপর্যুক্ত কয়েকটি জমিদারি আমলে খোরশেদপুর গ্রাম ও এর ঐতিহ্য-ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই সমৃদ্ধি ও খোরশেদপুরের প্রসিদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল গোপীনাথ দেবের মন্দির।

২.১ রাজা সীতারাম রায়ের কীর্তি:খোরশেদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের পৃষ্টপোষকতায় নির্মিত জীর্ণদশাগ্রস্ত একটি মঠ, একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত দোলমঞ্চ ও দীঘি ছাড়া প্রায় সকল কীর্তিই আজ বিলুপ্ত। সীতারাম কর্তৃক নির্মিত মঠদ্বয়ের একটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। বিশ-পঁচিশ বছর আগেও এর ধ্বংসাবশেষ দেখা যেতো বলে প্রত্যক্ষদর্শিদের নিকট হতে জানা যায়। বিলুপ্ত মঠের অবস্থান ছিল গোপীনাথ মন্দির-বাড়ির কেন্দ্রস্থলে ও বিদ্যমান মঠের প্রায় দশ মিটার উত্তরে। বিলুপ্ত মঠটির আসন যে পরিত্যক্ত ও বিদ্যমান মঠের ন্যায় বর্গাকার ছিল তা সহজেই অনুমেয়। মঠের বহির্গাত্রের ব্যাপক টেরাকোটা নক্শা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত বলে জানা যায়। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মঠের টেরাকোটা ফলক শিলাইদহের ঠাকুর জমিদার ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক নির্মিত গোপীনাথ মন্দিরবাড়ির তোরণ সজ্জিতকরণে ব্যবহৃত হয়েছিল। তোরণে বেশ কিছু নক্শা ভগ্নাবস্থায় আজও টিকে আছে। সীতারামের জমিদারি নাটোর রাজের হস্তগত হলে গোপীনাথ ও রাধানাথ বিগ্রহের জন্য বিদ্যমান দালান মন্দিরটি নির্মিত হয়। বিগ্রহ দু'টি নতুন মন্দিরে স্থানান্তরিত হলে প্রাচীন মঠ দু'টি পরিত্যক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

২.১.১ সীতারাম নির্মিত গোপীনাথ মঠঃ গোপীনাথ মন্দিরবাড়ির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই মঠটি কুমারখালি থানার পুরাকীর্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। নির্মাতার নামনুসারে এটি রাজা 'সীতারামের মঠ' নামে পরিচিত। তবে গ্রামের নামানুসারে বর্তমানে 'খোরশেদপুর মঠ' নামে অধিক পরিচিত। প্রায় তিন শ' বছরের প্রাচীন মঠটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় আদি কাঠামোসহ এখনও দন্ডায়মান। এর চূড়া, কোণ ও সম্মুখ ফাসাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। দীর্ঘকাল ধরে পরিত্যক্ত থাকায় এর উপরিভাগ গাছ-লতাপাতায় আচ্ছাদিত হয়ে ও মানুষের উপদ্রবে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়েছে (চিত্র ২)। সম্মুখ ফাসাদের পোড়ামাটির ফলকগুলোর কিছু চুরি হয়ে গেছে, কিছু ধ্বসে পড়ে নষ্ট হয়েছে।

মঠের আসন বর্গাকার এবং এর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট ৯ ইঞ্চি। পাতলা ইট ও চুন-শুরকি উপাদানে অত্যন্ত মজবুতভাবে ইমারতটি নির্মিত। মঠেরও দেয়ালের প্রশস্ততা প্রায়

৪ ফুট। কুমারখালিতে এত প্রশস্ত দেয়াল বিশিষ্ট স্থাপত্যের এটাই একমাত্র উদাহরণ। এর পূর্ব দেয়ালে করবেল্ড খিলান-বিশিষ্ট ৩ ফুট চওড়া একটি প্রবেশদ্বার আছে। করবেল্ড খিলান হিন্দু স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। খিলানটি প্রবেশদ্বারের উভয় পাশের কোণে সংযুক্ত অলংকৃত পোস্তাশীর্ষ হতে উত্থিত এবং এদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃশ্যমান। প্রবেশদ্বারটি ২টি আয়তাকার ফ্রেমে বেষ্ঠিত। ফ্রেমের অভ্যন্তর এবং দরজার উপরিভাগের দেয়াল প্রস্ফুটিত ফুলের টেরাকোটা ফলকে সজ্জিত ছিল– বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। দেয়ালের কোণগুলোও নকশাকৃত ছিল। দেয়ালের চারপাশের কার্নিশ ধনুকের ন্যায় বাঁকানো। এই কমনীয় বক্রাকৃতি মঠের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা বাংলার লোকায়ত চালাঘরের কর্নিশ হতে নীত।

মঠের ছাদ একটি গম্বুজ বিশিষ্ট শিখর বা চূড়া দ্বারা নির্মিত। অর্ধগোলাকার গম্বুজটি ভিতরের দিক থেকে স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে দেয়াল অভ্যন্তরের চারটি কৌণিক খিলানের উপরে। একরত্ন রীতির মন্দিরের এই গম্বুজ মুসলিম স্থাপত্যের একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ বা সমাধিসৌধের গম্বুজের আদর্শে নির্মিত। গম্বুজ নির্মাণের কৌশল হিসেবে করবেল্ড পান্দানতিফ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। গম্বুজের বহির্ভাগ বেষ্টন করে যে উঁচু শিখর বা চূড়া নির্মিত হয়েছে তা হিন্দু নির্মাণ-কৌশলের বিশেষত্ব। বর্তমানে এর শীর্ষভাগ ধ্বসে পড়েছে। চূড়াসহ মঠের বর্তমান উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। দেয়ালের প্রত্যেক বাহুতে ২টি করে অর্ধ-অষ্টভূজাকার সরু স্তম্ভ সংযোজিত আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় খিলানগুলো এই স্তম্ভ শীর্ষ থেকে উত্থিত। টেরাকোটা সজ্জায় সমৃদ্ধ ইমারতটির অলঙ্করণের পুরোটাই এর সম্মুখ ফাসাদ ও চারদিকের দেয়ালশীর্ষে কার্নিশের নিম্নভাগে উপস্থাপিত। টের‍্যাকোটা নক্শার মধ্যে ফুটন্ত ফুল ও কুঁড়ি, গাছ, লতা-পাতা উল্লেখ্যযোগ্য (চিত্র ৩)। মঠের অভ্যন্তর দেয়ালের খিলান নক্শা ব্যতিত সম্পূর্ণ নিরাভরণ।

ভূষণার রাজা সীতারাম রায় কর্তৃক আঠার শতকের সম্ভবত প্রথম দশকে মঠটি নির্মিত। মঠের কোন শিলালিপি না থাকায় এর সঠিক নির্মাণ তারিখ নির্ধারণ করা খুবই দূরূহ। তবে সীতারাম কর্তৃক তাঁর রাজধানী মোহম্মদপুরে নির্মিত অন্যান্য মন্দিরের তারিখ থেকে মঠের নির্মাণ তারিখ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সীতারাম রায় তাঁর প্রাসাদের নিকটস্থ লক্ষ্মীনারায়ণ পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে ১৬৯৯-১৭০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দশভূজার মন্দির নির্মাণ করেন। অতঃপর ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে কানাইনগর গ্রামের পঞ্চরত্ন মন্দির এবং ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে মোহম্মদপুরে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নির্মাণ করেন।[২৪] ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে সীতারাম মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন। কাজেই খোরশেদপুরস্থ মঠটি উক্ত মন্দিরগুলোর পরে এবং তাঁর বিদ্রোহের পূর্বে অর্থাৎ ১৮ শতকের প্রথম দশকেই নির্মিত বলে অনুমিত হয়।

২.১.২ দোলমঞ্চের ধবংশাবশেষঃ গোপীনাথ মন্দিরবাড়ির মধ্যে সীতারাম রায়ের আমলে একটি দোলমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। রাজা রামকান্ত রায় নির্মিত গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালের সন্নিকটেই এর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায় (চিত্র ৪)। বর্তমনে জঙ্গলাচ্ছাদিত

এই ধ্বংসাবশেষের উচ্চতা ৪৬ ফুট। দোলমঞ্চটি বর্গাকৃতি নকশায় তৈরী হয়েছিল। এর প্রতিটি বাহুর পরিমাপ ১৭ ফুট। মঞ্চে আরোহনের জন্য পূর্বপাশে নির্মিত সিঁড়ির অবশেষাংশও পরিদৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের আমলে শিলাইদহ-খোরশেদপুর রাস্তাটি এই দোলমঞ্চ ও গোপীনাথবাড়ির তোরণের সামনে দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। এই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হ'ত গোপীনাথ দেবের দোল উৎসব। দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে খোরশেদপুরে জাঁকজমকপূর্ণ মেলা বসতো। শিলাইদহ জমিদারী আমলে ঠাকুর পরিবারের লোকেরাও মেলা দেখতে আসতেন।[২৫]

২.১.৩ গোপীনাথ দিঘি: রাজা সীতারাম রায় কর্তৃক খনিত বিশার গোপীনাথ দীঘি খোরশেদপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই প্রকাণ্ড দীঘিটি গোপীনাথবাড়ির উত্তর প্রাচীরের ১৫/২০ ফুট দূরে অবস্থিত। এটা গোপীনাথ পুকুর নামেও পরিচিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দীঘিটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২৮৫ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৮৫ ফুট। দীঘিটি এখনও গোপীনাথ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.২ নাটোর জমিদারি ও গোপীনাথ মন্দির: ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে খোরশেদুপর নাটোর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন নাটোর জমিদারির অধিকর্তা ছিলেন রাজা রামজীবন।[২৬] স্বাভাবিকভাবেই গোপীনাথ দেব মন্দির ও দেবেত্তর সম্পত্তিতে নাটোর রাজাদের সেবাইত প্রতিষ্টিত হয়। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাটোর রাজের সেবাইত স্থায়ী হয়েছিল। নাটোর রাজগণ ধর্মানুরাগী ছিলেন। লৌকিক স্থাপত্য ও ধর্মশালা নির্মাণে তাদের বিশেষতঃ মহারাণী ভবানীর মন্দির নির্মাণের প্রসিদ্ধি কিংবদন্তিতুল্য। এক্ষেত্রে তিনি সমকালিন জমিদার-রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারি ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। এখানে সে প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করলে বিষয়টি উপলব্ধিতে সহায়ক হতে পারে। জমিদারি এলাকা ছাড়াও মুর্শিদাবাদের বড়নগর, কাশিধাম ও বেনারস তাঁর নির্মিত ধর্মশালা ও মন্দির স্থাপত্যের বিশিষ্ট কেন্দ্র। বগুড়া জেলার জয়দূর্গা মন্দির ও দ্বাদশদারি মন্দির, নাটোরের ভবানীশ্বর মন্দির, রাজ-রাজেশ্বরীর মন্দির, মদন গোপাল মন্দির, চারবাংলা মন্দির, কিরিটেশ্বরী মন্দির এবং কাশীধামের কালী মন্দির (১৬৬০ খ্রি.), শতচূড়া মন্দির (১৭৭০ খ্রি.) ছাড়াও 'ভবানীর ব্রহ্মপুরী'[২৭] নিদর্শনাদির নাম উলেখযোগ্য। উপরন্ত, তিনি হিন্দু ধর্মের অন্যতম তীর্থভূমি একমাত্র বেনারসেই ৩৮০টি মন্দির, অতিথিশালা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তাছাড়া যশোর অঞ্চলে ভূষাণা রাজ সীতারাম নির্মিত বহু মন্দিরের তিনি সংস্কার সাধন করেন।[২৮] এর থেকে খোরশেদপুরের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে মহারাণী ভবানীর অবদান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গোপীনাথ দেবের বিগ্রহ মন্দির, স্নান মন্দির এবং স্নানযাত্রার উৎসব ও মেলা মহারাজা রামকান্ত রায় ও তদীয় পত্নী মহারাণী ভবানীর স্থাপত্য নির্মাণ, ধর্ম ও সংস্কৃতি সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিম্নে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

২.২.১ গোপীনাথের মন্দির নির্মাণ

বিদ্যমান গোপীনাথের মন্দিরটি নাটোর রাজের কীর্তি। মন্দির সংযুক্ত একটি টেরাকোটলিপির (চিত্র ৫) বরাত দিয়ে 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস' প্রণেতা শ. ম. শওকত আলী উল্লেখিত ১৬৫৭ শকাব্দ মোতাবেক ১৭৩৫ খিস্টাব্দে নাটোরের মহারাজা রামন্তা রায় কর্তৃক মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।[২৯] রামকান্ত পত্নি রাণী ভবানী কল্যাণ রায়ের বিগ্রহদ্বয়কে একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন[৩০] বলে কথিত আছে। সম্ভবত তাঁর অনুরোধেই স্বামী মহারাজা রামকান্ত রায় মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। গোপীনাথবাড়ির প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচীন মঠের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত মন্দিরটি মূল কাঠামো নিয়ে আজও দণ্ডায়মান (চিত্র ৬)। মন্দির নির্মাণের পর এখানে গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয় বিধায় মন্দিরের নাম গোপীনাথ। গোপীনাথের যুগল মূর্তি দুটির ভগ্নাংশ বর্তমানে কুষ্টিয়া পৌরসভা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার কারণে আর যুগল অবস্থায় নেই- চারটি পৃথক মূর্তিরূপে সংরক্ষিত হয়েছে (চিত্র ৭)। মন্দিরে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে গোপীনাথ পূজা অনুষ্ঠিত হ'ত। বর্তমানেও গোপীনাথ পুঁজা চালু আছে; কিন্তু সেই জাঁকজমক আর নেই।

উত্তরমুখি মন্দিরের আসন আয়তাকার (চিত্র ৮) ও ভিত প্রায় ০৩ ফুট উঁচু। এর বাহ্যিক পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫ ফুট এবং উত্তর দক্ষিণে ২৫ ফুট। মন্দিরের দেওয়ালগুলো ০২ ফুট পুরু এবং কার্ণিশ পর্যন্ত উচ্চতা ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। মন্দিরের অভ্যন্তর তিনটি কক্ষ এবং সম্মুখে একটি বারান্দা দিয়ে গঠিত। বারান্দা ও উত্তর ফাসাদে সমাকৃতির পাঁচটি খিলানপথ আছে। খিলানগুলো কৌণিক ও এদের সম্মুখভাগ বহুখাঁজ খিলান নক্শায় শোভিত। খিলানসমূহ নক্শাকৃত চতুষ্কোণ স্তম্ভশীর্ষ হতে উত্থিত।। স্তম্ভগুলো বৌদ্ধ স্থাপত্য শৈলী দ্বারা প্রভাবিত। প্রতিটি খিলান আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। মধ্যভাগে তিনটি খিলানপথকে পুনরায় একটি আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে এবং এটাই মন্দিরের ত্রিখিলান বিশিষ্ট প্রধান প্রবেশপথ। এর উভয় পাশের খিলান দুটি বন্ধ এবং এদের কোণে গোলাকৃতি পোস্তা সংযোজিত আছে। বারান্দার দক্ষিণ পাশে উত্তর-দক্ষিণে আয়তাকার কক্ষটি মন্দিরের গর্ভগৃহ। এর উত্তর দেয়ালে বারান্দার কেন্দ্রীয়পথ বরাবর একটি দরজা ও দক্ষিণ দেয়ালে দু'টি জানালা আছে। এছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের একটি করে দরজা দিয়ে ভোগকক্ষে ও শয়নকক্ষে প্রবেশ করা যায়। কক্ষের দরজাগুলো খিলানের পরিবর্তে সর্দলের সাহায্যে নির্মিত। পশ্চিম পাশের শয়নকক্ষটি বর্গাকার। এর দক্ষিণ দেয়ালে একটি জানালা ও পশ্চিম দেয়ালে একটি দরজা আছে। গর্ভগৃহের পূর্বদিকের আয়তাকার কক্ষটি দেবতার ভোগকক্ষ হিসেবে পরিচিত। কক্ষটি উত্তর-দক্ষিণে ২১ ফুট দীর্ঘ এবং ৭ ফুট প্রস্থ। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিদিন এখানে আড়াই মণ চাউলের ভোগ রান্না হ'ত। ভোগ কক্ষের পূর্ব দেয়ালের মধ্যভাগ একটি দরজা ও একটি জানালা এবং দক্ষিণ দেয়ালে আরও একটি জানালা রয়েছে। সমগ্র মন্দিরটি পস্তোরা আস্তরণে ঢাকা। মন্দিরের ছাদ সমতলভাবে নির্মিত; কিন্তু অভন্তরভাগে তা চারচালা কুঁড়েঘর আকৃতির। ছাদের উপর দেয়ালের চারদিকে ০২ ফুট বর্ধিত কার্ণিশ ও প্রায় ০৩ ফুট উঁচু প্যারাপেট আছে। ভিত ও

প্যারাপেটসহ মন্দিরের মোট উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট। মন্দিরের বারান্দা ও ভিতরের মেঝে পাকা।

অলঙ্করণ

গোপীনাথ মন্দিরের আকর্ষণীয় অললঙ্করণ সজ্জার দুটি মাধ্যম- পলেস্তারাকৃত প্যানেল ও টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলক। অভ্যন্তরভাগের অলঙ্করণ বলতে গর্ভগৃহের দেয়ালের বড় বড় প্যানেল। মন্দিরের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালের বহির্গাত্রও বৃহাদাকার প্যানেল নক্শায় বিভক্ত প্যানেলগুলোর বেশিরভাগ লম্বভাবে বিন্যস্ত। অলঙ্করণে সিংহভাগ রয়েছে মন্দিরের সম্মুখ ফাসাদে– এখানে প্যানেল নক্শা আর নানারূপ অলঙ্করণ বিশিষ্ট ট্যারাকোটা ফলক উভয় মাধ্যমই। কার্নিশের নিম্নে ও খিলানপথের উপরে রয়েছে তিনি সারি প্যানেলের সজ্জা। সর্বোপরের ক্ষুদ্র ও আয়তাকার প্যানেলের একটি সারি দেয়ালের চারপাশ বেষ্ঠন করে উপস্থাপিত। এর নিম্নসারির প্যানেল বর্গাকার ও দ্বিস্তরে নির্মিত। সর্বনিম্ন সারির প্যানেল বড় ও আয়তাকার এবং আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত। ফাসাদের খিলানধৃত বৃহদাকার প্যানেলগুলোও দ্বিস্তরে নির্মিত। মন্দিরের এই নক্শা বিযুক্ত প্যানেল অলংকরণ মসজিদ স্থাপত্য অলঙ্করণের প্রভাব, যা বাংলার ঐতিহ্যবাহী চালা বা কুঁড়ে ঘরের বেড়া হতে গৃহীত। প্রতিটি খিলান ফ্রেমের উভয় পাশের এক সারি করে আয়তাকার প্যানেল লম্বভাবে তৈরি। মধ্যবর্তি খিলানত্রয়ের পার্শ্বস্থিত প্যানেল সারিগুলো নক্শাকৃত স্তম্ভশীর্ষ হতে উপরের দিকে খিলান-ফ্রেম অবধি প্রসারিত। কিন্তু পার্শ্ববর্তি খিলানপথ দুটির উভয় পাশের প্যানেল সারি মেঝে থেকে কার্ণিশের নিচের বর্গাকার প্যানেল সারি পর্যন্ত বিস্তৃত। প্যানেলসমূহ রোজেট বা প্রস্ফুটিত গোলাপ, সূর্যমুখি, পুষ্পাদান হতে উত্থিত ফুল ও ফলের গাছ ও কলস নক্শা বিশিষ্ট ফলকে সজ্জিত। কলস নক্শাটি উপর-নিচে জোড়ায় জোড়ায় তৈরি একটি হতে অপরটিতে তরল পদার্থ ঢালার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। স্তম্ভগাত্রের ভাসমান পদ্ম, রোজেট ও জীবজন্তুর নক্শা অদ্যাবধি অক্ষত আছে। মধ্যস্থিত সম্ভ দু'টির পাদদেশ বা স্তম্ভমূল হাতীর সওয়ার বাঘ এবং বাঘের সাথে সিংহ কিংবা ঘোড়ার লড়াই ও রোজেট নক্শা বিশিষ্ট টেরাকোটা ফলকে শোভিত (চিত্র ৯)। ফাসাদের সর্বশেষ খিলান পথদ্বয়ের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে খিলানপথ সমান দু'টি বদ্ধ খিলান প্যানেল আছে। এর অভ্যন্তরে একটি উলম্ব আয়তাকার প্যানেলের মধ্যভাগের টেরাকোটা নক্শাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এটাতে হিন্দুদের ধর্মীয় ও রোমান্টিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। একটি বিশাল বৃক্ষ-চূড়ায় বংশীবাদক কৃষ্ণ ও বৃক্ষের নিচে কলসী কাঁকে গোপী নারীদের দৃশ্য লক্ষণীয়। এই প্যানেল দু'টির পূর্ব ও পশ্চিম দিকের আড়াআড়ি প্যানেলের সর্বনিম্ন সারি ফুল-পাতা বিশিষ্ট প্যাঁচানো লতায় শোভিত ও পস্তোরায় তৈরি। পলেস্তারা নক্শার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অলঙ্করণ দৃশ্য রয়েছে কেন্দ্রিয় খিলানপথের শীর্ষে ও ত্রিকোণাকার ভুমিতে। শীর্ষে ফুল, লতা-পাতা আর ত্রিকোণাকার ভূমির বক্ষ-বিবসনা উড়ন্ত পরীর দৃশ্য ভগ্নাবস্থায় এখনও টিকে আছে (চিত্র ১০)। তবে বহু সংস্কারের আঘাতে এদের মোহনীয় আদি রূপটি এখন আর নেই। এছাড়া প্রতিটি খিলান মুখের বহুখাঁজ নক্শা মন্দিরের

সৌন্দর্য বর্ধনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রিয় খিলানের খাঁজসমূহ বহুস্তর এবং অন্যান্য খিলানের খাঁজগুলো দ্বিস্তর ও পাতা নক্শা বিশিষ্ট।

২.২.২ গোপীনাথ বিগ্রহ

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, খোরশেদপুর গোপীনাথ মন্দিরের মূর্তিগুলো বর্তমানে কুষ্টিয়া শহরস্থ পৌর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। প্রাথমিক অবস্থায় গোপীনাথ দেবের দুটি যুগলমূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হতে থাকলেও এখন আর সেগুলো অনুরূপ অবস্থায় নেই। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাক-হানাদার বাহিনী এই মূর্তিদ্বয়ের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কাজেই, জাদুঘরে সংরক্ষিত মূর্তিগুলো আদি গোপীনাথ বিগ্রহের ধ্বংসাবশেষ– বিচ্ছিন্নভাবে চারটি ভগ্ন-মূর্তিতে রূপান্তরিত। পাক-বাহিনী এই মূর্তিগুলো ধ্বংসের পর পার্শ্ববর্তী গোপীনাথ দীঘিতে ফেলে দেয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট লোক-লালন গবেষক প্রফেসর আনোয়ারুল করিম এই বিগ্রহের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করে উক্ত জাদুঘরে প্রদান করেন। মন্দিরের এই বিগ্রহ জাদুঘরে স্থানান্তরিত করায় খোরশেদপুরের স্থানীয় মানুষ প্রফেসর করিমকে দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু তাঁর এই কাজটি অতি সুদূর প্রসারী ও মহৎ বলে বর্তমান গবেষক মনে করেন। অন্যথায়, এতদিনে যে মূর্তি হরণকারীদের দ্বারা এগুলো পাচার হয়ে যেত, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আলোচনার সুবিধার্থে বিগ্রহগুলোকে প্রথমত: বড় এবং ছোট এই দুটি শ্রেণিতে বিন্যাস করা যেতে পারে। বড় দুটির একটি স্থূল, অপরটি ক্ষীণ। স্থূল মূর্তিটির দুই হাত কব্জির নিকট হতে ও ডান পা হাঁটু থেকে ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্ন অংশগুলো পাওয়া যায়নি। কালো রঙের গ্রানাইট শিলার এই মূর্তিটি বংশীবাদক ভঙ্গিতে ০২ ইঞ্চি উঁচু একটি বেদীর উপর দণ্ডায়মান। বেদী ছাড়া এর উচ্চতা ১৭.১/৩ ইঞ্চি। এর কোটি ও নিতম্বের মাপ যথাক্রমে ১০.১/২ ইঞ্চি ও ১৫.৪ ইঞ্চি। হানাদার বাহিনীর হাতে এটি সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধবংশপ্রাপ্ত মূর্তির টুকরাগুলো জোড়া দিয়ে বর্তমানরূপে সংরক্ষিত হয়েছে। এর ডানহাত কব্জি ও কনুই-এর মাঝ থেকে, বামহাত কব্জির নিচ থেকে, ডান-পা হাঁটুর নিচ থেকে ও বাম-পা গোড়ালীর উপর থেকে ভাঙা। ক্ষীণাকৃতির মুর্তিটি ১৫.১/৪ ইঞ্চি দীর্ঘ। এটি বংশীবাদাক ভঙ্গিতে ১.১/৫ ইঞ্চি উঁচু বেদীর উপর স্থাপিত। এর কোটি ও নিতম্বের মাপ যথাক্রমে ৮.১/২ ইঞ্চি ও ১০ ইঞ্চি। ক্ষতিগ্রস্থ মুর্তির ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে ভেঙে হারিয়ে গেছে। বাম-পাও গোড়ালীর উপর হতে ভাঙা, তবে ভগ্নাংশটি সংগ্রহ করে জোড়া দেয়া হয়েছে।

ছোট আকৃতির যুগল বিগ্রহটি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ। বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় নারকীয় পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে এর উপর। যুগল অবস্থা থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই করা হয়নি, হাত-পা-মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই বিগ্রহদ্বয়ের একটি কিছুটা বড় ও স্থূল প্রকৃতির এবং অপরটি সামান্য ছোট ও ক্ষীণাকৃতির। এদের মধ্যে স্থূলাকৃতির মূর্তিটি

অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। এর হাত-পা-মাথা-বেদী কিছুই নেই। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সংরক্ষিত অবশিষ্ট অংশটুকুর উচ্চতা ০৭ ইঞ্চি। বংশীবাদক ভঙ্গির এই মূর্তির কোটি ও নিতম্বের পরিমাপ যথাক্রমে ০৬ ইঞ্চি ও ০৮.১/২ ইঞ্চি। মূর্তিটির মাথা গলা হতে, ডান ও বামহাত যথাক্রমে বাজু ও কব্জি হতে এবং পা দুটি গোড়ালীর উপর হতে বিচ্ছিন্ন। এই যুগলের ছোট ও ক্ষীণাকৃতির মূর্তিটিও বংশীবাদক ভঙ্গির এবং পূর্বোক্তটি অপেক্ষা কম ক্ষতিগ্রস্থ। এর মাথা আছে, কিন্তু বেদী নেই। এছাড়া ডান ও বামহাত যথাক্রমে কব্জি ও বাজু হতে এবং পা দুটি গোড়ালীর উপর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে। পরবর্তিতে আর সংগ্রহ করা সম্ভব হযনি। সংরক্ষিত ভগ্ন-মূর্তিটির উচ্চতা ০৯ ইঞ্চি। এর কোটি ও নিতম্বের মাপ যথাক্রমে ০৬ ইঞ্চি ও ০৭.১/৪ ইঞ্চি।

২.২.২ গোপীনাথের স্নান মন্দির

গোপীনাথ দেবের স্নানের নিমিত্তে নাটরের জমিদার মহারাণী ভবানী মন্দিরটি নির্মাণ করেন। যতদুর জানা যায়, কুষ্টিয়া অঞ্চলে এই রীতির মন্দির স্থাপত্যের এটাই একমাত্র উদাহরণ। মন্দির কমপেক্সের বাইরে প্রায় আড়াই শ' গজ পশ্চিমে গোপীনাথ ঠাকুরের স্নান মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। সম্প্রতি ছাদ ভেঙে পড়ায় মন্দিরটি ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছে। এটি দু'চালার মন্দির নামেও পরিচিত। গোপীনাথ পূজার সময় মূল মন্দির থেকে বিগ্রহটিকে এনে এখানে স্থাপন করে দই দিয়ে স্নান করানো হত। এই উপলক্ষে গোপীনাথের স্নানযাত্রা উৎসব অত্যন্ত জাঁকজামক সহকারে পালিত হ'ত। পাকিস্তান আমলে উৎসবটি বন্ধ হবার পর থেকে পরিত্যক্ত এই বিরল স্থাপত্য কর্মটি দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। গোপীনাথ মন্দির কমিটি এর ছাঁদটি স্থানীয়ভাবে পূর্ননির্মাণের প্রচেষ্ট চালাচ্ছে। তবে এর আদি স্থাপত্য শৈলী রক্ষার বিষয়টি তাদের জ্ঞান বহির্ভূত।

স্থাপত্যিক বিবরণ

মন্দিরটি অষ্টকোণ ভূমি পরিকল্পনায় ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু একটি ভিতের উপরে নির্মিত। ভিত্তি বেদীর উপরিভাগের পরিমাপ $২১^{১}/_{২} \times ২১^{১}/_{২}$ ফুট। ভিতের প্রতি কোণে স্থাপিত গোলাকার স্তম্ভের উপরে ন্যাস্ত ছাদটি সমতলভাবে কড়ি-বরগার সাহায্যে নির্মিত। মন্দিরের স্তম্ভমূল চতুষ্কোণ। দেয়ালবিহিন এই ইমারতটিকে একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপত্য বলা যায় (চিত্র ১১)। এর পাকা মেঝের কেন্দ্রস্থলে আয়তাকার বিগ্রহ-বেদীটি এখনও অক্ষত আছে। এর উপরেই গোপীনাথের মূর্তি রেখে স্নান করানো হ'ত। মন্দিরে আরোহণ এবং বিগ্রহ উঠানো-নামানোর জন্য পূর্ব দিকে দুটি সিঁড়িপথ রয়েছে। হাতীর মাথার নক্শাকৃত বিশালকার সিঁড়িটি কেবল গোপীনাথের বিগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। মন্দিরগাত্র পলেস্তারা আস্তরণে ঢাকা। গঠন বৈশিষ্ট্যে গোপীনাথের স্নান মন্দিরটি নান্দনিক। সম্ভবত গোপীনাথ মন্দিরের বেশ কিছুকাল পরে এটি নির্মিত হয়েছিল।

২.৩ ঠাকুর জমিদারি ও গোপীনাথ মন্দির

মহারাণী ভাবনীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সময়ে বিরাহিমপুর পরগাণাভুক্ত খোরশেদপুর কলকতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারির অধীনে চলে যায়। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রামলোচন ঠাকুর উক্ত পরগণা নিলামে খরিদ করে ঠাকুর জমিদারিভূক্ত করেন।[৩১] জমিদারি সূত্রে ঠাকুর জমিদারগণ খোরশেদপুর গোপীনাথ মন্দিরের সেবাইত লাভ করেন। ঠাকুর জমিদারি পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপিত হয় খোরশেদপুর সংলগ্ন ও মৌজাভুক্ত ঐতিহাসিক শিলাইদহে। শিলাইদহ জমিদারি পরিচালনায় প্রিন্স দারকানাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের হয়েও তাঁরা যথারীতি গোপীনাথ বিগ্রহের পূজার্চনা চালাতেন এবং পূজার্চনার ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ষিক তিন হাজার টাকা প্রদান করতেন।[৩২] দেব সেবায় অবশ্য জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। কেবল দেব সেবাতেই নয়, মন্দিরবাড়ির সংস্কার ও তোরণ নির্মাণ স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের[৩৩] এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই নতুন স্থাপনাটির নক্শা এঁকেছিলেন ইংরেজ কৃষি প্রকৌশলী লিওনার্দো নাইট এল্‌ম্‌হার্ষ্ট।[৩৪]

২.৩.১ মন্দিরবাড়ির তোরণ নির্মাণ ও সংস্কার

এল্‌ম্‌হার্ষ্ট অঙ্কিত নক্শা অনুসারে রাজা সীতারাম নির্মিত গোপীনাথ মন্দিরের (মঠ) কারুকার্যময় ইট দ্বারা তৈরি হয় মন্দির বাড়ির প্রধান ফটক (চিত্র ১১)। গোপীনাথ মন্দির কমপেক্সের সর্বাপেক্ষ আকর্ষণীয় ইমারত এই তোরণ শিলাইদহ ঠাকুর জমিদারির অন্যতম বিদ্যমান নিদর্শন। মনোরম অলঙ্করণ-শোভিত দীর্ঘ ও সুউচ্চ খিলানপথ এবং দুপাশে বিন্যস্ত অনেক কক্ষযুক্ত এই তোরণ একটি স্বতন্ত্র স্থাপত্যের মর্যাদায় উন্নীত। 'শান্তিনিকেতন, স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে যথার্থই বর্ণিত হয়েছে, গোপীনাথ মন্দিরের তোরণদার "... ছিল সুন্দর ও বিশিষ্ট স্থাপত্য শৈলীর। দীর্ঘায়িত, ইটের খিলান-এর উপর, নহবত মঞ্চের ধাঁচে, তিন চালা খিলানের ডিজাইন গ্রামের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করেছিল। বাংলার পোড়ামাটির মন্দির স্থাপত্যের মতন, স্তম্ভশ্রেণী- সঙ্গে খিলান-ঢেউ এর বিস্তার, আর মধ্যিখানে উচ্চতলে তোরণদ্বার- এক কথায় উপভোগ্য স্থাপত্য বিন্যাস ও সৃষ্টি।"[৩৫] জরাজীর্ণ অবস্থায় তোরণটি এখনো আদি কাঠামো নিয়ে টিকে আছে। তোরণপথের ছাদটি ধ্বসে পড়েছে ও সম্মুখের টারাকোটা সজ্জার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং এর উত্তর বাহু প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। দক্ষিণ বাহুটি অনেকেটা ভাল আছে ও ব্যবহৃত হচ্ছে। পাকা ইট, চুন-শুরকি ও কাঠের কড়ি-বরগা দ্বারা সুউচ্চ তোরণ স্থাপত্যটি মন্দির কমপেক্সের পশ্চিম পাশ জুড়ে নির্মিত। তোরণের স্থাপত্য সৌন্দর্য এখনও পথচারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশাল অর্ধগোলাকার খিলানের সাহায্যে নির্মিত তোরণপথের দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ৩৭ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণের প্রশস্ততা ১০ ফুট। পশ্চিম দিকে প্রবেশ মুখের খিলানটি তিনস্তরে নির্মিত ও আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। খিলানমুখ, স্প্যানড্রিল, ফ্রেম ও খিলানের দুপাশের দেয়াল টেরাকোটা ফলকে সজ্জিত। ফলকসমূহ প্রস্ফুটিত গোলাপ,

লতাপাতা, ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও ফলের গাছ প্রভৃতি নক্‌শা বিশিষ্ট (চিত্র ১৩)। তোরণের অলঙ্করণ সজ্জার সাথে নিকটস্থ মঠের অলঙ্করণের হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে, কেননা ধ্বংসপ্রাপ্ত অপর মঠটির টেরাকোটা ফলকই এর অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়েছিল। তোরণের সমতল ছাদের উপরে বিন্যস্ত তিনটি কৌণিক খিলান বিশিষ্ট উন্মুক্ত খিলানসারিটি তোরণের গুরুত্বপূর্ণ আলঙ্কারিক বিশেষত্ব। উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত খিলানসারির মধ্যবর্তি খিলানটি বৃহদাকার এবং পার্শ্বদ্বয়ের খিলান দু'টি সমাকৃতির। খিলানগুলো চারটি খর্বাকৃতির চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপরে ন্যস্ত এবং এদের শীর্ষদেশ প্রস্ফুটিত পদ্ম নক্‌শায় শোভিত। তোরণের পূর্ব মুখের খিলানটিও একই পরিমাপের ও অর্ধগোলাকার। কিন্তু এটা স্তরবিহিন বা এক বলয়ে নির্মিত। এর উপরিভাগ একটি গ্রিক পেডিমেন্ট নক্‌শায় শোভিত। বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের স্থাপত্যে ত্রিকোণাকার পেডিমেন্ট নক্‌শা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। তোরণপথের ছাদের উপরিভাগের উত্তর ও দক্ষিণ পাশ অর্ধগোলাকৃতি খিলান নক্‌শা বিশিষ্ট প্যারাপেটে শোভিত।

তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ বাহু

তোরণটি উত্তর এবং দক্ষিণ বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৭০ফুট এবং ৮৫ ফুট। উভয় বাহুর সম্মুখভাগে (পশ্চিম) ৪টি করে বিশাল কিলাকৃতির খিলান বিশিষ্ট বারান্দা আছে। বারান্দার খিলানগুলো গোলাকার স্তম্ভশীর্ষ হতে উত্থিত। প্রতিটি বারান্দার দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট। উত্তর বাহুর উত্তর পাশে দু'টি ও দক্ষিণ পাশে তোরণপথ সংযুক্ত করে একটি বর্গাকার কক্ষ এবং মধ্যভাগে বারান্দাযুক্ত একটি আয়তাকার হলকক্ষ আছে। উত্তর বাহুর অভ্যন্তরীণ কক্ষবিন্যাসে কিছুটা পার্থক্য আছে। এর মধ্যভাগের হল কক্ষটি পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে যুক্ত ৩টি করে প্রবেশপথ দ্বারা উন্মুক্ত। হলকক্ষের পূর্ব পাশে একটি দরদালান এবং দক্ষিণ পাশে তোরণপথ যুক্ত একটি ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বর্গাকার কক্ষ আছে। এছাড়া দরদালানের উত্তর পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষের সিঁড়িপথের মাধ্যমে তোরণের ছাদে আরোহণ করা যায়। তোরণপথের উভয় বাহুর বর্গাকার কক্ষগুলো একাধিক দরজা ও জানালা বিশিষ্ট। দক্ষিণ বাহুর দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কক্ষের একটিমাত্র দরজায় ও জানালাহীনতায় কেবল ব্যতিক্রম আছে। উভয় বাহুর ছাদ কড়ি-বরগার সাহায্যে সমতলভাবে নির্মিত। দক্ষিণ বাহুর ছাদ ও পূর্বদিকের খিলানগুলো ধ্বসে পড়েছে এবং নিম্নাংশের কাঠামোটিও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। তবে উত্তর বাহুর কাঠামোটি ক্ষতিগ্রস্থরূপে আজও টিকে আছে।

রবীন্দ্রনাথ তথা ঠাকুর জমিদারি পর্বে খোরশেদপুরে কেবল নতুন স্থাপনাই তৈরী হয়নি, দেবমন্দিরসহ গোপীনাথ বাড়ির ব্যাপক সংস্কারও সাধিত হয়। অতিথি সেবার জন্য এর রন্ধনশালা, অতিথিশালা এবং কাছারিও সংস্কার করে ভগ্নদশা থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।[৩৬] ১৩৩০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের মেঝে সংস্কার করা হয়েছিল বলে প্রধান প্রবেশ পথের একখন্ড পাথরে উৎকীর্ণ লিপি থেকেও অনুধাবন করা যায়।

তখন ছিল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি কাল। ঢাকা নিবাসী শ্রী রোহিনী কুমার আচার্য সম্ভবত সংস্কারকৃত মন্দিরটি উদ্বোধন করেছিলেন। তাঁর নামটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে।[৩৭]

২.৪ ভাগ্যকুলের জমিদারি ও গোপীনাথ মন্দিরঃ খোরশেদপুরের সর্বশেষ জমিদারি ছিল ঢাকার ভাগ্যকুলের কুণ্ডু জমিদারদের। রাজা পুলিন কৃষ্ণরায় ও রাণী শ্যামরঙ্গিনী রায় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে (১৯৩৬ খ্রি.) বিরাহিমপুর পরগণা নিলাম খরিদ করে শিলাইদহের ঠাকুর জমিদারির মালিক হন। জমিদারি হাত বদলের সর্বশেষ ধারায় গোপীনাথ দেবমন্দির ও এর লা'খারাজ সম্পত্তি ভাগ্যকুলের জমিদারির সেবাইত লাভ করে। এই সময়েও দেবপুজা ও অন্যান্য উৎসবাদি যথারীতি চালু ছিল। রন্ধনশালায় প্রত্যহ একমণ চাউলের ভোগও রান্না হ'ত। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ অবধি এটা অব্যাহত থাকে। ভাগ্যকুল জমিদারি পর্বে গোপীনাথ মন্দিরবাড়ির যেমন কোন সংস্কার হয়নি তেমনি কোন নতুন স্থাপনাও এখানে নির্মিত হয়নি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার জমিদারি প্রথা রহিতকরণ আইনের দ্বারা ১৯৫১-১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভাগ্যকুলের শিলাইদহ জমিদারির অধিকার গ্রহণ করে এবং খোরশেদপুরস্থ তথা গোপীনাথ দেব মন্দিরের উপর জমিদারি সেবাইতের অবসান ঘটে।

৩. গোপীনাথ দেবের পালা-পার্বন ও উৎসব

আগেই উলেখিত হয়েছে যে, কল্যাণ রায় কর্তৃক গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর হতে নানা ধর্মীয় পালা-পার্বন ও উৎসবাদি পালিত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে গোপীনাথের স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা ও রথযাত্রার উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় উৎসব ছিল গোপীনাথ দেবের স্নানযাত্রা। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা উপলক্ষে মাসব্যাপী বিশাল মেলা বসতো। মেলাটি গোপীনাথের স্নানযাত্রার মেলা নামে পরিচিত। রাজা সীতারাম রায় এবং নাটোর জমিদারি আমলেও উৎসবগুলো সমভাবে পালিত হয়। শিলাইদহ জমিদারি আমলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবারে মেলা দেখতে আসতেন।[৩৮] তিনি নিশ্চল গ্রাম্য সমাজ ও সংস্কৃতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গোপীনাথ মন্দির প্রাঙ্গনে 'কাত্যায়নীর মেলা'র আয়োজন করেছিলেন। পর পর তিন বছর ধরে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মেলাকে উৎসবমুখর করতে ও আমোদ-প্রমেদের জন্য সাত দিন ধরে যাত্রা-থিয়েটারসহ কবিগান, তর্জাগান, বাউল গান, কীর্তন, পাঁচালি, লাঠিখেলা, কুস্তিখেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। অন্যদিকে আমন্ত্রিত কামার, কুমার, ছুতোর, তাঁতীরা তাদের শিল্পসম্ভারে দোকান সাজিয়ে মেলাকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে।[৩৯] অন্যান্য পালাপার্বনেও মেলা অনুষ্ঠিত হত। কার্তিক পূর্ণিমায় গোপনারীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব স্মরণে রাসযাত্রা ও রাসমেলা এবং আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের রথভ্রমণের স্মারক উৎসব গোপীনাথের রথযাত্রা ও রথের মেলা ছিল স্মরণীয়।

উপসংহারঃ গোপীনাথ মন্দিরে বিভিন্ন স্থাপত্য শৈলীর সমন্বয় নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এর কৌণিক ও বহুখাঁজ খিলান ও প্যানেল মুসলিম স্থাপত্য শৈলী, বারান্দার স্তম্ভ নির্মাণে বৌদ্ধ

স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব এবং টেরাকোটা ফলকের দেবদেবী, জীবজন্তু, পলেস্তারা নির্মিত বিবসনা নারী মূর্তির ভাস্কর্য অলঙ্করণ হিন্দু স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণ। গোপীনানাথের মন্দির কমপ্লেক্সটি আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কেননা জমিদারি সূত্রে রাজা সীতারাম রায়, মহারাণী ভবানী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বহু ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল গোপীনাথের মন্দির বাড়িতে। বর্তমানে গোপীনাথ মন্দির কমপ্লেক্সটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ তবে এখনও সংস্কারের উপযোগী। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কিংবা কোন সংস্কৃতিমনা বিত্তবান লোকের সহযোগিতায় ইমারতগুলো সংস্কার করে গোপীনাথ মন্দিরবাড়ি ও খোরসেদপুরকে একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত করা সম্ভব। এর ফলে পর্যটন এলাকা হিসেবে শিলাইদহের গুরুত যে আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. খোরশেদ উল্-মূল্ক্ এই অঞ্চলের একজন সুপ্রসিদ্ধ দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। গোপীনাথ মন্দিরের প্রায় এক শ' মিটার দক্ষিণে একটি ছোট্ট পুকুরের ধারে তাঁর দরগা আছে। মুসলমান শাসনের কোন এক সময়ে তিনি এখানে আস্তানা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন। দরগা-স্থলটি তখন পদ্মার জনমানবহীন এক চর ছিল। দরগাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে হিন্দু-মুসলমান বসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ খোরশেদপুর গ্রাম। গ্রামের নামটি তাঁরই নামের স্মারক। অবশ্য তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই, আছে জনশ্রুতি; শোনা যায় তাঁর অনেক কারামতের কথা। দরবেশের উদার ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করত। অনেক আগে থেকে তারা দরগায় তাঁর জন্মোৎসব পালন করত এবং শিরনী ও মানত দিত। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দরগার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং দরগার উপরে একটি পাঁকা বেদী তৈরী করে দরবেশের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তিতে জমিদার সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর দরগার বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। বর্তমানে তাঁর মাযারের উপর একটি মনোরম সমাধি সৌধ নির্মিত হয়েছে। কুমারখালির বিশিষ্ট সমাজ সেবক আলাউদ্দিন আহমদ কর্তৃক সৌধটি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। দরবেশ খোরশেদ-উল্-মুল্ক সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪), পৃ. ৩৭৯-৩৮৩।

২. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, *তদেব*, ৩৮৩।

৩. *তদেব*।

৪. অমিতাভ চৌধুরী, "জমিদার রবীন্দ্রনাথ : শিলাইদহ পর্ব," আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ : যুগলবন্দী প্রেক্ষণ* (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৯৫।

৫. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯-৩৭৩।

৬. স্বাধীন সুলতানী আমলে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাবে একরত্ন শৈলীর মন্দিরস্থাপত্যের উদ্ভব বলে কলাবিশারদগণের অনেকে মনে করেন। মুসলমানদের একগম্বুজ মসজিদ বা

সমাধিকে বাংলার একরত্ন মন্দিরের পূর্বসূরি হিসেবে গণ্য করা হয় এদের মধ্যকার সুস্পষ্ট সাদৃশ্যের কারণে– পার্থক্য কেবল এদের উপরাংশের ছাদ নির্মাণে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে একজন আধুনিক গবেষক দেখিয়েছেন, প্রাচীন শিখর দেউল হতেই রত্নমন্দিরের উদ্ভব। প্রাচীনকাল থেকে এই 'শিখর' দেউল দুটি সুস্পষ্ট অংশ নিয়ে একটি অখণ্ড রূপ লাভ করে। এর নিচের অংশটি চতুষ্কোণ 'দালান'। গুপ্তযুগে এই দালান ছিল দেববিগ্রহের অধিষ্ঠান বা গর্ভগৃহ। পরবর্তিকালে এই দালানের উপর শিখর নির্মিত হতে দেখা যায়। এইভাবে শেষ মধ্যযুগে এসে দেউল মন্দিরের আদর্শে একটিমাত্র রত্ন বা শিখর স্থাপিত করে একরত্ন শৈলীর মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই সময় দেউলের বহুল প্রচলন হওয়ায় সেটি যেমন রত্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি লোকায়ত 'চালা' স্থাপত্যেও নিচের দালানের উপর 'রত্ন'রূপে স্থাপিত হয়েছে। ফলে সতের শতক হতে উনিশ শতকের মধ্যে 'চালা', 'দেউল' ও 'রত্ন'-শৈলীর মন্দিরশিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে এবং অজস্র মন্দির তৈরি হয়। (বিস্তারিত: প্রণব রায়, *বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য* (কলকাতা: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ২য় সং. ২০০৪), পৃ. ৩৪-৩৮।

৭. 'দালানে'র উপর আর একটি 'দলান' নির্মাণ করে দ্বিতল দালান মন্দিরও কিছু কিছু নির্মিত হয়। বিস্তারিত: প্রণব রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

৮. *তদেব*, পৃ. ৩৮।

৯. অসীম মুখোপাধ্যায়, চব্বিশ পরগণার মন্দির (কলিকাতা: আনন্দধারা প্রকাশনা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৮।

১০. কড়ি-বরগার সাহায্যে সমতলভাবে ছাদ নির্মাণ পদ্ধতি আধুনিক যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে সীমিত আকারে এর প্রচলন ছিল। এখানে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ নির্মিত (১২৩১ খ্রি.) স্বীয় পুত্র ও লক্ষণাবর্তির শাসনকর্তা নাসির উদ্দিন মাহমুদ (মৃ. ১২২৯ খ্রি.) এর সমাধিসৌধ 'সুলতান ঘরি'র অনুরূপ ছাদের কথা স্মরণযোগ্য। দেখুন: মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩-৪৪।

১১. প্রণব রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

১২. *তদেব*।

১৩. Deve Krisna, *Temples of North India* (Kolkata: National Book Trust, 2nd ed), p. 9, plate: 1.

১৪. প্রণব রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস: আধুনিক যুগ*। কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪র্থ সং. ১৯৯৬, পৃ. ৬১৪; প্রণব রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

১৬. মো. আতিয়ার রহমান, "কুমারখালির পুরাকীর্তি: প্রসঙ্গ মন্দির", *ইতিহাস অনুসন্ধান* , খণ্ড-২০, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০১, পৃ. ৭৭৫-৭৮০।

১৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৬।

১৮. রামরঞ্জন দাস, *পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি* (কলিকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রা. লি., ১৯৮৩), পৃ. ১০-১১।

১৯. শচিন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৮-৩৭৩।

২০. *তদেব*, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

২১. খোরশেদপুরের ইতিহাসে ভূষণার স্বাধীনচেতা রাজা সীতারাম রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সীতারাম ছিলেন ভূষণা পরগণার ফৌজদারের অধীনস্থ তহশিলদার উদয়নারায়নের পুত্র। উদয়নারায়ন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের হিন্দু ছিলেন। স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি মুঘল সম্রাটের নিকট হতে কয়েকটি পরগণার জমিদারি লাভ করেন ও রাজা উপাধি পান। তদীয় পুত্র সীতারাম ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় তার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সমকালীন সুশিক্ষাও তিনি লাভ করেছিলেন ঢাকায় অবস্থানকালে। সীতারামও নিজ যোগ্যতাবলে জমিদারিসহ রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। বিস্তৃত জমিদারির অধিকারী সীতারাম ছিলেন বিখ্যাত নির্মাতা। স্থাপত্যের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। স্বীয় জমিদারি আমলে তিনি বর্তমান মাগুরা জেলার অন্তর্গত ভূষণা পরগণাভূক্ত 'মুহাম্মদপুরে' তাঁর জমিদারি এস্টেটের রাজধানী স্থাপন করেন এবং সুরম্য প্রাসাদ- অট্টালিকা, মন্দির নির্মাণ এবং বৃহদাকার দীঘি ও জলাশয় খনন করে এটাকে একটি শহরে পরিণত করেন। রাজা সীতারাম রায়ের কীর্তির জন্যই মুহাম্মদপুর বর্তমান বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান। স্থাপত্য নিদর্শনের প্রাচুর্যতার কারণে মুহাম্মদপুর বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত প্রত্নস্থলের মর্যাদা লাভ করেছে। সীতারামের স্থাপত্য কীর্তি তাঁর জমিদারি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এই বিষয়ে পৃথক গবেষণার অবকাশ আছে। বিস্তারিত: মকসুদুর রহমান, *নাটোরের মহারাণী ভবানী: ঐতিহাসিক পর্যালোনা* (রাজশাহী: হোসনে আরা রহমান; ১৯৮৮), পৃ. ২৭; J. Westland, *A Report on the District of Jessore-its Antiquities, its History and its Commerces*. (Calcutta: Secretariate Press, 1974), p. 25.

২২. শচিন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাক্তপ্ত*, পৃ. ৩৭৩।

২৩. *তদেব*।

২৪. Inamul Haque, The Capital and Monuments of Shitaram Rai 1696-1814 A.D. *Bangladesh Historical Studies*, Vols. VIII-IX (Dhaka: Bangladesh Itihas Samiti, 1984-86), pp. 28-33.

২৫. একবার গোপীনাথ দেবের দোলযাত্রায় দোলমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে কীর্তন শুনাকালে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর গায়ে কোন এক যুবক পিচকারী দিয়ে রং ছিটিয়ে দেয়ায় খুব হৈচৈ হয়েছিল। সেই থেকে গান, দোল ও রাসের মেলায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আত্মীয়গণ পাল্কী চেপে মেলা দেখতে আসতেন। দ্রষ্টব্য: শচিন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাক্তপ্ত*, পৃ. ৪৮০।

২৬. মকসুদুর রহমান, *প্রাক্তপ্ত*, পৃ. ২৭।

২৭. রাণী ভবানী কাশীতে ব্রাহ্মণদের বসবাসের নিমিত্তে যে ৩৬৫টি গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তা 'ভবানীর ব্রহ্মপুরী' নামে অভিহিত। দেখুন, মকসুদুর রহমান, *প্রাক্তপ্ত*, পৃ. ১৭১।

২৮. *তদেব*, পৃ. ১৬৫-১৭৫।

২৯. শ. ম. শকওত আলী, *কুষ্টিয়ার ইতিহাস* (কুষ্টিয়া: মণিকা শওকত, ১৯৭৮), পৃ. ১২৪; মন্দির লিপির জন্য দেখুন, পরিশিষ্ট– ২।

৩০. শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, রাণী ভবানী একদিন স্বপ্নে গোপীনাথ ও রাধানাথের দর্শন লাভ একটি আদেশ পেয়েছিলেন, "আমরা একই বিগ্রহ, কিন্তু এখানে দুইটি যুগল মূর্তিতে দুইটি মঠে আছি। আমরা আর পৃথকভাবে দুই মন্দিরে থাকতে চাই না। তুমি আমাদের নিয়ে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর।" দ্রষ্টব্য, শচিন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাক্তক্ত*, পৃ. ৩৭৩।

৩১. কুমুদনাথ মলিক, *নদীয়া কাহিনী* (কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১৯৯৮, ৩য় সং.), পৃ. ৪১৩।
৩২. শচিন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাক্তপ্ত*, পৃ. ৩৭৪।
৩৩. কবি ও জমিদার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহান শিল্পপ্রেমিক ও শিল্প-সমঝদার ব্যক্তিত্ব। শিল্পের সকল শাখাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। স্থাপত্য শিল্পে তাঁর অনুরাগ, আকর্ষণ, দক্ষতা ও অবদানের জন্য অরুনেন্দু বন্দোপাধ্যায়, *শন্তি নিকেতন, স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: কল্যাণ মৈত্র, ২০০০ গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।
৩৪. এল্‌মহার্ষ্ট জাতিতে ছিলেন একজন ইংরেজ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল নিউইয়র্কে; তিনি তখন ছাত্র–পড়তেন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান পড়তে। কবির গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ এল্‌মহার্ষ্ট এক সময় এসেছিলেন এলাহাবাদে– তখনই তিনি এদেশের জনহিতকর কাজে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কবির সুরুল-শ্রীনিকেতনে কৃষি ও গ্রাম পূনর্গঠন কাজে যোগদান করেন। বিস্তারিত: অজিত নিয়োগী, "কৃষি ও গ্রাম পুনর্গঠন বিভাগের আদি পর্ব", *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ স্মরণিকা*, (সম্পা. মহুয়া সরকার), শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী, ২০০১, পৃ. অনুল্লেখিত।
৩৫. অরুনেন্দু বন্ধোপাধ্যায়, প্রাক্তপ্ত, পৃ. ১৩৩।
৩৬. *তদেব*।
৩৭. টেরাকোটা-লিপি পাঠের জন্য দেখুন: পরিশিষ্ট– ১ ।
৩৮. শচিন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮০।
৩৯. *তদেব*, পৃ. ৮৩-৮৪।

পরিশিষ্ট

১. গোপীনাথ মন্দিরের প্রবেশপথের মেঝেতে সংযুক্ত শিলালিপির পাঠ:

"চির প্রণত
শ্রী রোহিনী কুমার আচার্য
পাইকপাড়া (ঢাকা)
১৩১০ বঙ্গাব্দ।"

উৎস : প্রবন্ধকার কর্তৃক মন্দির হতে সংগৃহীত।

২. গোপীনাথ মন্দিরের টেরাকোটা লিপির পাঠ:

"* * যে সাগর শায়ক ঋতু
শীতাংশু চাত : শকে গতেষু
শ্রীহরে গৃর্হং শয়ন প্রথং
কীর্তি : স্থিতৌ। ত্রিনেত্র পতি : রাম
কান্তনৃপতি না নির্ম্মমে সংস্থপত্যগ্রণী
শ্রী * নাথ জগত্তাপতে : স্থপিত ভি:
• * মাদায় নির্ম্মমে * * নাথ।"

অর্থ : সাগর-৭, শায়ক-৫, ঋতু-৩, শীতাংশু-১; অঙ্কের বামগতি অনুসারে ১৬৫৭ শকে অর্থাৎ ১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে রাণী ভবানী পতি রামকান্ত রায় কর্তৃক নির্মিত। উদ্ধৃত : শ. ম. শওকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

চিত্রসূচি

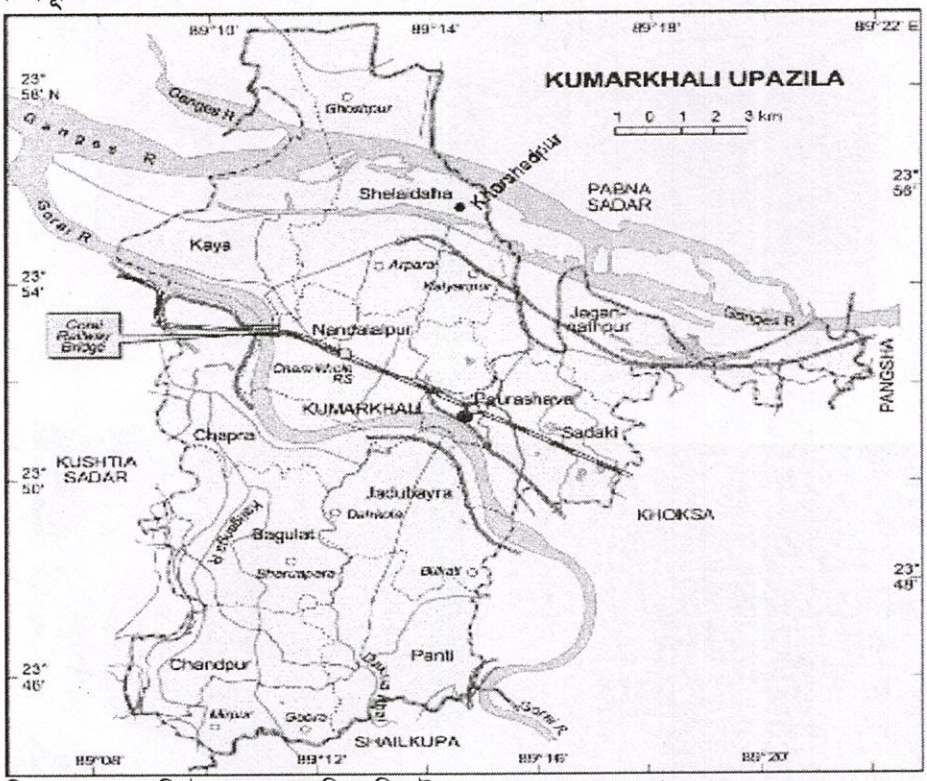

চিত্র ১: কুমারখালি উপজেলা মানচিত্রে শিলাইহ-খোরশেদপুরের অবস্থান

চিত্র ২ : সীতারাম নির্মিত গোপীনাথ মঠের দৃশ্য। কার্ণিশ ও নিম্নাংশের অলঙ্করণ

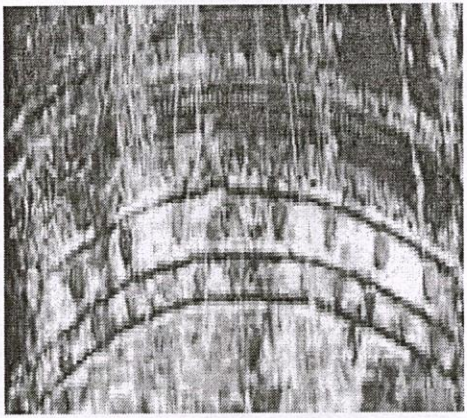

চিত্র ৩ : সীতারাম নির্মিত গোপীনাথ মঠের

চিত্র ৪ : সীতারাম নির্মিত গোপীনাথ বাড়ির দোলমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ

চিত্র ৫: গোপীনাথ মন্দিরে উৎকীর্ণ টেরাকোটা লিপি

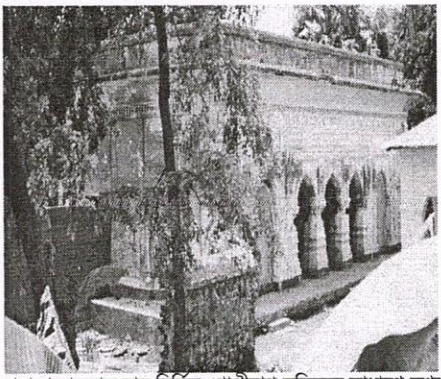

চিত্র ৬: মহারাজা রামকান্ত রায় নির্মিত গোপীনাথ মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য

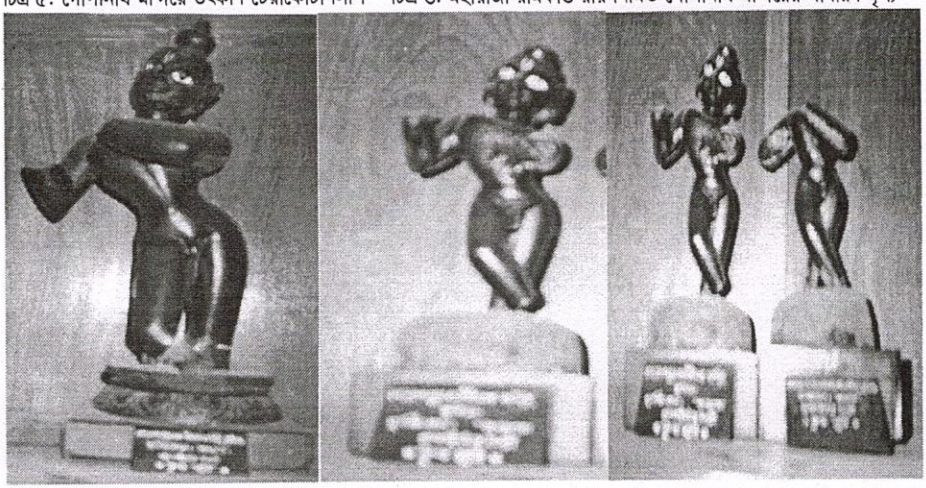

চিত্র ৭: গোপীনাথের বিগ্রহমূর্তি (কুষ্টিয়া পৌরসভা জাদু

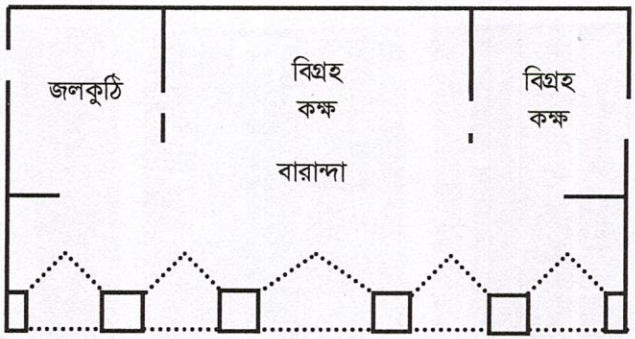

চিত্র ৮ : গোপীনাথ মন্দিরের ভূমিনক্শা

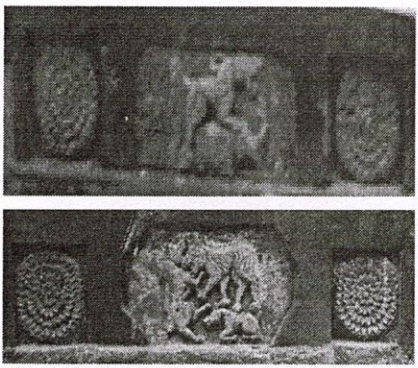

চিত্র ৯ : গোপীনাথ মন্দিরের টেরাকোটা নক্শা অলঙ্করণ চিত্র

চিত্র ১০ : গোপীনাথ মন্দিরের টেরাকোটা নক্শা অলঙ্করণ

চিত্র ১১: গোপীনাথের স্নান মন্দিরের দৃশ্য।

চিত্র নং ১২ : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মিত গোপীনাথবাড়ির প্রধান তোরণ

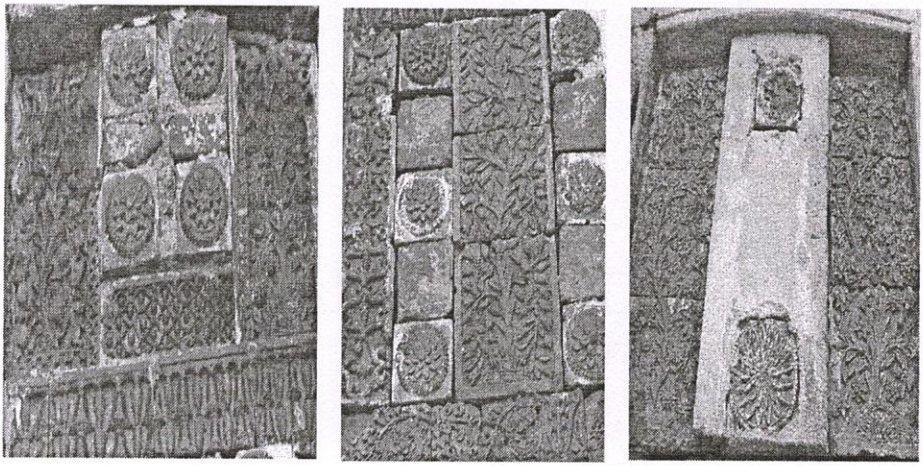

চিত্র নং ১৩ : জমিদার-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মিত তোরণের টেরাকোটা অলঙ্করণ

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

পূর্ব বাংলায় খাজা নাজিমউদ্দীনের শাসনামল (১৪ আগস্ট ১৯৪৭-১১সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) : একটি পর্যালোচনা

মোঃ আঃ লতিফ ভূঁইয়া*

Abstract : After the partition of Bengal, the Muslim League Government ruled East Bengal from 1947 to 1954 AD. During this period, Khawaja Nazimuddin ruled for more than a year (14 August 1947 to 11 September 1948). In this period the situation in East Bengal was unfavourable for Nazimuddin. After the partition, East Bengal inherited some underdeveloped areas, backward in education, an unchained administration, small landholders, petty businessmen and underdeveloped infrastructure. In this paper the author discusses the administrative progress and development activities in Bengal during this period.

ভূমিকা

চল্লিশের দশক থেকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দানা বেঁধে উঠে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রচেষ্টার কারণে প্রগতিশীল গ্রুপ হিসেবে পরিচয় লাভ করে। পক্ষান্তরে খাজা নাজিমউদ্দীন, নূরুল আমিন এবং মাওলানা আকরাম খান রক্ষণশীল গ্রুপ হিসেবে পরিচয় লাভ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবহ অনুসারীতে পরিণত হন।[১] ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আইনসভার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠন করে।[২] কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার শাসনকাল নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। একদিকে কংগ্রেসের অপপ্রচার অপরদিকে মুসলিম লীগের রক্ষণশীল গ্রুপের অসহযোগিতা সোহরাওয়ার্দীর সরকারকে বিতর্কের মুখে ফেলে দেয়। এমনি অবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা বাংলাকে দুটি অংশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড পূর্ব

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কুমিল্লা সরকারি ভিক্টরিয়া কলেজ।

[১] হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১), পৃ. ১৭১; Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947* (Dhaka: The University Press Limited, 2003), pp. 160-77.

[২] হারুন-অর-রশীদ, 'বঙ্গীয় মন্ত্রিসভা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৪৪৪; ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-৪৭* (ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৮),পৃ. ১৩১-৩১২।

বাংলার জন্য নতুন করে নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দেন। খাজা নাজিমউদ্দীন মূখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর সরকার গঠন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্কের সম্মুখিন হন। এ সময়ে সরকার বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। একটি অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেও খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখেন। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো;

নির্বাচন ও সরকার গঠন

পূর্ব বাংলা প্রদেশে সরকার গঠনের লক্ষে ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আই আই চুন্দ্রীগড়। নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিমউদ্দীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফলাফলে দেখা যায় যে, সোহরাওয়ার্দী খাজা নাজিমউদ্দীনের নিকট ৩৯-৭৫ ভোটের ব্যবধানে হেরে যান এবং খাজা নাজিমউদ্দীন সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন।[৩]

খাজা নাজিমউদ্দীনের জয় লাভের পিছনে কতিপয় কারণ ছিল। প্রথমত: সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাংলার প্রয়াসে কাজ করতে যেয়ে একজন প্রগতিশীল উদারপন্থী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তার উদার মনোভাবের কারণেই আইনসভায় খাজা নাজিমউদ্দীনের নিকট পরাস্ত হন। দ্বিতীয়ত সোহরাওয়ার্দীর 'সভরেন বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পর্কিত কার্যের কারণে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান তার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেন। সোহরাওয়ার্দী খাজা নাজিমউদ্দীন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করতে গিয়ে পুঁজিপতি ইস্পাহানীদের একচেটিয়া কারবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সে সময়ে ইস্পাহানী পরিবার সরকারকে খাদ্য সরবরাহ করত। দেশ বিভাগের সময়ে ইস্পাহানী পরিবার মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডকে অনেক অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। যার ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতি সহিষ্ণু এবং বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন। ইস্পাহানীদের সাথে বিরোধের কারণে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড অসন্তুষ্ট ছিল।[৪]

কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের অসন্তুষ্টি এবং তাঁর হিন্দুপ্রীতি কাজে লাগিয়ে খাজা নাজিমউদ্দীন অখণ্ড বাংলার মূখ্যমন্ত্রীকে পরাস্ত করে খণ্ডিত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।[৫] খাজা নাজিমউদ্দীনের মূখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হলো, ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোটে রায়ের ভিত্তিতে সিলেট পূর্ব বাংলার সাথে যোগ দেয়ার পর মোট ১৭ জন এম এল এ (আসাম মুসলিম লীগ) পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ

---

[৩] *দৈনিক আজাদ*, ৬ আগস্ট ১৯৪৭; Lawrence Ziring, "The Second Partition of Bengal", , Vol. III (1976); অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫* (ঢাকা: অলি আহাদ, তারিখ বিহীন), পৃ. ৩০।

[৪] বশীর আল্‌হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১১৬।

[৫] *The Statesman*, 6 August 1947.

পার্লামেন্টারী পার্টিতে যোগ দেন। তারা সোহরাওয়ার্দীর নিকট প্রস্তাব করেছিলেন যে, যদি তাদের ৩ জন মন্ত্রী ও ৩টি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর পদ দেয়া হয় তাহলে তারা সোহরাওয়ার্দীকে এসেম্বলি হাউসে সমর্থন দিবেন। কিন্তু মূখ্যমন্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত তিনি ওয়াদা দিতে পারবে না বলে অপারগতা প্রকাশ করলে এম এল এ সদস্যরা খাজা নাজিমউদ্দীনকে একই প্রস্তাব দেন। খাজা নাজিমউদ্দীন তাদের প্রস্তাবে রাজি হলে তারা খাজা নাজিমউদ্দীনের পক্ষে ভোট দেন। অপর একটি তথ্য পাওয়া যায় শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী থেকে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, "ডা: মালেক সিলেট গিয়েছিলেন শহীদ সাহেবের পক্ষে কাজ করতে। তাকে সিলেটের এমএলএ-রা জিজ্ঞাসা করেছিলেন শহীদ সাহেবের প্রোগ্রাম কি? ডা: মালেক বলেছিলেন, প্রথম কাজ হবে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা। ফল হলো উল্টা, তিন জন এমএলএ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন সিলেটের জমিদার।"[৬] সুতরাং সোহরাওয়ার্দী মূখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলে ১৪ জন এমএলএ- এর জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা নাজিমউদ্দীনকে ভোট দেন। ফলে নির্বাচনে তার জয় লাভ সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া খাজা নাজিমউদ্দীনের পক্ষে নগদ টাকার বিনিময়ে ভোট সংগ্রহের তথ্যও পাওয়া যায়।[৭] নির্বাচনে জয়লাভের পর খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং ১৫ আগস্ট কার্জন হলে শপথ গ্রহণ করেন।[৮] তার গঠিত মন্ত্রিসভাই ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা। নবগঠিত পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভার কাঠামো সারণি-১ এ দেওয়া হলো:

সারণি ১ : নব গঠিত পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভা[৯]

নাম	দপ্তর
স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন	গভর্নর
খাজা নাজিমউদ্দীন	মূখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, পরিকল্পনা, বিচার ও রেজিস্ট্রেশন।
নূরুল আমিন	বেসামরিক সরবরাহ, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প।
আব্দুল হামিদ	শিক্ষা
সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল	কৃষি, সমবায় ও ত্রাণ।
হাসান আলী	যোগাযোগ, পূর্ত ও পানি
হামিদুল হক চৌধুরী	রাজস্ব, অর্থ
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী	স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার
আবদুল করিম	স্পীকার
নাজমুল হুদা	ডেপুটি স্পীকার

---

[৬] মাহমুদ নূরুল হুদা, *আমার জীবন স্মৃতি* (অনুলেখক: স্বরোচিষ সরকার) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১১২।

[৭] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাহমুদ নূরুল হুদা, *তদেব*, পৃ. ১১২-১১৩।

[৮] *দৈনিক আজাদ*, ১৬ আগস্ট ১৯৪৭।

[৯] আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ২০; মোহাম্মদ হান্নান, *বাঙালির ইতিহাস* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১৩৯; ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৮২।

পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগ

মন্ত্রীদের কাজের সুবিধার জন্য এবং গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৫ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগ করা হয়। নিম্নে তাদের নাম ও দপ্তর দেয়া হলো:

সারণি ২ : ১৫ জন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির তালিকা[১০]

নাম	দপ্তর
মো. মফিজ উদ্দিন আহমেদ	মূখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব
ইউসুফ হোসাইন চৌধুরী	চীফ হুইপ
বদিউজ্জামান মো. ইলিয়াস	শিক্ষা
মাওলানা আবদুল আজিজ	মাদ্রাসা শিক্ষা
আব্দুল খালেক	স্বাস্থ্য
আওলাদ হোসাইন	সিভিল সাপ্লাই
আব্দুর রশীদ মাহমুদ	আইন ও বিচার
কাজী আব্দুল মাসুদ	রেজিস্ট্রেশন
নাসির উদ্দিন	বাণিজ্য ও শিল্প
আজিজুর রহমান	হুইপ
দেওয়ান তাইমুর রেজা	হুইপ
ফজলুর রহমান	হুইপ
পনির উদ্দিন এবং মাওলানা রুকন উদ্দিন	পূর্ত
আকবর আলী	কৃষি

১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার ৬ মাস পূর্তি হওয়ায় মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর মন্ত্রীত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।[১১] এ অবস্থায় গভর্নর জেনারেল বিশেষ আদেশ বলে মন্ত্রীর কার্যকাল আরো তিন মাস বর্ধিত করেন।[১২] মন্ত্রিসভায় কাজের স্থবিরতা দূর করার লক্ষে খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৪৮ সালের মে মাসে তার মন্ত্রিপরিষদে নতুন করে ৩ জন মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত করেন। তারা হলেন:[১৩]

তোফাজ্জল আলী–রাজস্ব (পূর্বে অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার ছিলেন) মফিজ উদ্দিন আহমদ – সাহায্য ও পূনর্বসতি এবং রেজিস্ট্রেশন (পূর্বে খাজা নাজিমউদ্দীনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন) ডা. মালেক–শ্রমিক দফতর (পূর্ব পাকিস্তানের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও লাইসেনসিয়েটস এসোসিয়েশনের সভাপতি)

খাজা নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রীদের জেলা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের একটি পরিসংখ্যান সারণি-২ এ দেখানো হলো (প্রতিনিধিত্বের এ হার ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল):

---

[১০] *Daily Dawn*, 3 November 1947.

[১১] মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী অনির্বাচিত সদস্য ছিলেন, নিয়ম অনুযায়ী কোন অনির্বাচিত সদস্য ৬ মাসের বেশি মন্ত্রিপরিষদে থাকতে পারেন না।

[১২] *দৈনিক আজাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

[১৩] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ৩ জুন ১৯৪৮।

সারণি ৩ : মন্ত্রিপরিষদে জেলাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব[১৪]

ঢাকা	২
ময়মনসিংহ	২
ফরিদপুর	১
বাকেরগঞ্জ	২
নোয়াখালী	২
ত্রিপুরা	২
সিলেট	১
কুষ্টিয়া	১
মোট	১৩

সরকার গঠন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ব বাংলা মূখ্য ভূমিকা রাখলেও মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড পূর্ব বাংলাকে এবং পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি।[১৫] পাকিস্তানকে ঘিরে বাঙালিদের যে স্বপ্ন ছিল, তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। শাসন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণ বঞ্চনার শিকার হয়।[১৬] প্রথমেই মুসলিম লীগ হাইকমান্ড কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতায় বাঙালিদের দূরে সরিয়ে দিয়ে অবাঙ্গালিদের জায়গা করে দেয়। যারা বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্থাভাজন লোকদের বসানোর উদ্দেশ্যেই নতুন করে পূর্ব বাংলা সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের কৌশল অবলম্বন করা হয়।[১৭] প্রদেশ ভাগের যুক্তিতে বাংলার মুসলিম লীগ এবং আইনসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়, অথচ পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ সরকার এবং মূখ্যমন্ত্রীর পদ বহাল থাকে।[১৮]

খাজা নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিপরিষদে যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তারা সকলেই নতুন। ইতিপূর্বে গঠিত সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার কাউকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[১৯] সোহরাওয়ার্দী-হাশিম,

---

[১৪] Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislative 1947-1958* (Dhaka: The University of Dhaka, 1980), p. 294.

[১৫] মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২), পৃ. ৫।

[১৬] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার -দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫), পৃ. ৩১১-১২।

[১৭] হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।

[১৮] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১।

[১৯] ড. মো. মাহবুবর রহমান, *১৯৪৭-৭১, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

সরকার ও দল উভয় জায়গা থেকেই উপেক্ষিত হন। এমন কি পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রভাবশালী সদস্য মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (বগুড়া), আহমদ হোসেন (রংপুর), আবদুল গোফরান (নোয়াখালী), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার তফাজ্জল আলী, ডা. আবদুল মালেক (অবশ্য পরে মন্ত্রি-পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়), আবদুস সবুর খান, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ নাজিমউদ্দীনের মন্ত্রিসভায় স্থান পায়নি।[২০] পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের ত্যাগী নেতৃবৃন্দ কেবল মন্ত্রী এবং দলের পদ থেকেই বঞ্চিত হয়নি, বরং তারা প্রতিপদে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব বঙ্গ হতে বহিষ্কার করা হয়।[২১]

সোহরাওয়ার্দী ভারতে থেকে যাওয়া অসহায় মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদে শান্তি মিশন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভারতে অবস্থানের অপরাধে তার গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিল করে দেয়া হয়।এটা যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের অধিকাংশই ভারত থেকে মাইগ্রেট করে পাকিস্তানে গিয়েছেন।[২২] জিন্নাহ নিজেই বলেছেন, "আমি ভারতের নাগরিক পাকিস্তানে এসেছি সেবা করতে।"[২৩] লিয়াকত আলী খান ভারতের লোক ছিলেন, পাকিস্তানে মাইগ্রেট করে প্রধানমন্ত্রী হন। নবাব মামদোত পূর্ব পাঞ্জাবের লোক হয়েও পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হন।[২৪] তাছাড়া প্রথম গণপরিষদের সদস্য রাজ কুমার চক্রবর্তীসহ একাধিক সদস্যের স্থায়ী বাসস্থান ও ঠিকানা কলকাতায় হওয়া সত্ত্বেও তাদের কারো সদস্য পদ বাতিল করা হয়নি।[২৫] অথচ সোহরাওয়ার্দী বাংলার মূখ্যমন্ত্রী থাকা সত্বেও পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য পূনরায় নির্বাচন করতে হয়েছে। মূলত সোহরাওয়ার্দীকে কোনঠাসা করে প্রগতিশীল রাজনীতিকে উচ্ছেদ করার একটি পরিকল্পনা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব বাংলায় অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হয়।[২৬] খাজা নাজিমউদ্দীন সরকারের এরকম আচরণে পূর্ব

---

[২০] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭।

[২১] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (সম্পা.), আব্দুল হাফিজ, *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি., ১৯৮১), পৃ. ৩৯।

[২২] Nehal Karim, *The Emergence of Nationalism in Bangladesh* (Dhaka: University of Dhaka, 1992), p. 83.

[২৩] আকবর উদ্দিন, *কায়েদে আজম* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯), পৃ. ৮৬২।

[২৪] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

[২৫] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০।

[২৬] সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৮ সালের জুন মাসে শান্তি মিশনের কাজে পূর্ব বাংলায় আগমন করলে নাজিম উদ্দিন সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তাকে জোরপূর্বক ঢাকার বাদামতলী ঘাটে স্টিমারে উঠিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার, *সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিকথা*, পৃ. ৫৩; মাহমুদ নূরুল হুদা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১১৬। কিন্তু খাজা নাজিমউদ্দীন *Daily Dawn* পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমরা সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব বাংলায় আসতে বাধা দিচ্ছিনা বরং বাধা দিচ্ছি তার পাকিস্তান বিরোধী কর্মকাণ্ডকে। কারণ তিনি কম্যুনিস্টদেরকে সহযোগিতা করছেন যারা

বাংলার নেতৃবৃন্দ সকলেই অবাক হন। কারণ, খাজা নাজিমউদ্দীন ইতিমধ্যেই নিজেকে ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থের সাথে নিজেকে একাত্ব করে ফেলেছেন। এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থকরা নাজিমউদ্দীন সরকার ও মুসলিম লীগের বিকল্প হিসেবে অপর একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।[২৭] এ সময় আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ইস্ট হাউজের দক্ষিণ দিকের মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সর্বপ্রথম নাজিমউদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন।[২৮] ভাসানীর প্রকাশ্যে আন্দোলনের ঘোষণা সর্ব প্রথম ছাত্রদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে গঠিত 'গণআজাদী লীগ' ভাসানীর ঘোষণার সাথে একাত্মতা পোষণ করে। মূলত দলটি স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দলটির আহবায়ক কমরুদ্দিন আহমেদের নিষ্ক্রিয়তা এবং তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমন নীতির কারণে দলটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।[২৯] খাজা নাজিমউদ্দীন ও তার সরকারের একপেশে মনোভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যত রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়[৩০] এবং ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩১] ১৯৪৮ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকায় পূর্ব বঙ্গের কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনে 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাদের কার্যক্রম পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার অঙ্গিকার করে।[৩২] এ সময় ছাত্রদের সমস্যা নিরসনে এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি অপরাহ্নে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে এক কর্মী

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করার জন্য গোপনে তৎপরতা চালাচ্ছেন।" *Daily Dawn*, 25 July 1948.

[২৭] আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

[২৮] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

[২৯] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

[৩০] *স্বাধীনতার দলীলপত্র*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩। উক্ত দলের সভাপতি নির্বাচিত হন তসদ্দুক আহমদ চৌধুরী। অন্যান্য সদস্য ছিলেন, কমরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, নুরুদ্দীন আহমদ, আব্দুল ওয়াদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রমূখ।

[৩১] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫; হারুন-অর-রশিদ *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২; ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২।

[৩২] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২২ এপ্রিল ১৯৪৮।

সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করা হয়।[৩৩] এর আহবায়ক ছিলেন নঈমুদ্দীন আহমদ (রাজশাহী)। ছাত্রদের পাশাপাশি মুসলিম লীগের বঞ্চিত নেতৃবৃন্দও একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে. এম. দাস লেনের রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এক কর্মী সম্মেলনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।[৩৪]

দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলার সার্বিক অবস্থা এবং নতুন সরকারের সমস্যাসমূহ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পর বেশ কিছু অনগ্রসর অঞ্চল নিয়ে পূর্ব বাংলা গঠিত হয়।[৩৫] ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু অবকাঠামোগত দিক দিয়ে ঢাকার অবস্থা ছিল একেবারেই নাজুক। তার পিছনে কিছু কারণও ছিল। বিভাগ পূর্ব ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল অখণ্ড ভারতের চিন্তা মাথায় রেখে। তাই যুক্ত বাংলায় সকল শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কলকাতা কেন্দ্রিক। সরকারের সচিবালয় থেকে শুরু করে সকল অফিস আদালত কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। সার্বিক বিবেচনায় এ সময় পূর্ব বাংলা ছিল অনুপযোগী প্রশাসনিক রাজ্য। বাংলা বিভক্তির পূর্বেই পূর্ব বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বিভাগপূর্ব বাংলার গভর্নর স্যার আর, জি, কেসি বলেন:

যদি পূর্ব পাকিস্তান শুধু বঙ্গদেশ ও আসামের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে,এবং ইহাই যুক্তি সঙ্গত হইবে, তবে আমি জানিনা মুসলিম লীগ এরকম পাকিস্তান চাহিবেন কিনা-বিশেষ করিয়া ইহা হইতে যদি কলিকাতা ও কয়লার খনি অঞ্চল বাদ পড়ে। মুসলিম লীগ একটা গ্রাম্য বিশ্রামস্থান নিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। কলিকাতা ও কয়লার খনি বাদ দিয়া পূর্ব পাকিস্তান গ্রাম্য বিশ্রামস্থান ছাড়া আর কিছুই হইবেনা। ইহা একটি দরিদ্র গ্রাম্য এলাকায় পরিনত হইবে। ইহাতে বিশেষ কোন শিল্প থাকিবে না

---

[৩৩] বশির আল্‌হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫। সাংগঠনিক কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আবদুর রহমান চৌধুরী (বরিশাল), শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর), অলি আহাদ (কুমিল্লা), আজিজ আহমদ (নোয়াখালী), আব্দুল মতিন (পাবনা), দবিরুল ইসলাম (দিনাজপুর), মফিজুর রহমান (রংপুর) শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা), নওয়াব আলী (ঢাকা), নুরুল কবির (ঢাকা সিটি), আব্দুল আজিজ (কুষ্টিয়া), সৈয়দ নুরুল আলম (ময়মনসিংহ), আব্দুল কুদ্দুস (চট্টগ্রাম), অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬।

[৩৪] Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971* (Dhaka, 1990), Pp. 1-22; আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৫; বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০), পৃ. ২৪৬-৫০।

[৩৫] মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বলেন, পূর্ব পাকিস্তান অবিভক্ত বাংলার দুই তৃতীয়াংশ পেয়েছে বটে কিন্তু এক তৃতীয়াংশ ছিল আয়ের উৎস। *Constituent Assembly of Legistative Debets*, Vol. I, No. 9 (March 29, 1951), p. 600 (পরবর্তীতে শুধু *CAD* ব্যবহার করা হবে।)

এমনকি ইহাতে যথেষ্ট পরিমান খাদ্য শস্যও পাওয়া যাইবেনা যদ্বারা অধিবাসিরা জীবন ধারন করিতে পারে।[৩৬]

এ রকম নাজুক পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা প্রথমেই অবকাঠামোর সংকটে পড়ে। সরকার অফিস আদালতের কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ এবং আবাসিক এলাকার ঘর-বাড়ি রিকুইজিশন[৩৭] করে প্রাথমিক কার্য পরিচালনা করেন। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকার ফলে উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ প্যাকিং বক্সের উপরে বসে সরকারি কাজ কর্ম করে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন।[৩৮] ইডেন বিল্ডিংকে সরকারের সচিবালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গভর্ণমেন্ট ইন্টারমেডিয়েট স্কুলে ঢাকা হাইকোর্টের কাজ সম্পাদন করা হয়। একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস এবং সিভিল সাপ্লাই অফিস হিসেবে ইডেন বিল্ডিং এর একাংশ ব্যবহার করা হয়। লেজিসলেটিভ এসেম্বলির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলকে বেছে নেয়া হয়।[৩৯] মন্ত্রীদের অফিসিয়াল কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক স্টাফ কোয়ার্টার রিকুইজিশান করা হয়। এ সম্পর্কে দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয়তে বলা হয় "নয়া সরকার ঢাকায় অবকাঠামোর অভাবে পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রিকুইজিশান করে সরকারি অফিস করার ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়।"[৪০] 'বর্ধমান হাউজ' ছিল মূখ্যমন্ত্রীর বাসভবন যা বর্তমানে বাংলা একাডেমী হিসেবে পরিচিত। পূর্ব বাংলার সরকার গঠনের পর চার পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়কালে সরকারি কর্মচারিদের জন্য কোনো আবাসনের ব্যবস্থা করা যায়নি। তাদেরকে পলাশী এবং নীলক্ষেত ব্যারাকে থাকতে হয়েছে।[৪১]

ভারত বিভক্তির সময়ে ভারতে টেক্সটাইল মিল ছিল ৩৯৫টি এবং পাকিস্তানে ছিল ১০টি। এর মধ্যে ৭টি পূর্ব বাংলায় এবং ৩টি পশ্চিম পাঞ্জাবে। বিভক্তির সময়ে পাকিস্তানে ৯টি সুগার মিল ছিল, ৫টি পূর্ব বাংলায়, ১টি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ২টি পশ্চিম পাঞ্জাবে এবং ১টি সিন্ধুতে। পাকিস্তানে কোন জুট মিল ছিল না। অবিভক্ত বাংলার ১০৬টি জুট

---

[৩৬] R G Casey, *Personal Experience 1939-1946* (London: Constable and Company Ltd., 1962), p. 71.

[৩৭] ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা শহরে মোট বাড়ি রিকুইজিশন করা হয় ৯৮৯টি। এর মধ্যে মুসলমানদের ২৫০টি এবং হিন্দুদের ৭৩৯টি। চিটাগাং এ মোট ২২২টি বাড়ি রিকুইজিশন করা হয়। এর মধ্যে ৮৯টি মুসলমানদের এবং ১৩৩টি হিন্দুদের। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: *East Bengal Legislative assembly Proceedings*, Official Report, Vol. 2, No. 2 (June 11, 1948), p. 86 (পরবর্তীতে শুধু *EBLAP* ব্যবহার করা হবে)।

[৩৮] SL. No. 48, List No. 148, Bundle: 48, Proceeding-B, File No. 13 P-5/48, May-July, 1949, *Bangladesh National Archives*.

[৩৯] *Daily Dawn*, 1 January 1948.

[৪০] *দৈনিক আজাদ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৪৮।

[৪১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈন্যদের থাকার জন্য পলাশী এবং নীলক্ষেতের ব্যারাক নির্মাণ করা হয়। তখন এটি ছিল টিনের ছাদের উঁচু ঘর এবং চারদিকে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা।

মিলের মধ্যে একটিও উত্তরাধিকারী সূত্রে পূর্ব বাংলা পায়নি। সারণি-৩ এ একটি পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৪ : ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প কারখানা[৪২]

শিল্প	অবিভক্ত ভারতে শিল্প কারখানার সংখ্যা	পাকিস্তানের প্রাপ্তি	পূর্ব পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত	পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত
টেক্সটাইল মিল	৩৯৫	১০	৭	৩
চিনি কল	১৫১	৯	৫	৩
পাটকল	১১৪	-	-	-
তুলা কল	৪০৫	১৬	১০	৬
সিমেন্ট কারখানা	১৩	৫	১	৪
ম্যাচ ফ্যাক্টরী	-	৮	৪	৪

তবে পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত সব কটি জুট মিলের কাঁচামাল যোগান দিত পূর্ব বাংলা।[৪৩] কিন্তু এ সময়ে ভারত বাংলাদেশ থেকে কাঁচামাল (পাট) আমদানি বন্ধ করে দেয় এবং পূর্ব বাংলায় রপ্তানিও বন্ধ করে দেয়া হয়। পাশাপাশি ব্যাংক সুবিধাও বন্ধ করে দেয়া হয়।[৪৪] এ সময় গোটা পাকিস্তান রাষ্ট্রে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত কম। সারণি-৪ এ পাকিস্তানের বার্ষিক উৎপাদন ও বার্ষিক চাহিদার একটি পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৫ : ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের শিল্প ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বার্ষিক উৎপাদন ও চাহিদা[৪৫]

বার্ষিক উৎপাদন	বার্ষিক চাহিদা
মিলের সুতা ৯০০০ গাইট (প্রত্যেক গাইটের ওজন ৪০০ পাউন্ড)	৯০,৪০,০০ গাইট
মিলের কাপড় ৫১,১২০ গাইট (প্রত্যেক গাইটে কাপড়ের পরিমাণ ১৫০০ গজ)	৭,৫০০,০০০ গাইট
কয়লা ২,৮৮,০০০ টন	৩,৫০০,০০০ টন
ইস্পাত ও ঢেউ তোলা টিন ০ টন (তবে রিরোলিং করার ব্যবস্থা আছে এবং বার্ষিক ২৫,০০০ টন রিরোলিং করা যায়)	৩,১৬,০০০ টন
সিমেন্ট ৫,৮৫,০০০ টন	৩,১০,০০০ টন
চিনি ২৫,০০০ টন	২,৪৫,০০০ টন
কেরোসিন ৫,০০০ গ্যালন	২,৮০০,০০০ গ্যালন
পেট্রল ১,৫০০,০০০ গ্যালন	১৬০০,০০০ গ্যালন

---

[৪২] Anis Ahmed, *Economic Geography of East Pakistan* (London: 1958), p. 211. দ্রষ্টব্য: সফর আলী আকন্দ তার অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস-এ (East Pakisatan and Politics of Regionalism) ১১৪টি পাটকলের কথা উল্লেখ করেছেন, পৃ. ১৭১।

[৪৩] *Daily Dawn*, 23 February 1948.

[৪৪] M. Rafiq Afzal, *Political Parties in Pakistan, 1947-1958*, Vol. I, *National Institute of Historical and Cultural Research* (Islamabad: 1986), p. 109.

[৪৫] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২৫ মার্চ ১৯৪৮ (পাকিস্তান সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রকাশিত)।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, উৎপাদনের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ অনেক বেশি। নূন্যতম চাহিদা মিটাতে গিয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ৩৮,৯০,৭০,০০০ টাকা ঋণগ্রস্থ হয়েছেন। উক্ত ঋণের বোঝা পূর্ব বাংলার উপরও বর্তিয়েছে।[৪৬]১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট নতুন প্রদেশ হিসেবে পূর্ব বাংলার যাত্রার দিনে সরকারি গুদামগুলির মধ্যে এক মাসের উপযোগী শস্যও মজুদ ছিল না।[৪৭]

বাংলা বিভক্তির পরপরই পূর্ব বাংলায় দুটি বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে প্রবল বন্যায় নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলার ৫০০ বর্গমাইল এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ৫ লক্ষ লোক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে কক্সবাজারে সাইক্লোন আঘাত হানে এবং প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এলাকার ঘর বাড়ি, গবাদী পশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারকে হিমশিম খেতে হয়।[৪৮]

যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম রেলওয়ের অবস্থাও ছিল নাজুক। অবিভক্ত ভারতের ৯টি রেলওয়ের মধ্যে দেশ ভাগের পর ভারতে ৭টি এবং পাকিস্তানে ২টি রেলওয়ে ভাগে পড়ে।এর মধ্যে পূর্ব বাংলায় ছিল ১টি।[৪৯] বাংলায় কোন রুলিং স্টক ছিল না। রিপিয়ার করার কোন ওয়ার্কশপও ছিল না। প্রধান ওয়ার্কশপ ছিল ভারতের কাঁচরাপারা (Kanchrapara)। (উল্লেখ্য যে, এ অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সীমানা কমিশন এ অঞ্চলটিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন)। অবিভক্ত বাংলার ৪,৭০০ ওয়াগণের মধ্যে ২,২০০ ওয়াগণ কাঁচরাপাড়ায় আটকা পড়ে ছিল। তাছাড়া রেল গাড়ির ড্রাইভার, ফায়ারম্যান এবং স্টেশন মাস্টার পাকিস্তান থেকে আনা হতো। পূর্ব বাংলায় কোন অভিজ্ঞ ড্রাইভার, স্টেশন মাস্টার ছিল না।[৫০] সারণি-৫ এ অবকাঠামোর একটি পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সারণি ৬ : অবকাঠামোর ধরন ও পরিমাণ[৫১]

অবকাঠামোর ধরন	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
চলাচল উপযোগী সড়ক	২৪০ মাইল	৫,০৫০ মাইল
রেল সড়ক	১৭০৩ মাইল	৫,৩৪৪ মাইল
বিদ্যুৎ	১০,৭০০ কিলোওয়াট	৩৮,৮০০ কিলোওয়াট
সেচ খাল	-	১০ মিলিয়ন হেক্টর

[৪৬] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ৩ জুন ১৯৪৮ (পাকিস্তান সরকারের প্রেস নোটে প্রকাশ)।

[৪৭] SL. No. 48, List No. 148, Bundle: 48, Proceeding-B File No. 13 P-5/48, May-July, 1949, *Bangladesh National Archives*.

[৪৮] *Daily Dawn*, 5 November 1947.

[৪৯] *Pakistan Far Eastern Survey*, 1955, p. 184; শফিকুর রহমান, *পাকিস্তানের অর্থনীতি* (ঢাকা: কেন্দীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ১২৪।

[৫০] *Ibid*., 23 February 1948.

[৫১] *Pakistan Far Eastern Survey*, 1955, p. 184; শফিকুর রহমান, *পাকিস্তানের অর্থনীতি* (ঢাকা: কেন্দীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭), পৃ. ১২৪।

পূর্ব বাংলায় পোস্ট অফিসের একই অবস্থা ছিল। ৯০ ভাগ মেইল সর্টার ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেয়। পাশাপাশি ৮৫ ভাগ পোস্টম্যানও ভারতে চলে যায়। ফলে দেশ ভাগের পর প্রথম দুই মাস বাস্তবিক অর্থে কোন চিঠি ডেলিভারী হয়নি। এ সময়ে মানি অর্ডার ডেসপাচ না হওয়ায় প্রায় ৪ কোটি টাকা আটকা পড়ে ছিল।[৫২]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার মানও প্রত্যাশিত ছিল না। শহরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার রিকুইজিশান করায় শিক্ষার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ইন্টারমেডিয়েট কলেজগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকার ফলে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কলকাতায় থাকার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনগ্রসর থেকে যায়।[৫৩] তাছাড়া দেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৫ ভাগ শিক্ষক এবং ৯০ ভাগ ছাত্র হিন্দুস্তানে চলে যায়।[৫৪] পাশাপাশি সারাদেশের সকল কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ভারতে চলে যায়। তাছাড়া জুট রেগুলেশন ও সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে ভাল বেতন পেয়ে বহু শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায়।[৫৫] বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার হার অনেক কমে গিয়েছিল। দেশ ভাগের সময় পূর্ব বাংলায় শিক্ষার হার ছিল ১১%,[৫৬] ফলে মাধ্যমিক স্কুলগুলি অচল অবস্থায় পড়ে থাকে।[৫৭]

নতুন সরকারের সমস্যাসমূহ

দেশ ভাগের শুরুতেই পূর্ব বাংলা আর্থিক সংকটে পড়ে। দেশ ভাগের সময়ে পার্টিশন কাউন্সিল মার্কেট ভেল্যুর পরিবর্তে বুক ভেল্যু মেনে নেয়ার ফলে পূর্ব বাংলা মোটা অংকের অর্থ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।[৫৮] অপরদিকে পাকিস্তানের জন্য বণ্টনকৃত ৫৫ কোটি টাকার সিংহভাগ পূর্ব বাংলার অংশ ছিল যা ভারত সরকার ফেরৎ দেয়নি।[৫৯] এ অবস্থায় ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পূর্ব বাংলা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে।[৬০] তাছাড়া দেশ ভাগের পর অনেক উচ্চবিত্ত জমিদার গোষ্ঠী এবং মহাজন গ্রুপ (হিন্দু

---

[৫২] *Ibid.*

[৫৩] *দৈনিক আজাদ*, ৫ জানুয়ারি ১৯৪৮।

[৫৪] আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবনঃ আত্মজীবনী* (ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১৫৫।

[৫৫] *দৈনিক আজাদ*, ১৫ মে ১৯৫০।

[৫৬] *EBLAP*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March 25, 1948), Pp. 98-99.

[৫৭] *EBLAP*, Official Report, Fifth session 1949-50, p. 62.

[৫৮] *দৈনিক আজাদ*, ৭ জানুয়ারি ১৯৪৯; রেহমান সোবাহন "বাঙালী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি" সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০), পৃ. ৬৮২।

[৫৯] *দৈনিক আজাদ*, ৭ জানুয়ারি ১৯৪৯।

[৬০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র*, প্রথম খণ্ড (ঢাকাঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২) (পরবর্তীতে শুধু *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র* লেখা হবে), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫; ঋণগ্রস্থ খাতগুলি হলো (১) রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট দেনা (২)

ব্যবসায়ী) তাদের অর্থ কড়ি নিয়ে ভারতে চলে যাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষির উপর মারাত্মক চাপ পড়ে। ফলে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে।[৬১] এ পরিস্থিতিতে "জিন্নাহ রিলিফ ফান্ড" গঠন করে গোটা পাকিস্তান হতে অর্থ সংগ্রহ করে জরুরি অবস্থা মোকাবিলার চেষ্টা করা হয়।

এ সময় পূর্ব বাংলার সিভিল প্রশাসন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। দেশ ভাগের পূর্ব হতেই একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতিত সকল মুসিলম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখ করার মতো কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না।[৬২] দেশ ভাগের পর মোট ৮৩ জন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট পাকিস্তান ডমিনিয়নে যোগ দেয়। তার মধ্যে মাত্র একজন ছিল বাঙালি।[৬৩] ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে উচ্চ পদে কর্মরত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের একটি পরিসংখ্যান সারণি-৬ এ দেখানো হলো:

সারণি-৭ ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মরত সিভিল সার্ভেন্ট[৬৪]

প্রদেশ/অঞ্চল	প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা (সচিব)	প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা (যুগ্মসচিব)	প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা (উপসচিব)
অপাকিস্তানী (ব্রিটিশ শাসনামলে নিয়োজিত বৃটেনের কর্মকর্তা যারা পাকিস্তানে চাকুরী করতে ইচ্ছুক ছিলেন)	২	২	৫
পাঞ্জাব	৫	৭	২৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল	১	০	২
মাইগ্রেন্ট (ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পাকিস্তান ডমিনিয়নে যোগদান করা সরকারি কর্মচারি)	৫	৯	১৯
পূর্ব বাংলা	০	১	৪
সিন্ধু	০	০	১
মোট	**১৩**	**১৯**	**৫৯**

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড (৩) বেসামরিক আমানতাদি (৪) অনাদায়ী ট্রেজারী বিলসমূহ (৫) খাদ্য ক্রয় খাতে ঘাটতি জমা (৬) সরকারি চাকুরীয়াদের পাওনাসহ চুক্তিগত দেনা।

[৬১] সালাহ উদ্দিন আহমদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২৩।

[৬২] Rafique Afzal, *op.cit.*, p. 105.

[৬৩] Ralph Braibanti, "Public bureaucracy and Judiciary in Pakistan" in Joseph La Palombara (ed.), *Bureaucracy and Political Development*, Princeton, 1963, Pp. 360-440; *Constituent Aseembly (Legislature) of Pakistan Debates*, Official Report, 1948-54, Vol. I, No. 26 (July 17, 1954), p. 1474 (পরবর্তীতে শুধু *CAD* ব্যবহার করা হবে)।

[৬৪] *CAD*, Vol. I, No. 18 (April 5, 1952), pp. 63-64; M. Rafiq Afzai, *Political Parties in Pakistan 1947-1958*, Vol. I (National Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, 1986), Pp. 105-106.

অবিভক্ত বাংলার মোট সরকারি কর্মচারীর এক-চতুর্থাংশ কর্মচারী নিয়ে যুক্ত বাংলার শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার যাত্রা শুরু করে নাজিমউদ্দীন সরকার। তাছাড়া মুসলিম লীগের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ও সচেতন ব্যক্তির অভাবের কারণে[৬৫] সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে কার্যকরি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। পাশাপাশি অপ্রতুল সম্পদ ও অনগ্রসর শিক্ষার কারণে নতুন রাষ্ট্রে বাস্তবে প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করানো কঠিন ছিল।[৬৬] ফলে নির্বাহী বিভাগে এক বৎসরেও কার্যকরি প্রশাসন তৈরি করা যায়নি। স্বরাষ্ট্র বিভাগে ৩০০ অফিসারের পদ শূন্য ছিল। পুলিশ প্রশাসনে ২,৫০০ লোকবলের ঘাটতি ছিল। ফলে প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে তিন থেকে চার জন কনস্টেবলের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা হতো।[৬৭] এ রকম নাজুক পরিস্থিতির কারণ হলো, দেশ বিভাগের পর অধিকাংশ হিন্দু কর্মচারিরা ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে। জুডিসিয়াল অফিসারদের অধিকাংশই পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। সিভিল কোর্ট এর অধিকাংশ অফিসারও ছিল হিন্দু। তারা চলে যাওয়ার ফলে প্রায় সকল জেলায় সিভিল কোর্ট অনেকগুলিই বন্ধ হয়ে যায়। নতুন যাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয় তাদের অনভিজ্ঞতার কারণে বিচার ব্যবস্থায় জট সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রায় দুই তিন হাজার আপিল এবং দুই তিন শত সেশন ঝুলে থাকে।[৬৮] যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি পূর্ব বাংলার প্রশাসনে ছিল তাদের অধিকাংশ অবাঙালি এবং উর্দু ভাষী যারা ভারত থেকে মাইগ্রেট করে এসেছিল[৬৯] এবং তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে রাষ্ট্র অনেকটাই আমলা নির্ভর হয়ে পড়ে। এর প্রমাণ মিলে আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বক্তব্য থেকে। তিনি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে এ অবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।[৭০] এ রমক পরিস্থিতিতে খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব বাংলায় মূখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

---

[৬৫] অর্থমন্ত্রী গোলাম মুহম্মদ গণপরিষদে উক্ত বক্তব্য তুলে ধরেন, *CAD*, Vol. I, No. 8 (March 22, 1950), p. 292.

[৬৬] পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের কংগ্রেস সদস্য যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস বলেন, ব্রিটিশদের সময়ে বাংলায় শতকরা ১১ জন লেখাপড়া শিখতে পেরেছে। যার ফলে বাঙালি অনগ্রসর হয়ে পড়েছে। *EBLAP*, Official Report, 1948, Vol. I, No. 2 (March 25, 1948), Pp. 98-99.

[৬৭] *Daily Dawn*, 1 March 1948.

[৬৮] *EBLAP*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March 24, 1948), Pp. 81-83.

[৬৯] Khalid Bin Sayed, *The Political System of Pakistan* (Dhaka: Oxford University Press, 1967), Pp. 60-62.

[৭০] মাওলানা ভাসানী বাজেট বক্তব্যে বলেন, স্বাধীন দেশে, স্বাধীন পাকিস্তানে স্পেশাল পাওয়ারের মন্ত্রী দ্বারা বাজেট পেশ হবে তা আমরা কখনো আশা করিনি। জনসাধারণের মনের কথা, মনের দুঃখও বেদনা বুঝবার তার শক্তি নাই কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তার আদৌ কোন সংশ্রব নাই। ... বিংশ শতাব্দীর এই গণতান্ত্রিক যুগে এই স্বাধীন দেশে গভর্নর জেনারেল স্পেশাল পাওয়ার ব্যবহার করবেন এটা আমাদের ধারণার অতীত। *EBLAP*, Official Report, Vol. I, No. 1 (March 19, 1948); হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশর স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র:* ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩ ।

খাজা নাজিমউদ্দীন সরকারের কর্মকাণ্ড

মন্ত্রি-পরিষদ এবং সরকারি কর্মচারিদের বেতন থেকে সরকারি ফান্ডে অর্থ প্রদান

অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এবং প্রশাসনিক যন্ত্রের ভঙ্গুর অবস্থায় খাজা নাজিমউদ্দীন-এর সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রথম কয়েক মাস কেটে যায় অফিস রিকুইজিশন এবং কনস্ট্রাকশন কাজ সম্পাদন করার পিছনে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ১০ ডিসেম্বর খাজা নাজিমউদ্দীনের বাসভবন 'বর্ধমান হাউজ'-এ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এক জরুরি বৈঠক হয়, বৈঠকে যে কোন দূর্যোগ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক ডেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব করা হয়।[৭১] অর্থনৈতিক মন্দা দূর করার জন্য সরকার ১৯৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি কেবিনেট মিটিংএ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্তটি[৭২] হলো, পূর্ব বাংলার মন্ত্রি-পরিষদ তাদের বেতন থেকে ১ হাজার টাকা করে কেটে সরকারি ফান্ডে জমা দিবে। মূখ্যমন্ত্রী ১২০০ টাকা প্রদান করবেন। ১ জানুয়ারি ১৯৪৮ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরি হবে এবং ১ ফেব্রুয়ারির বেতন থেকে এ অর্থ কেটে নেয়া হবে। মূখ্যমন্ত্রী ৩,০০০ টাকা বেতন থেকে ১,৮০০ টাকা উত্তোলন করবেন। মন্ত্রিপরিষদ ২,৫০০ টাকা বেতন থেকে ১,৫০০ টাকা উত্তোলন করবেন। মন্ত্রি-পরিষদ সরকারি কর্মচারিদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, জাতীয় দূর্যোগ মুকাবিলার জন্য তারা যেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাদের বেতন কমিয়ে নেয়। যারা ১,০০০ এবং তার উপরে বেতন পায় তারা ৫% এবং যারা ৭৫০-১,০০০ টাকা বেতন পায় তারা ২.৫% অর্থ দেয়ার জন্য বলা হয়।

প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি

সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয় যে, কোন সরকারি কর্মচারি রাজনৈতিক বিতর্কে (controversy) প্রকাশ্যে (publicly) অংশ নিতে পারবে না। যদি কেউ উক্ত নির্দেশ ভঙ্গ করে তাহলে সরকারী কর্মচারি আচরণ বিধি (Government Servants Conduct Rule) অনুযায়ী শাস্তির বিধান করা হবে।[৭৩] সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টরে লোক নিয়োগ করা হয়। প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে ৫৫ জন অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। প্রমোশন বোর্ড (promotion board) গঠন করে সিভিল সার্ভিসের পদ পূরণসহ যোগ্যদেরকে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। সরকার 'সাব অর্ডিনেট পার্সোনেল বোর্ড' গঠন করে ৩,০০০ কর্মচারিকে আত্মীভূত (absorb)

---

[৭১] *Daily Dawn*, 11 December 1947.

[৭২] *Ibid.*, 15 January 1948.

[৭৩] SL. No. 2. Bundle No. 2, Proceedings–B, List No. 83, Political (Home) Records, File No. 26-1/48. *Bangladesh National Archives*.

করে নেন।[৭৪] চাকুরীতে ৩০% সিডিউল কাস্ট হিন্দুদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়। পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডেও ৩০% সিডিউল কাস্ট হিন্দু নিয়োগ দেয়া হয়।

সিভিল সার্ভিসে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্বে সমতা বিধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কোটা পদ্ধতিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।[৭৫] এর মধ্যে ১৫% মাইগ্রেন্টদের জন্য অবশিষ্ট ৮৫% সমান ভাবে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত করে দেয়া হয়।[৭৬] কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোটা পদ্ধতি চালু করেও সমস্যার সমাধান করা যায়নি। কারণ দেশ ভাগের পর সরকারি চাকুরিজীবীদের পাকিস্তান কিংবা ইন্ডিয়ান ডোমিনিয়নে যোগদানের বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হলে কতিপয় বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক চাকুরিজীবী পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানকে বেছে নেয়। দেশ বিভাগের পর প্রায় ৭৫,০০০ (পচাত্তর হাজার) রেল বিভাগের কর্মচারী ও তাদের পরিবার পূর্ব বাংলায় চলে আসে।[৭৭] প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক জনবল থাকাতে একদিকে অর্থনীতির উপর মারাত্মক চাপ পড়ে অপরদিকে নতুন করে নিয়োগ দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।[৭৮] অধিকন্তু, প্রাথমিক অবস্থায় কোটা পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ পূর্ব বাংলায় কোন উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি।[৭৯]

সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব সিভিল প্রশাসনের চেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল। মূলত দেশ ভাগের পূর্ব থেকেই এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। কারণ, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যুদ্ধপ্রিয় বা সাহসী জাতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। সেক্ষেত্রে পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল অনেক এগিয়ে ছিল। স্বাধীনতার পর আর্মড ফোর্সেস পার্সোনেল তাদেরকেই সামরিক বাহিনীতে অগ্রাধিকার প্রদান করে। সামারিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলা থেকে প্রতিনিধিত্বের দাবি করা হলে নাজিমউদ্দীন সরকারের আমলেই ১৯৪৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম সামরিক বাহিনীর ইউনিট 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট' প্রতিষ্ঠা

---

[৭৪] *Daily Dawn*, 1 March 1948.

[৭৫] *EBLAP*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March 24, 1948), p. 9.

[৭৬] মাইগ্রেন্টদের জন্য রাখা ১৫% কোটা পদ্ধতি ১৯৫০ সালে বাতিল করে ২০% মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। বাকী ৮০% পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমতা বিধান করা হয়।

[৭৭] ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্ত প্রদেশ ও কলকাতায় মুসিলম হত্যাযজ্ঞের কারণে এবং চাকুরী হতে অব্যাহতি দানের কারণে এ সকল কর্মচারী পূর্ব বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। SL. No. 48, List No. 148, Bundle: 48, Proceeding-B, File No. 13 P-5/48, May-July, 1949, *Bangladesh National Archives*.

[৭৮] ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী আশংকা প্রকাশ করে বলেন, যত সংখ্যক সরকারি চাকুরিজীবি পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার মনস্তাপ করেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। যে সময়ে সরকার অর্থনীতির কৃচ্ছতার বিষয়টি প্রাধান্য দিচ্ছে এ সময়ে অতিরিক্ত জনবল অর্থনীতিকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। *CAD*, Vol. I, No. 3 (February 28, 1948), Pp. 30-31.

[৭৯] *CAD*, Vol. I, No. 7 (March 21, 1950), p. 258.

করা হয়।[৮০] উক্ত ইউনিটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়, কিন্তু অনেকেই সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে অনিহা প্রকাশ করে।

সামরিক বাহিনীতে যোগদানের বিষয়ে পূর্ব বাংলার লোকদের অনিহার কারণ খুঁজে বের করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিশন গঠন করেন। কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পূর্ব বাংলার লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মরক্ষার বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ছেড়ে দিয়েছে।[৮১] সুতরাং বারবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এবং মন্ত্রীদের মাধ্যমে বিভিন্ন মিটিংএ প্রচারণা চালিয়েও সামরিক বাহিনীতে যোগদানের জন্য পূর্ব বাংলা থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলা সরকার ১,৫০,০০০ আনসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত ফোর্সকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। দেশের জরুরি অবস্থায় এই বাহিনী জাতীয় মিলিশিয়া (বেসরকারি বাহিনী) হিসেবে কাজ করবে। অস্ত্র পরিচালনায় সক্ষমতার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১৫,০০০ আনসারকে প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৮২]

সীমান্ত বাহিনী গঠন

পূর্ব বাংলার সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে খাদ্য শস্য পাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে সরকার 'পাকিস্তান সীমানা বাহিনী' নামক এক বিশেষ সামরিক চৌকি (Cordoning) বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করেন। ১,৪৪২ জন লোক নিয়ে গঠিত বাহিনীর মধ্যে ১,২৮০ জন সাধারণ সিপাহী, ১২৮ জন সেকশন কমান্ডার, ৮ জন কোম্পানী কমান্ডার, ২ জন সহকারী কমান্ডার এবং ২ জন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত বাহিনী বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।[৮৩] সরকার পূনর্বসতি ও পূনর্নিয়োগ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৮,৪৪২ জনকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ প্রদান করেন।[৮৪] তাছাড়া সরকারি কর্মচারিদের পেনশন সুবিধা প্রদানের জন্য সরকার 'পেনশন পেপারস' তৈরি করার নির্দেশ জারি

---

[৮০] *Daily Dawn*, 17 February 1948.

[৮১] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী ড. মাহমুদ হোসাইনকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশন তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিলেও তা প্রকাশ করা হয়নি। তবে সে সময়কার কমাণ্ডার ইন চীফ, পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মাদ আয়ুব খান রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য দেন। *CAD*, Vol. I, No. 7 (January 18, 1955).

[৮২] *Daily Dawn*, 16 February 1948.

[৮৩] সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তি। *দৈনিক আজাদ* ২০ জানুয়ারি ১৯৪৮; *সাপ্তাহিক নওবেলাল* ২২ জানুয়ারি ১৯৪৮।

[৮৪] *দৈনিক আজাদ*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৯।

করে।[৮৫] সরকার প্রত্যেক অফিসের বার্তা বাহক, পিয়ন এবং অধ:স্তন কর্মচারিদের জন্য ছাতা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রত্যেক বিভাগকে কর্মচারির তালিকা প্রদানের নির্দেশ দেন।

শিক্ষা বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ

শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পূর্ব বাংলা সরকার ৫০ জন সদস্য নিয়ে পূর্ব বঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন। শিক্ষা বোর্ডের জন্য একটি ওয়ার্কি কমিটিও গঠন করা হয়।[৮৬] সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক মর্যাদা দেন এবং সকল উচ্চ মাধ্যমিক কলেজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করেন। "ওল্ড ঢাকা সেকেন্ডারী এন্ড ইন্টারমেডিয়েট বোর্ড" এর স্থলে 'দ্যা ইস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেন্ডারী' করা হয়।[৮৭] পূর্ব বঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্ব প্রথম পূর্ব বাংলায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা চালু হয়। পরীক্ষায় ৩৫ হাজার ছাত্র–ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে।[৮৮] সরকারের বিশেষ উদ্যোগে কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়াকে তিনশত ছাত্রসহ ঢাকায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়।[৮৯] সরকার চিটাগাং গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ এবং গভর্নমেন্ট ভেটেরেনারী কলেজ স্থাপন করেন।[৯০] সরকার সিডিউল কাস্ট হিন্দুদের শিক্ষার জন্য ৪ লক্ষ রুপি এবং পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের জন্য ১২ লক্ষ রুপি মঞ্জুর করেন।[৯১]

১৯৪৭-৪৮ সেশনের বাজেটে শিক্ষা খাতে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।[৯২] পূর্ব বাংলা সরকার এক সার্কুলার জারির মাধ্যমে ১৯৪৯ সাল থেকে সকল সরকারি এবং আধা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রমজান মাসে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৯৩] সরকার এক সার্কুলারের মাধ্যমে প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শনি ও রবিবারের পরিবর্তে বৃহস্পতি ও শুক্রবার বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার অর্ধ দিবস এবং শুক্রবার পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকবে। উক্ত আদেশ সরকারি ও আধা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়।[৯৪]

---

[৮৫] SL. No. 2, Bundle No. 2, Proceedings-B, List No. 83, Politieal (Home) Records, File No. IE-19/49. *Bangladesh National Archives.*

[৮৬] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ১৭ মে ১৯৪৮।

[৮৭] *Daily Dawn*, 2 January 1948.

[৮৮] *দৈনিক আজাদ*, ৩ মে ১৯৪৮।

[৮৯] *Daily Dawn*, 2 January 1948.

[৯০] *দৈনিক আজাদ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৪৮।

[৯১] *ঐ*, ৯ সেপ্টেম্বের ১৯৪৮।

[৯২] *EBLAP*, Official Report, Vol. I, No. 1 (March 16, 1948).

[৯৩] SL. No. 2. Bundle No-2, Proceedings –B, List No. 83, Politieal (Home) Records, File No. 2v-1/49, *Bangladesh National Archives.*

[৯৪] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২২ জানুয়ারি ১৯৪৮।

চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন

চিকিৎসা সেবা বিস্তৃতির লক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয় এবং ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। পাশাপাশি সিলেটে স্বল্প পরিসরে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়। কলকাতা কলেজের অভিজ্ঞ মুসলিম স্টাফ দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জনবল বৃদ্ধি করা হয় এবং ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়।[৯৫] ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হলেও সেসময়ে ইমারজেন্সী, আউটডোর, প্যাথোলজি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও গলা, প্রসূতি, এক্সরে, কার্ডিওলোজী, যৌনব্যাধী, দন্ত চিকিৎসা, চর্ম চিকিৎসা ও ব্লাড ব্যাংক ছিল না। দেশ ভাগের পরেই এগুলি খোলা হয়েছে। [৯৬] পূর্ব বাংলার মেডিকেল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের ছত্রিশ জন ছাত্র বিভিন্ন দাবি নিয়ে ধর্মঘট ও অনশন করলে সরকার ছাত্রদের দাবির পক্ষে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৯৭] নার্সিং ও চ্যারিটি শিক্ষার অংশ হিসেবে ঢাকায় চ্যারিটি নার্সিং ও ফার্স্ট এইড শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। জন স্বাস্থ্য মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার অল্পদিনের মধ্যে অনুরূপ ১০টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঘোষণা দেন।[৯৮]

পূর্ব বাংলা সরকার ১৯৪৮-৪৯ সেশনে পল্লী জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রথম দফায় অগ্রিম সাহায্য বাবদ ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ডিস্ট্রিক বোর্ডসমূহকে প্রদান করেন।[৯৯] ম্যালেরিয়া দূর করার লক্ষ্যে ঢাকা ও শহরতলীতে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ হাজার গ্যালন মশক নিধন রাসায়নিক দ্রব্য এবং ৪০০ পাউন্ড ডি.ডি.টি ছড়ানো হয়। ২৫ লক্ষ টাকার কুইনাইন ক্রয় করে বিনামূল্যে গ্রামাঞ্চলের স্কুল ছাত্র–ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। তাছাড়া সরকার ৩০ লক্ষ পলড্রিন ট্যাবলেট ক্রয় করে দেশের সর্বত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, এ সময়ে প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া এবং ২৫ হাজার লোক কলেরা ও বসন্তে মারা যেত।[১০০] সরকার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২২ টি থানা ডিসপেনসারি এবং রাজশাহী, খুলনা

---

[৯৫] *Daily Dawn*, 1 March 1948.

[৯৬] *দৈনিক আজাদ*, ১০ জুন ১৯৫৩ (ব্যবস্থাপক পরিষদে তোফাজ্জল আলীর বক্তব্য থেকে নেয়া)

[৯৭] সিদ্ধান্তগুলি হলো ১. ফ্যাকালটি পরীক্ষা মার্চ এবং এপ্রিলের পরিবর্তে ৩ মে এবং ১ জুন অনুষ্ঠিত হবে। ২. চলতি বছর পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রের অনুমোদন দেয়া হলো। ৩. এম. বি কোর্স চালুর বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হবে। ৪. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেডিকেল ছাত্রদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড এবং আলাদা কেন্টিনের ব্যবস্থা করা হবে। ৫. অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। *Daily Dawn*, 27 April 1948; *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২২ এপ্রিল ১৯৪৮।

[৯৮] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২২ এপ্রিল ১৯৪৮।

[৯৯] অগ্রিম সাহায্যের মধ্যে রাজশাহী জেলাকে দেয়া হয় ২৯ হাজার, দিনাজপুর ২০ হাজার, যশোহর ২০ হাজার, কুষ্টিয়া ১২ হাজার, রংপুর ৩০ হাজার, বগুড়া ১৪ হাজার, পাবনা ১৫ হাজার, ঢাকা ৩০ হাজার, মোনেশাহী ৪৫ হাজার, ফরিদপুর ২০ হাজার, বাকের গঞ্জ ৩০ হাজার, চট্টগ্রাম ১৯ হাজার, ত্রিপুরা ১৯ হাজার, নোয়াখালী ১২ হাজার, সিলেট জেলায় কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি বলে সিলেট বোর্ড জানিয়েছে।

[১০০] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২৭ মে ১৯৪৮।

ও যশোর জেলায় ১০১ টি ডিসপেনসারির জন্য প্রাথমিকভাবে যথাক্রমে ৩০০ ও ২৫০ টাকা মঞ্জুর করেন। এই অর্থ প্রতি বৎসরই দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[১০১]

হাইড্রো ইলেক্ট্রিক স্কীম এবং টেলিফোন সার্ভিস চালু

খাজা নাজিমউদ্দীন সরকার চট্টগ্রামে হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কীম চালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৮০,০০০ কিলোওয়াট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১০২] সরকার টেলিফোন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর এবং হবিগঞ্জে টেলিফোন ইউনিট গড়ে তোলেন। দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ লিংক স্থাপন করেন।[১০৩]

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আবাসন সুবিধা প্রদান

দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় অনেক নতুন রেল লাইন সংযোগ দেয়া হয়। এর মধ্যে যশোর-দর্শনা ৪৩ মাইল, শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ ৮ মাইল, চাপাই নবাবগঞ্জ-আনমুরা ৮ মাইল এবং সিলেট-ছাতক ২০ মাইল। উক্ত লাইন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।[১০৪] অপরদিকে রেল লাইন সান্তাহার থেকে লালমনিরহাট পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এ সময়ে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল ট্রেন এবং স্টীমার। কয়লা সরবরাহের স্বল্পতার কারণে অনেক ট্রেন এবং স্টীমার সার্ভিসের সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়, তবে ট্রেনের বগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।[১০৫]

পূর্ব বাংলার সিভিল এভিয়েশন আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ৭ জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। ইতিপূর্বে ঢাকা পৌরসভার উন্নয়নের জন্য সরকার সুদ মুক্ত ১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন।[১০৬] সরকারের পূর্ত বিভাগ ৫০০ ফ্যামিলি কোয়ার্টার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রাথমিকভাবে ৫২,০০০০০ (বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মঞ্জুর করেন। সরকার পোস্ট অফিসে জমে থাকা চিঠি দ্রুত বিতরণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক ভাষা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে 'এডিশনাল স্টাফ' নিয়োগ করা হয়। এডিশনাল স্টাফ অন্যান্য ভাষায় লেখা ঠিকানা বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে দিত। এ ব্যবস্থার কারণে তিন মাসের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং মানি অর্ডারের জমে থাকা ৪ কোটি টাকা ডেসপাচ করা সম্ভব হয়।[১০৭]

---

[১০১] *Daily Dawn*, 7 March 1948.
[১০২] *Ibid.*, 25 July 1948.
[১০৩] *Ibid.*, 5 November 1947.
[১০৪] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২৫ মার্চ ১৯৪৮।
[১০৫] *Daily Dawn*, 4 January 1948
[১০৬] *Ibid.*, 18 November 1947.
[১০৭] *Ibid.*, 10 November 1947.

বিচার বিভাগের বিন্যাস

১৯৪৭ সালের ১৭ নভেম্বর পূর্ব বাংলা হাইকোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। পূর্ব বাংলার গভর্নর এবং মূখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম এবং অন্যান্য পাঁচজন বিচারপতি বেঞ্চে তাদের আসন গ্রহণ করেন। অপর পাঁচজন বিচারপতি হলেন যথাক্রমে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, আরনেস্ট চার্লস অরমন্ড (বেরিস্টার এট-ল'), থমাস হবার্ট এলিস এম.এ (অক্সন), আমির উদ্দীন আহমদ, এম.বি.ই.এম.এ, বি.এল এবং আমিন আহমেদ, এম.বি.ই, এম.এ.এলএলবি, বেরিস্টার এট-ল। তাদের সকলকেই পূর্ব বাংলার জন্য অপ্ট করা হয়েছে।[১০৮] এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে ২১ জন মুসলিম মুন্সেফ নিযুক্ত করা হয়।[১০৯]

বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা

দেশ ব্যাপী প্রবল বন্যা এবং বিদেশ থেকে আনা খাদ্য নির্দিষ্ট সময়ে না পৌঁছার কারণে দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। প্রতি বছর পূর্ব বাংলায় খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন হয় ৮০ লক্ষ টন কিন্তু উৎপাদন হয় ৭৮ লক্ষ টন।[১১০] সুতরাং প্রতি বছর খাদ্যের ঘাটতি পড়ে ২ লক্ষ টন। সরকার ১৯৪৮ সালে গ্রামাঞ্চলে ১১ লক্ষ মন চাউল এবং ১৮ লক্ষ মন ধান বিতরণ করেন। রেশন এলাকায় ১৮ লক্ষ মন চাউল এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার মন গম বিতরণ করেন। অনুরূপভাবে রেল ও জাহাজ কোম্পানীর কর্মীদের মধ্যে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার মন চাউল, ১ লক্ষ ২০ হাজার মন ধান এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার মন গম বিতরণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে খাদ্য ঘাটতি এবং বিতরণের একটি তালিকা সারণি-৭ এ দেয়া হলো:

সারণি ৮ : খাদ্য বিতরণ খাত, পরিমাণ ও ঘাটতি[১১১]

খাদ্য ঘাটতি ও বিতরণ	ঘাটতি ও বিতরণের পরিমাণ
ঘাটতি	৩,২০,০০০ পাউন্ড
গ্রামাঞ্চলে বিতরণ	১১,০০,০০০ মন চাউল ১৮,০০,০০০ মন ধান
রেশন এলাকায় বিতরণ (৮ লক্ষ লোক রেশনিং এর আওতাভুক্ত ছিল)	১৮,০০,০০০ মন চাউল ১,৫০,০০০ মন গম
রেল ও জাহাজ কোম্পানীর কর্মীদের মধ্যে বিতরণ	৯,৫০,০০০ মন চাউল ১,২০,০০০ মন ধান ১,৪০,০০০ মন গম
কক্সবাজার সাইক্লোন ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে বিতরণ	৫০,০০০ টাকা ১০,০০০ মন চাউল
নোয়াখালী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিতরণ	৫,০০,০০০ টাকা ২০০টি টিউবওয়েল এবং ২৯০ টন ঢেউটিন।

---

[১০৮] Report on the Administration of Civil Justice in the Province of East Bengal, During the year 1947 (Dacca, East Bengal Government Press, 1953), p. 1.

[১০৯] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ৬ মে ১৯৪৮।

[১১০] SL. No. 48, List No. 148, Bundle: 48, Proceeding-B, File No. 13 P-5/48, May-July, 1949, *Bangladesh National Archives*.

[১১১] *দৈনিক আজাদ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৪৯।

পূর্ব বাংলার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ঘাটতি এলাকায় দ্রুত খাদ্য সরবরাহ এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ও বাণিজ্য সচিব ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় যোগদান করেন। এ বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী, সরবরাহ সচিব এবং আরো দশজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন।[১১২] কৃষকদের দূর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে তাদের প্রকৃত অবস্থা সরকারের নিকট তুলে ধরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটিও গঠন করেন।[১১৩]কৃষকদের স্বার্থে জমিদারি প্রথা বাতিলের জন্য সরকার ইতোমধ্যে খসড়া বিল তৈরি করেন। সরকারের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ সাধন।[১১৪] কক্সবাজারে সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে তাৎক্ষণিকভাবে সরকার ৫০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ মন চাউল বিতরণ করেন। বাড়ি ঘর তৈরির সরঞ্জামাদি প্রদানের জন্য চারটি ফরেস্ট সেন্টারকে দায়িত্ব প্রদান করেন।[১১৫] ঘূর্ণীঝড়ের ফলে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকার জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে কক্সবাজারে একটি বেতার স্টেশন স্থাপন করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সাথে কক্সবাজারের যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন।[১১৬] নোয়াখালীসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তার সাথে ২০০টি টিউবওয়েল, ২৯০ টন ঢেউ টিন প্রদান করা হয়।[১১৭] ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের ২৯ মার্চ পর্যন্ত সময়ে সরকার খুলনা জেলায় ১,১৪১ বেল এবং পূর্বাঞ্চলে ৩৯,৯৮১ বেল কাপড় বিতরণ করেন।[১১৮]

কায়েদে আজম রিলিফ ফান্ডে অর্থ প্রদান ও প্রাপ্তি

দেশ বিভাগের পর জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য এবং বাস্তুত্যাগীদের সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কায়েদে আজম রিলিফ ফান্ড চালু করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১৮ মে পর্যন্ত রিলিফ ফান্ডে মোট জমা পড়ে ৮৩,০৫,৮৩৪ টাকা। পূর্ব বাংলা থেকে রিলিফ ফান্ডে জমা পড়ে ২৪,৪৩,৬৫৯ টাকা[১১৯] (১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত)। রিলিফ ফান্ড থেকে

---

[১১২] *ঐ*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৮।

[১১৩] *Daily Dawn*, 15 January 1948.

[১১৪] *EBLEP*, Official Report, Vol. I, No. 2 (April 6, 1948), p. 111.

[১১৫] *Daily Dawn*, 7 November 1947.

[১১৬] SL. No. 48, List No. 148, Bundle- 48, Proceeding-B, File No. 13 P-5/48, May-July 1949, *Bangladesh National Archives*.

[১১৭] *Ibid.*, 20 November 1947.

[১১৮] পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে রাজেন্দ্র নাথ সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী নূরুল আমিন উক্ত তথ্য প্রদান করেন। *EBLAP*, Official Report,Vol. 2 (June 8, 1948), p. 31. দ্রষ্টব্য: উল্লেখিত সাহায্যের কথা অস্বীকার করে মাওলানা ভাসানী এক বিবৃতি প্রদান করেন। দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ১৯ মার্চ, ১৯৫১।

[১১৯] *Daily Dawn*, 22 January 1948; *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২২ জানুয়ারি ১৯৪৮।

পশ্চিম পাঞ্জাবের বাস্তুত্যাগীদের জন্য দেয়া হয় ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সিন্ধু অঞ্চলের বাস্তুত্যাগীদের জন্য দেয়া হয় ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। বাস্তুত্যাগীদের জন্য দ্রুত কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাকিস্তান স্পীনার ও ওয়েভার এসোসিয়েশনকে দেয়া হয় ১ লক্ষ টাকা। বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল রিলিফ কমিটিকে দু' কিস্তিতে দেয়া হয় ৭২,৫৮০ টাকা।[১২০] ইতিপূর্বে রিলিফ ফান্ড থেকে দেয়া হয়েছে ২৬,৯০,৬৭৪ টাকা। ১৮ মে ১৯৪৮ পর্যন্ত 'কায়েদে আজম রিলিফ ফান্ড' থেকে মোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫৫,২৩,২৫৪ টাকা।[১২১]

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম অধিবেশন এবং বাজেট পাশ[১২২]

১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ ঢাকায় পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন মুনাওওর আলী এমএলএ। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবদুল করিম স্পীকার এবং নাজমুল হক ডেপুটি স্পীকার নিযুক্ত হন। ১৬ মার্চ পূর্ব বাংলা লেজিসলেটিভ এসেম্বলি প্রথম বাজেট ঘোষণা করে। ৫.৭৩ লাখ টাকা ঘাটতি বাজেটসহ মোট ১৬.০৯ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ১.৩৯ লাখ টাকা মূলধনীয় ব্যয়ের (যন্ত্র পাতি ক্রয়, ইমারত নির্মাণ ইত্যাদি খাতে ব্যয়িত অর্থ) জন্য ধার্য করা হয়। রাজস্ব আয় ধরা হয় ১১.৭৫ লাখ টাকা। উন্নয়ন খাতে মোট ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় চলতি বছরের জন্য। পরবর্তী বছরের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন হিসেবে উক্ত বছর ২৫ লাখ টাকা এবং পরবর্তী বছর ৫২ লাখ টাকা ধার্য করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী বছরে উন্নয়নের জন্য ৩০ লাখ টাকা এবং মূলধনীয় ব্যয়ের জন্য ৩৬ লাখ টাকা ধার্য করা হয়। রাজধানীতে স্টাফ কোয়ার্টার ও অফিস বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ৮১ লাখ, রাস্তা তৈরীর জন্য ৩৮ লাখ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ জরিপ এবং হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রকল্পের জন্য ৬ লাখ এবং ক্ষুদ্র বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের জন্য ৭.৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ঘাটতি বাজেটের ১.৪২ লাখ টাকা পুলিশ ফোর্স এবং নির্মাণ কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়।[১২৩] পুলিশ খাতে মোট বরাদ্দ দেয়া হয় ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয় ২,০৩,০০,০০০ টাকা।

কেন্দ্রের সাথে পূর্ব বাংলা প্রদেশের দুবছরের জন্য একটি চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক কেন্দ্র পূর্ব বাংলা প্রদেশকে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা প্রদান করবে, বিনিময়ে কেন্দ্র ১৯৫০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিক্রয় কর (sale tax) পরিচালনা করবে। খাদ্য শস্যের ঘাটতি বাজেট

---

[১২০] যশোর জেলার টর্নেডো বিধ্বস্ত এলাকায় দেয়া হয় ২২,৫৮০ টাকা এবং কক্সবাজারে সাইক্লোন আক্রান্ত এলাকায় দেয়া হয় ৫০,০০০ টাকা।

[১২১] *Daily Dawn*, 19 May 1948.

[১২২] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: *Government of East Bengal, Finance Department*, Budget Session. 1947-1947, March 1948.

[১২৩] *Daily Dawn*, 18 March 1948.

প্রস্তুত করা হয় ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টন। কিন্তু বন্যায় আউস ধানের ক্ষতি হওয়ায় খাদ্য বাজেট পুনরায় স্থির করে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টন ধরা হয়।[১২৪]

প্রচলিত আইনসমূহের সংশোধন ও সময়সীমা বৃদ্ধি

পূর্ব বাংলা সরকার ১৯৪৮ সালের ১৮ মার্চ ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৩টি পুরাতন এ্যাক্ট সংশোধন ও নতুন করে সময়সীমা বৃদ্ধি করেন। নতুন বিলটির নাম হয় The East Bengal Laws (Amendment and Repeal) Bill,১৯৪৮। ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট, সেকশন ৯৩ এর আওতায় কতিপয় সংশোধনীও আনা হয়। এ্যাক্টগুলির মধ্যে ছিল- The Bengal Tenancy Act, ১৮২৫. The Bengal Rent Recovery Act, 1865. The Press Act, 1880. The Bengal Excise Act, 1909. The Bengal Motor Vehicles Tax Act, 1932.[125]

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব এবং মুহম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের আলোকে পাকিস্তান সৃষ্টির যে পরিকল্পনা চলে, তখন থেকেই কতিপয় শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ ভাষার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশ বিভাগের পূর্বেই দেশের বুদ্ধিজীবী মহল ভাষা বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়া উদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব করেন।[১২৬] এভাবেই শুরু হয় ভাষা বিতর্ক। দেশ বিভাগের পর বাংলার কতিপয় লেখক এবং চিন্তাবিদ বাংলা ভাষা বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেন যা পত্রিকা এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশ হয়। প্রবন্ধকারদের মধ্যে ছিলেন– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল হক, মাহবুবর জামাল জাহেদী, দেওয়ান মো. আজরফ, এ.কে. সাজেদুল করিম, মোহাম্মদ জহুরুল হক, এ.এম. খোরশেদ আহমেদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কাশেম, আবুল মনসুর আহমদ প্রমূখ। এ সময় উর্দু ভাষার পক্ষেও অনেকে লেখা লেখি করেন। এদের মধ্যে ডা. আবদুল হক, সাদ আহমেদ উল্লেখযোগ্য।[১২৭] দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে ভাষা নিয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাষা নিয়ে চিন্তা করার কোন অবকাশ ছিল না।। ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে খাজা নাজিমউদ্দীন-এর সরকার প্রথম দিকে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করলেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত রক্ষা করতে যেয়ে

---

[১২৪] *দৈনিক আজাদ*, ১০ জানুয়ারি ১৯৪৮।

[১২৫] *ঐ*, ১৯ মার্চ ১৯৪৮।

[১২৬] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: *দৈনিক আজাদ*, ২৯ জুলাই ১৯৪৭, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা প্রবন্ধ ছিল 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা'। *স্বাধীনতার দলীল পত্র*, প্রথম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪২-৬৪৬; বশীর আল্‌হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৬৭-১৬৮।

[১২৭] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: বশীর আল্‌হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৫।

সরকার বিতর্কিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে উর্দু ভাষার বিষয়ে সরকারের দৃঢ় অবস্থানের কারনে সরকার গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সরকারের কর্মকাণ্ডে পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়া

খাজা নাজিমউদ্দীনের সরকার এবং সরকারের ভূমিকার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কেবল কতিপয় ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলই গড়ে উঠেনি, বরং সারা পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি পাকিস্তানের যানবাহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রব নিশতার সিলেটের এক জনসভায় উপস্থিত হলে, তার সাথে পূর্ব বাংলার শিক্ষা মন্ত্রী আবদুল হামিদ সম্মেলনে আসলে জনতা তাকে লাঞ্ছিত করে। পাশাপাশি আবদুল হামিদ চলে যাও! বলে শ্লোগান দেয়।[১২৮] শেষ পর্যন্ত আলোচনা সংক্ষেপ করে তাদের চলে যেতে হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৮ জানুয়ারি মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে সিলেটের গোবিন্দ চরণ পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় নাজিমউদ্দীন সরকারের পদত্যাগ দাবি করা হয়।[১২৯] সরকারি কর্মচারিরাও নাজিমউদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে।[১৩০]

পূর্ব বাংলা মন্ত্রিসভার দীর্ঘসূত্রিতা, নিষ্ক্রীয়তা ও দুর্নীতি দমনে অক্ষমতা ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করে হবিগঞ্জ জেলা মুসলিম লীগের সহকারী সম্পাদক এ. কে. আবদুন নুর চৌধুরী এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি নিয়োগের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "যেখানে মন্ত্রী আমলাদের মোটা অংকের মাইনা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার উজার হচ্ছে সেখানে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি নিয়োগ দিয়ে রাজভাণ্ডার কপর্দকহীন করে ফেলছে।" তার মতে নাজিম মন্ত্রিপরিষদ "স্বাধীন দেশের মন্ত্রিসভা নয় বরং দেশের স্বাধীন মন্ত্রিসভা।[১৩১] পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য আবদুল লতিফ এমএলএ নাজিমউদ্দীন সরকারের সমালোচনা করে বলেন:

সরকার বিভিন্ন বিভাগে লোক নিয়োগে কোন নীতিমালা প্রণয়ন করেনি। তার মতে, যারা দেশ বিভাগের জন্য অনেক কষ্ট এবং লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে, তাদের সে অবদানকে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে ধরা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে সরকার তা না করে স্বজন প্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে সরকার ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে।[১৩২]

এমনিভাবে সারা দেশে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

---

[১২৮] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৮।

[১২৯] *ঐ*, ৯ জানুয়ারি, ১৯৪৮।

[১৩০] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯।

[১৩১] *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ২২ জানুয়ারি ১৯৪৮।

[১৩২] *ঐ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২।

ব্যবস্থাপক পরিষদে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনেও নাজিমউদ্দীন সরকারের সমালোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, দেশে চুরি, ডাকাতি, নারীদেরকে উৎপাত এবং পুলিশের হয়রানি বেড়ে গিয়েছে। সরকারের উচিত সেগুলি নিরসনে নজর দেয়া।[১৩৩] সুরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত বলেন, দেশের অধিকাংশ পুলিশ বাংলা বুঝে না। সরকারের উচিত বেশি সংখ্যক বাঙালি পুলিশ নিয়োগ দেয়া। অনুরূপ অভিযোগ তুলে ধরেন জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, আমরা স্বাধীন হলেও পুলিশের রূপ বদলায়নি। পুলিশ রক্ষক না হয়ে বরং উৎপীড়ক হয়েছে। সরকারের সেদিকে নজর দেয়া উচিত।[১৩৪] এ কথার সত্যতা মিলে অপর একটি তথ্য থেকে। মুসলিম লীগের বিরোধীতা সত্ত্বেও ঢাকার পুলিশ সুপার ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অঝও দেরকে পদাবনতি করে তার পছন্দ মত ব্যক্তিদের অঝও হিসেবে নিয়োগ দেয়। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকাস্থ মুসলিম লীগ কর্মীবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নিকট একটি প্রতিবাদ লিপি পেশ করেন।[১৩৫]

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং গোবিন্দ চন্দ্র লাল ব্যানার্জী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, সরকার সিভিল সাপ্লাই বিভাগের প্রতি কোন মনোযোগ দিচ্ছে না। দেশে যে কটন মিল রয়েছে তার মাত্র ১০% চাহিদা মেটাতে পারে। এজন্য সিভিল সাপ্লাই বিভাগ রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ উক্ত বিভাগ দেশে ঘুষের রাজত্ব কায়েম করেছে।[১৩৬]

কংগ্রেস দলীয় সদস্য আশালতা সেন বাড়ি রিকুইজিশান বিষয়ে সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সরকার বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ি রিকুইজিশান করছেন। এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিৎ। কংগ্রেস সদস্য প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বাস্তবে প্রশাসনের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। মূখ্যমন্ত্রী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে প্রশাসন তা অবজ্ঞা করে এড়িয়ে যান।[১৩৭]

---

[১৩৩] *EBLAP*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March 24, 1948), p. 25.

[১৩৪] *Ibid.*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March 24, 1948), p. 57 and 59.

[১৩৫] SL. No. 52, File: 32-1 of 1950, Proceedings- B, Political, May 1951-June 1951, *Bangladesh National Archives*

[১৩৬] *Ibid.*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March 24, 1948), Pp. 55 and 56.

[১৩৭] মূখ্যমন্ত্রী অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সরকারকে অতিরিক্ত ১৫ খানা বাড়ি দিলেই হবে, নতুন করে আর রিকুইজিশনের প্রয়োজন হবে না। তার এ কথা accomodation officer কে জানালে তিনি অবজ্ঞার সুরে বলেন,মূখ্যমন্ত্রীর এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই (অধিবেশনে প্রতাব চন্দ্র গুহ রায় এর উদ্ধৃতি থেকে নেয়া)। *EBLAP*, Official Report, Vol. I. No. 2 (March 23, 1948), p. 38.

সরকারের বক্তব্য

তবে নাজিমউদ্দীন সরকারের মন্ত্রিপরিষদ এবং মুসলিম লীগ সদস্যরা বিরোধী দলের এ সকল অভিযোগকে আমলে নেয়নি। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, ঢালাও ভাবে সকল অফিসারকে দুর্নীতির অভিযোগ দেয়া ঠিক নয়। যারা দুর্নীতিবাজ তাদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। সংখ্যালঘুদের অত্যাচার সম্পর্কে তিনি বলেন:

হিন্দুরা অত্যাচারের ভয়ে চলে যাচ্ছেনা বরং তারা মাতৃভূমির মায়া হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তারা হিন্দুস্তানে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে (opt) চলে যাচ্ছে। 'সংখ্যালঘুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচারের নজির বর্তমানে নেই, এমন কি অতীতেও ছিল না। মুসলমানরা সাত শত বছর এদেশে শাসন করেছে। তারা যদি অত্যাচারী হতো তাহলে তাদের রাজত্বকালে দিল্লীতে ১৭০টি মন্দির হতো না।[১৩৮]

হিন্দুদের বাড়ি রিকুইজিশনের বিষয়ে দু'জন মুসলিম লীগ সদস্য মুহম্মদ ইসরাঈল এবং মুহম্মদ আলী বলেন, কংগ্রেস সদস্য গোবিন্দ লাল ব্যানার্জী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, শহরে যত বাড়ি আছে তার বেশিরভাগ বাড়ি হচ্ছে হিন্দুদের,[১৩৯] যেহেতু শহরে হিন্দুদের বাড়ি বেশি সুতরাং রিকুইজিশনে হিন্দুদের বাড়ির সংখ্যা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে কিছুই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না।[১৪০]

আবদুস সবুর খান এবং আওলাদ হোসেন খান বিরোধী দলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলেন যে, বাংলার ৯৯.৫% অফিসার মুসলমান তা ঠিক তবে এর জন্য সরকার দায়ি নয়। কারণ সকল হিন্দু অফিসার পাকিস্তান ডমিনিয়িনকে পঙ্গু করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান ডমিনিয়নে যোগ দেয়। এতে করে পূর্ব বাংলার প্রশাসন অমুসলিম শূন্য হয়ে পড়ে। অপরদিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মুসলমান অফিসারগণ পাকিস্তান ডমিনিয়নে যোগদানের কারণে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায়।[১৪১]

পরিশেষে বলা যায় যে, পূর্ব বাংলায় নাজিমউদ্দীন সরকারের শাসনকাল নানা প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। নবগঠিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভীত ছিল একেবারেই নড়বড়ে। যার প্রভাব সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। তার সাথে যোগ হয় ভাষা বিতর্ক। এ পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন এবং জনগণের মন রক্ষা করা যে কোন সরকারের পক্ষেই কষ্টকর ছিল। তার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নজরদারি নাজিমউদ্দীন সরকারকে উভয় সংকটে ফেলে দেয়। এ সময়ে সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে দুর্নীতির মাত্রা ব্রিটিশ আমলের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পায়। অর্থ এবং যোগ্য লোকের অভাবে সরকার প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করতে পারেননি, ফলে দীর্ঘ এক বছরেও নাজিমউদ্দীন সরকার অফিসগুলিকে সুবিন্যস্ত করতে পারেননি। এ সময়ে যে পরিমাণ

---

[১৩৮] *EBLAP*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March, 23, 1948), p. 17 and 37.

[১৩৯] *Ibid.*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March 23, 1948), p. 16.

[১৪০] *Ibid.*, Official Report, Vol. I, No. 2 (March 23, 1948), p. 23.

[১৪১] *Ibid.*, Official Report, Vol. I, No.2 (March 24, 1948), Pp. 28 and 38.

অর্থনৈতিক সাপোর্ট প্রয়োজন ছিল তা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফেডারেল কাঠামোর মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী যতটুকু প্রাপ্য ছিল তা দেয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় বাজেটে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার সিকি অংশও পূর্ব বাংলাকে দেয়া হয়নি। ১৯৪৭-৪৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯ মিলিয়ন রাজস্ব ধার্য করেছে। এর মধ্যে সামরিক খাতেই ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৪ মিলিয়ন। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭-৪৮ অর্থ বছরে পূর্ব বঙ্গে দালান কোটা নির্মাণের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের পূর্ত বিভাগ উপযুক্ত স্থানে দালান কোটা নির্মাণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছিলেন। বাকী ৩৪ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেরৎ দেয়া হয় (দৈনিক আজাদ, ৬ এপ্রিল ১৯৫০)।

উপসংহার

নবগঠিত রাষ্ট্রের অবকাঠামো এবং শিল্প উন্নয়নকে অবহেলার কারণে রাষ্ট্র বিশেষ করে পূর্ব বাংলা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অপরদিকে মুসলিম লীগের আন্তকোন্দল এবং দলের সংখ্যাস্বল্পতা বাংলাকে কেন্দ্রের নিকট অবহেলার বস্তুতে পরিণত করে। ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে খাজা নাজিমউদ্দীন-এর সরকার প্রথম দিকে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করলেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত রক্ষা করতে যেয়ে সরকার বিতর্কিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাংলা ভাষা বিষয়ে সরকারের অবস্থান এবং বিরোধী দলের প্রতি বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দীর অনুগতদের প্রতি যে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করেছেন তা সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করেছে। সরকারের কঠোর মনোভাবের কারণেই পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণের আস্থায় চিড় ধরেছে এবং জনগণ স্বায়ত্তশাসনের দাবির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অধিকন্তু সরকারের স্বল্প সময়ের সাফল্য অস্বীকার করারও সুযোগ নেই। বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার বিষয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে হয়তো খাজা নাজিমউদ্দীন সরকার একটি কার্যকরী সরকারে পরিণত হতে পারতো।

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

বাংলার মুসলিম প্রশাসনে হিন্দু কর্মচারীদের অবস্থান: প্রেক্ষিত মোগল আমল

মো. আমিরুল ইসলাম*

Abstract: The healthy relation between the Muslims and the Hindus was an important factor for the socio-political life under the Mughal rule in Bengal. Although during the time of subahdars, Hindus had an insignificant share in the official aristocracy of Bengal, with the establishment of the dynastic rule by Murshid Quli Khan, Bengal drifted away from the imperial system of the Mughals. The Nawabs followed a nationalistic policy in administration like the independent Sultans of Bengal. They gave various opportunities to the Hindus on land and in trade and administration and also elevated them to high positions in the state and society. Hence the favourable attitude of Muslim rulers towards the non-Muslims (i.e. the Hindus) has been reflected in their state policies and administrative reorganization of this time. This paper throws light on this aspect of the history of Bengal under the Mughals.

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট হুমায়ুন মাত্র নয় মাসের জন্য গৌড় বিজয় করলেও সম্রাট আকবরের সময়ে এসে তাঁর অন্যতম সেনাপতি খান জাহান ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহল যুদ্ধে কররানী বংশের স্বাধীন সুলতান দায়ূদ খান কররানীকে পরাজিত করে বাংলায় মোগল শাসনের সূচনা করেন। সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশের জন্য অভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর ফরমান জারী করলে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ বা সুবা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[১] তবে বাংলায় কার্যকর

* ড. মো. আমিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য মোগলদের আরও প্রায় আড়াই দশক অপেক্ষা করতে হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ) বিরুদ্ধ শক্তিগুলোকে পরাজিত করে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় সুশৃংখল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মোগল সুবাদারদের অধীনে শাসন ও রাজস্ব বিভাগের ছোটখাট পদে হিন্দুরা নিয়োগ লাভ করলেও এ সময়কালে প্রশাসনের উচ্চ পদসমূহে তাদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ছিল না। কারণ মোগল সম্রাটগণ এ প্রদেশের শাসন কাজের দায়িত্বপূর্ণ পদে সাধারণত মুসলিম কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনুসরণ করতেন। ফলে শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিযুক্ত কর্মচারীর তালিকায় হিন্দুদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলী খান বাংলায় প্রায় স্বাধীন নিযামত প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বাংলা দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের আওতা থেকে অনেকটা দূরে সরে যায়। বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা হলে বাংলার নবাবগণ অধিকহারে প্রশাসনের উচ্চ পদসমূহে হিন্দুদের নিয়োগদানের নীতি গ্রহণ করেন। ফলে এসময় বাংলায় মুসলিম শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন উচ্চপদে বহু হিন্দু কর্মচারী পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সমগ্র মোগল আমলে বাংলার প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সুলতানি আমলে বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে যোগ্য ও প্রতিভাবান হিন্দুদের নিয়োগ দিতেন। এ সময় একদিকে নিয়োগের জন্য উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের না পাওয়া অন্যদিকে দিল্লীর আগ্রাসন ও পার্শ্ববর্তী শত্রু রাজ্যগুলোর হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে দূরদর্শি সুলতানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতা গ্রহণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্, রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ এবং আলা-উদ-দীন হোসেনশাহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ অত্যন্ত উদারভাবে হিন্দুদের সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন করেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলশ্রুতিতে সুলতানি আমলের বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু রাষ্ট্রের উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সুলতানি আমলে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের এ নীতি এ অঞ্চলের স্বাধীন সত্ত্বা টিকিয়ে রাখতে

---

[১] এমাজ উদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ (সম্পা.), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩: রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৪২৬।

যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। কিন্তু বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিশেষ করে সুবাদারদের আমলে প্রশাসনে হিন্দুদের নিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

বাংলায় মোগল শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চ পদসমুহে হিন্দুদের নিযুক্ত না করলেও প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাটগণ কর্তৃক হিন্দু কর্মচারী নিয়োগের উদার নীতি গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিল বাংলা অভিযান সম্পর্কিত একটি বিবরণে হিন্দু ও তুর্কী আমীরদের পরামর্শ সভায় ডাকার উল্লেখ করেছেন।[২] এ ঘটনার উল্লেখ থেকে সহজেই আনুমান করা যায় যে, তাঁর আমীর অমাত্যগণের মধ্যে কয়েকজন হিন্দু স্থান পেয়েছিল। আকবরনামায় আকবরের ছেচল্লিশ জন উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারীর মধ্যে নয় জন হিন্দু থাকার উল্লেখ রয়েছে।[৩] সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর সাম্রাজ্যের তিনটি সুবার দায়িত্ব অর্পণ করেন তিন জন হিন্দু কর্মচারীর উপর। মহারাজা মানসিংহ, রাজা কল্যাণ সিংহ এবং বিক্রমজিৎ সিংহ যথাক্রমে বাংলা, বিহার ও গুজরাটের সুবাদার ছিলেন।[৪] তাঁর অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বীরবল ও টোডরমল ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের একান্ন জন[৫] এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক'শ ষাট জন[৬] উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিল। মোগল সম্রাটদের এ উদার নীতি যে মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তবে এ সময়কালে বাংলার প্রশাসনে কিছুটা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দুরা সুদীর্ঘ সময় ধরে (স্বাধীন সুলতানি আমলে) বাংলার প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাথমিকভাবে এ সুযোগ থেকে তারা অনেকটাই বঞ্চিত হয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় একই রকমের ধারা অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, সুবাদারী আমলে বাংলার মোগল প্রশাসনের সকল উচ্চপদে, শুধু সেনাবাহিনী বা বিচার বিভাগই নয়, রাজস্ব ও হিসাব বিভাগে এমন কি সেনা ও নৌবাহিনীর সাচিবিক দপ্তরেও আগ্রা ও পাঞ্জাব থেকে সম্রাটের নির্দেশে কর্মচারী প্রেরিত হতো। এ সমস্ত লোক বাংলায় স্থায়ী

---

[২] জহীর-উদ্‌দীন মুহম্মদ বাবুর, *বাবুরনামা*, প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহীম খাঁ অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃ. ১৯৯।

[৩] Abul Fazl Allami, *The Akbarnama*, trans. H. Beveridge (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1939), pp. 404-405.

[৪] Sri Ram Sharma, *The Religious Policy of the Mughal Emperors* (London: Asia Pub. 1962), pp. 70-71.

[৫] *Ibid.*, pp. 83-84.

[৬] *Ibid.*, pp. 124-128.

বসতি গড়েনি; তাঁরা সুবাদার পরিবর্তনের সাথে আসতেন এবং আবার ফেরৎ যেতেন।[৭] অর্থাৎ একজন সুবাদার বাংলায় দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে একটি পরিপূর্ণ প্রশাসনিক কাঠামো সংঙ্গে নিয়ে আসতেন। ফলে এসকল পদে স্থানীয় বা হিন্দুদের নিয়োগের কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে মুর্শিদকুলী খানের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র সুবাদারী আমলে প্রায় একত্রিশ জন সুবাদার বাংলা শাসন করেন। এর মধ্যে রাজা মানসিংহ (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একমাত্র হিন্দু সুবাদার। প্রদেশে প্রায় সমান সংখ্যাক দীওয়ান এবং বখশি নিযুক্ত হলেও একমাত্র জওহরমল ছাড়া অন্য সকলেই ছিল মুসলমান। সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে শাহজাদা শাহজাহান বাংলা অধিকার করলে সম্রাটের দীওয়ান মীর্জা মালিকের পরিবর্তে রায় জওহরমল দাসকে তিনি দীওয়ান নিযুক্ত করেন।[৮]

একইভাবে সুবাদারদের শাসনামলে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যান্য উচ্চপদেও হিন্দুদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম। হিন্দুদের সাধারণত সুবাদার, দীওয়ান, বখশি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সংস্থাপনায় নিযুক্ত করা হতো। সুবাদার ফতেহজঙ্গের গৃহসংস্থায় জওহরমল দাস ব্যক্তিগত সহকারী ও দীওয়ান ছিলেন।[৯] রামদাস কাসিম খানের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং রায় কাশীদাস ছিলেন কুলিজ খানের দীওয়ান।[১০] গোলাপ দাস ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গের সৈন্য বিভাগে চাকরি করতেন।[১১] ইসলাম খানের সময়ে রায় ভাওয়াল দাস বাংলার সেনা বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন।[১২] গোলন্দাজ ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ মীর্জা নাথানের হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে বল ভদ্র, বৈকুণ্ঠ নাথ দাস, বদরী দাস, মাধব দাস, শ্যামদাস প্রমুখের নাম বাহারীস্তান-ই-গায়বীতে পাওয়া যায়।[১৩] রাজা টোডরমলের পৌত্র এবং দোহারের পুত্র জগদেবসহ আরো কয়েকজন হিন্দু মনসবদার বাংলায় মোগলদের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন।[১৪] অর্থাৎ খুবই সীমিত সংখ্যক হিন্দু এসময়ে বাংলার প্রশাসনের নিয়োগ লাভের সুযোগ পায়।

---

[৭] এমাজ উদ্দীন আহমদ হারুন-অর-রশিদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।

[৮] মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, খালেকদাদ চৌধুরী অনূ. (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৪). পৃ. ৬২১-৬২২।

[৯] *তদেব*।

[১০] *তদেব*, পৃ. ৪৩৪-৪৩৩।

[১১] *তদেব*, পৃ. ৬০৯।

[১২] *তদেব*, পৃ. ১৪০।

[১৩] *তদেব*, পৃ. ৩২২, ১৩০, ৪২৭, ৩২১, ৪৬৬।

[১৪] *তদেব*, পৃ. ৩১৪।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, সুবাদারদের আমলে বাংলার প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদে নিযুক্ত হিন্দুদের সংখ্যা স্বাধীন সুলতানি আমলের তুলনায় ছিল একেবারেই নগণ্য। তবে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নবাব মুর্শিদকুলী খানের অধীনে বাংলা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়ে গেলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের মৃত্যুর পর প্রাসাদ দ্বন্দ্বে সম্রাটদের ক্ষমতা হ্রাস পেলে মোগল সম্রাজ্যের কয়েকটি সুবায় প্রায় স্বাধীন রাজবংশের শাসনের সূচনা হয়। এগুলোর মধ্যে বাংলা, হায়দ্রাবাদ, লাক্ষ্মৌ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১৫] ফলে এতদিন ধরে ভারত উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে বাংলার প্রশাসনের উচ্চ পদগুলোতে নিয়োগের জন্য যেসব প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আগমন ঘটতো তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় নবাব মুর্শিদকুলী খান ও তৎপরবর্তী নবাবদের এ অঞ্চল থেকেই প্রতিভাবান লোকদের সংগ্রহ করে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করতে হয়। নবাবগণ বাংলায় তাঁদের স্বাধীন শাসন অব্যাহত রাখার জন্য স্বাধীন সুলতানি আমলের মতো বাংলার সকল শ্রেণির জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। নবাবদের এ নীতির ফলে শিক্ষিত হিন্দুরা বিশেষ করে ফার্সী ভাষায় পারদর্শীরা প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়।

বাংলার স্বাধীন নবাবদের শাসনামলে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর নিম্নোক্ত তালিকা কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদান করেছেন।[১৬]

১. দীওয়ান-ই-আলি বা প্রধান মন্ত্রী
২. দীওয়ান খালসা শরিফা বা উজিরমালী
৩. দীওয়ান-ই-তন (তনখার দীওয়ান)
৪. দীওয়ান-ই-বেউতাৎ (ব্যক্তিগত সচিব)
৫. দীওয়ান খান সামান
৬. দীওয়ান-ই-মুবাজাৎ (প্রাদেশিক রাজস্ব সচিব)
৭. নায়েব সুবাদার বা নায়েব নাজিম
৮. মীর বখশি বা সিপাহসালার
৯. বখশি আহাদিয়ান
১০. বখশি সুবাজাৎ
১১. প্রধান সেনাপতির অধীনে বখশি দুয়েম, সুয়েম ও চাহারাম

---

[১৫] Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal*, Vol. 11 (Dacca: university of Dacca, 2006), p. 410 ; এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূ. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১২০।

[১৬] কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, "নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী", *সাহিত্য*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কলিকাতা: সাহিত্য কার্যালয়, মাঘ ১৩০২, পৃ. ৬৮৮-৬৮৯।

১২. বখশি সাগের্দ্দপেসা (চোপদার প্রভৃতির অধিনায়ক)
১৩. হাজারিয়ান (পাঁচ'শ হতে এক হাজার সৈন্যের সেনা নায়ক)
১৪. জমাদার (পদাতিক সেনা নায়ক)
১৫. মুস্তোফী, দীওয়ানি সেরেস্তার সেরেস্তাদার ও মুস্‌রেফ্
১৬. ফৌজদার।

এ ষোলটি প্রধান পদ ছাড়াও তিনি হুজুরনবীস, খাসনবীস, বেকায়ানবীস, মীর তোজক, মীর এমারৎ, সদর-ই
সুদুর, কাজী-উল-কুজ্জাত, মুফতি, রাজস্ব বিভাগে আমিন, কাছারী, কানুনগো, পেশকার, খাজাঞ্জী, মুদ্রা পরীক্ষক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন।

বাংলায় স্বাধীন নিযামতের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে উপরোক্ত প্রধান ও সাধারণ পদগুলোর অধিকাংশতেই হিন্দু কর্মচারী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসময় তারা প্রদেশের দীওয়ান এবং প্রধান উজিরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়। মুর্শিদকুলী খান তাঁর দীওয়ানি বিভাগে সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত করেন।[১৭] অবশ্য মুর্শিদকুলী খানের সময়ে দীওয়ানি বিভাগে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগের যথেষ্ট কারণও ছিল। ইতোপূর্বে বাংলার দীওয়ানি বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী ছিল মুসলমান। তারা একে তো ছিল অযোগ্য তদুপরি অসৎ ও অর্থ আত্মসাৎকারী।[১৮] এ বিভাগে হিন্দুদের নিয়োগের ব্যাপারে সমসাময়িক ঐতিহাসিক সলিমুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তিনি (মুর্শিদকুলী খান) রাজস্ব সংগ্রহ কাজে হিন্দু ছাড়া কাউকে নিয়োগ করতেন না; কেননা ভীতি প্রদর্শন বা শাস্তি দ্বারা সহজেই তাদের এবং সহকারীদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ প্রকাশে বাধ্য করা যেতো। এ ছাড়া তাদের ভীরুতা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের সংঘবদ্ধতা বা উত্থান থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখতো।[১৯] শ্যামাপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেন রাজস্ব আদায়ে হিন্দুদের নিয়োগ করা মুর্শিদকুলী খান প্রায় এক প্রথাতে পরিণত করেছিলেন।[২০] কেবল দীওয়ানি বিভাগেই নয়, মুর্শিদকুলী খান সামরিক বাহিনীতেও অনেক হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।

নবাব মুর্শিদকুলী খান তাঁর শাসনামলে যে সকল হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে, ভূপতি রায় ছিলেন তাঁর খালসার দীওয়ান এবং ঘনিষ্ট পরামর্শদাতা।[২১] দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বিভাগে দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য তিনি সম্রাট

---

[১৭]মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৩), পৃ. ৪৬।

[১৮]Jadunath Sarkar (ed.), *op.cit.*, pp. 409-410.

[১৯]Quote; এমাজ উদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

[২০]শ্যামাপ্রসাদ বসু, *মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাংলা ১৭০০-১৭২৭* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), পৃ. ৭৬।

[২১]Munshi Salimullah, *Tarikh-I-Bangalah*, S. M. Imamuddin (ed.) (Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1979), p. xxi.

আওরঙ্গজেবের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সম্ভবত তিনি বাঙালি কায়স্থ ছিলেন এবং এ কারণেই মুর্শিদকুলী খান তাঁকে নিজের সহকারী নিযুক্ত করেন। কিষেণ রায় নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন।[২২] তাঁকেও তিনি আওরঙ্গেজেবের দরবার থেকে সংগে নিয়ে আসেন।[২৩] ভূপতি রায়ের মৃত্যুর পর সমসাময়িক বাঙালিদের মধ্যে রাজস্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দর্পনারায়ণকে মুর্শিদকুলী খান দীওয়ান নিযুক্ত করেন।[২৪] দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন নবাবের দীওয়ানি কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি নবাবের টাকশালেরও দারোগা ছিলেন।[২৫] সম্ভবত তিনিই বাংলায় প্রথম রায়রায়ান[২৬] উপাধিপ্রাপ্ত হন। মোমেনশাহীর জমিদার শ্রীকৃষ্ণ হালদার নবাবের অধীনে একজন কানুনগো এবং তাঁর পুত্র চাঁদ রায় নবাবের খালসা বিভাগের প্রধান হিসাবে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া রাজশাহীর জমিদার উদয়নারায়ণের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত সৈন্যের মধ্যে লাহারীমল্ল নামক একজন সেনানায়কের নাম পাওয়া যায়।[২৭] দিলপৎ সিংহও নবাবের একজন হাজারী সেনানায়ক ছিলেন। যশোবন্ত সিংহ মুর্শিদকুলী খানের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। নবাব তাঁকে দৌহিত্র সরফরাজ খানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন।[২৮]

সুতরাং বলা যায় মুর্শিদকুলী খান প্রশাসনের একবারে উচ্চপদে মুসলমানদের বিশেষ করে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা পূরণ করলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদে হিন্দুদের নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত হিন্দুরাও মুর্শিদকুলী খানের উদার নীতির সুযোগ গ্রহণ করে। প্রশাসনে নিযুক্ত হিন্দুদের সহায়তায় মুর্শিদকুলী খান অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সকল প্রকার বিপদ মোকাবেলা করে বাংলায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মুর্শিদকুলী খানের এ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার আদর্শকে পরবর্তী নবাব সুজা-উদ-দীনও গ্রহণ করেন। শুজা-উদ-দীনের শাসনামলে (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ) হিন্দু, কর্মচারী ও অভিজাত শ্রেণির প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। আলম চাঁদকে তিনি খালশার দীওয়ান পদে নিযুক্ত করেন এবং রায়রায়ান উপাধি প্রদান করেন। আলম চাঁদ তাঁর কার্যদক্ষতা ও

---

[২২] *Ibid.*, p. 18.

[২৩]আব্দুল করিম, *মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর যুগ*, মোকাদ্দেসুর রহমান অনূ. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৬৬।

[২৪]গোলাম হুসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রী রামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পা.) (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৬৯।

[২৫]আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯।

[২৬]নবাবী আমলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালনকারী রাজকর্মচারীদের রায়রায়ান উপাধি দেওয়া হতো। এটি খান-ই-খানানের সংস্কৃত রূপ।

[২৭]কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গলার ইতিহাস (নবাবী আমল)* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩). পৃ. ৫০।

[২৮]কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, "নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী", পৃ. ৬৯৩।

প্রভুপরায়ণতায় বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। নবাব তাঁর পরামর্শ ছাড়া সাধারণত কোন কাজ করতেন না। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইউসুফ আলী খান তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, আলম চাঁদ, ব্যাংকার জগৎশেঠ ও আলিবর্দী খানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমেদ ছিলেন নবাব শুজা-উদ-দীনের রাজ্যের প্রধান তিনটি স্তম্ভ।[২৯] তাঁর সময়ে যশোবন্ত রায় ঢাকার দীওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং রাজবল্লভ ঐ প্রদেশের সহকারী দীওয়ান ছিলেন। চিন্তামন দাস আজিমাবাদ প্রদেশের দীওয়ান ছিলেন[৩০] এবং নায়েব সুবাদার নন্দলাল আলিবর্দীর অধীনে একজন চরিত্রবান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩১]

নবাব শুজা-উদ-দীন মৃত্যু শয্যায় তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে বাংলার নবাব মনোনীত করেন এবং হাজী আহমেদ, আলম চাঁদ ও জগৎশেঠকে সর্বদা বিশ্বাস ও মান্য করতে উপদেশ দেন।[৩২] নবাব সরফরাজ খান পিতার নির্দেশ অনুযায়ী হাজী আহমেদ, আলম চাঁদ ও জগৎশেঠকে রাজস্ব ও প্রশাসন সংক্রান্ত কাজে মন্ত্রীপদ প্রদান করেন।[৩৩] তিনি খুবই অল্পকাল (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার নবাবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিধায় এ সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না।

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে আলিবর্দী খান বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। হিন্দুদের প্রতি উদার নীতির কারণে তাঁর শাসনামলে হিন্দুরা পূর্ববর্তী যে কোন সময়ের তুলনায় প্রশাসনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় রাজস্ব বিভাগের পাশাপাশি সামরিক ও বেসামরিক সকল বিভাগেই অধিক সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ লাভ করে। নবাব আলিবর্দী খানের অন্যতম প্রভাবশালী অমাত্যদের মধ্যে রাজা জানকী রাম ছিলেন অন্যতম। আলিবর্দী খান বিহারের শাসনকর্তা থাকাকালে জানকী রাম তাঁর দীওয়ান ছিলেন। আলিবর্দী খান প্রথমত তাঁকে দীওয়ান-ই-তান ও ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর দীওয়ান নিযুক্ত করেন। কটকে নবাবের বিপর্যয়ের পর তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নবাবের সৈন্য সংগ্রহে সহায়তা করে আরো বেশি আস্থাভাজন ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন।[৩৪] আফগান সেনাপতিদের হাতে জৈনুদ্দিনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সিরাজ-উদ-

---

[২৯]ইউসুফ আলী খান, *তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূ. (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১৫।

[৩০]করম আলী খান ও আজাদ আল- হোসায়নি, *মোজাফফরনামা ও নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূ. (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ২৬।

[৩১]সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *সিয়ার-উল্-মুতাখিরিন*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূ. (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ৭০।

[৩২]গোলাম হুসেন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।

[৩৩]*তদেব*।

[৩৪]কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, "নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী", পৃ. ৯৫-৯৬; Kali Kinkar Datta, *Alivardi and his times* (Calcutta: University of Calcutta, 1939), p. 39.

দৌলাকে নবাব আজিমাবাদের সুবাদারী প্রদান করেন এবং জানকী রামকে তাঁর নায়েব পদে অধিষ্ঠিত করেন।[৩৫] ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে জানকী রামের মৃত্যু হলে রঙ্গলালের পুত্র রাজা রামনারায়ণ নামক আর একজন হিন্দুকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। রামনারায়ণ আলিবর্দী খানের পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি জৈনুদ্দিন আহমদের সচিব হিসেবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে বিহার সরকারের দীওয়ানের পেশকার হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। ধীরে ধীরে তিনি এ প্রদেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন।[৩৬] এ সময় দুর্লভ রাম নামক আরো একজন হিন্দুকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। দুর্লভ রাম পিতা জানকী রামের সময়ে মুর্শিদাবাদের হিসাব রক্ষা বিভাগের সহকারী দীওয়ান ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে এ বিভাগের দীওয়ান নিযুক্ত করে খিলাত প্রদান করা হয়।[৩৭] তিনি সেনা বিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গিরিয়ার যুদ্ধে আহত আলিবর্দী খানের পুরাতন দীওয়ান রায়রায়ান আলম চাঁদের মৃত্যু হলে চিন রায়কে রায়রায়ান উপাধি দিয়ে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়।[৩৮] তিনি অতীব সামান্য অবস্থা থেকে বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার গুণে রাজস্ব বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকারী বীরু দত্তকে দীওয়ান পদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি বাংলার অর্থ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন।[৩৯] উদরী রোগে বীরু দত্তের মৃত্যু হলে তাঁর সহকারী উমিদ রায়কে সে পদে কাজ করে যেতে আদেশ দেওয়া হয়।[৪০] অল্পকাল পরে প্রয়াত নবাব শুজা খানের দীওয়ান আলম চাঁদের পুত্র কীরাত চাঁদকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়।[৪১] উমিদ রায়কে তাঁর সহকারী হিসেবে রাখা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রায় দু'বছর এ পদে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকারী উমিদ রায়কে নবাব দীওয়ান পদে নিযুক্ত ও রায়রায়ান উপাধিতে ভূষিত করেন।[৪২]

নবাব আলিবর্দী খানের সময়ে জাহাঙ্গীরনগরের দীওয়ান হোসেনকুলী খানের অধীনে গোকুল চাঁদ পেশকার হিসেবে নিযুক্ত হন। অল্পকাল পরেই হোসেন কুলী তাকে পদচ্যুত

---

[৩৫]গোলাম হুসেন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬।

[৩৬]করম আলী খান ও আজাদ আল-হোসায়নি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫; সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭।

[৩৭]সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪; করম আলী খান ও আজাদ আল-হোসায়নি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।

[৩৮]ইউসুফ আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

[৩৯]সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩।

[৪০]ইউসুফ আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

[৪১]সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩।

[৪২]*তদেব*।

করে দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভকে নিজের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন।[৪৩] আলিবর্দী খান বিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও সাহসী রাজারাম হরকরাকে মেদিনীপুরের ফৌজদার হিসেবে নিয়োগ দেন।[৪৪] ব্যাংকার জগৎশেঠ নবাবের উপদেষ্টা পরিষদের একজন অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খানের অধীনে নিযুক্ত অন্যান্য হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে শ্যামসুন্দর ছিলেন তাঁর গোলন্দাজ বিভাগের বখশি, রামরাম সিংহ ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। এছাড়া চিন্তামন দাস, যশোবন্ত নাগর, অমৃতরায়, কিশোর, মানিক চাঁদ প্রমুখ হিন্দু কর্মচারীদের নাম সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়।

নবাব আলিবর্দী খান প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চ পদসমূহে হিন্দু কর্মচারীদের নিয়োগ ও পৃষ্ঠপোষকতার যে উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা অব্যাহত রাখতে পরবর্তী নবাবদের পরামর্শ দিয়ে যান। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পিতামহের উপদেশ থেকে বিচ্যুত হন নি। নবাবী আমলে প্রশাসনের প্রায় সকল বিভাগে হিন্দুদের নিয়োগের যে প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাও তা অব্যাহত রাখেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সময়ে নিযুক্ত সামরিক, বেসামরিক, রাজস্ব ও গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন পদে কর্মরত হিন্দু কর্মচারীদের স্ব-স্ব পদে বহাল রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে যে সকল হিন্দু কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে মোহন লাল, রাজবল্লভ, নারায়ণ দাস, দুর্লভ রাম, মানিক চাঁদ, উমি চাঁদ, নন্দন কুমার, জগৎশেঠ, রাসবিহারী, জানকী রায়, মীরমদন, রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ সিংহ ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৫]

সিরাজ-উদ-দৌলা মোহনলালকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন এবং মহারাজ বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মনসব প্রদান করা হয়।[৪৬] নবাব মোহনলালের পিতা জানকী রায়কেও রায়রায়ান উপাধিতে ভূষিত করে দীওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন।[৪৭] মানিক চাঁদ ও নন্দন কুমারকে যথাক্রমে কোলকাতা ও হুগলির ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল। এ ছাড়া রায় দুল্লভ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ, মীরমদনসহ অন্যান্যরাও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।

এতদসত্ত্বেও এস.সি. হিল, ব্রিজেনগুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ প্রাক-পলাশী বাংলার সাম্প্রদায়িক দ্বিধা বিভক্ত সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, পলাশী যুদ্ধের পূর্বে বাংলার সমাজ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, মুসলমান শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমান নবাবদের শাসনাবসান কামনা করছিল;

---

[৪৩]ইউসুফ আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫।

[৪৪]করম আলী খান ও আজাদ আল-হোসায়নি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

[৪৫]গোলাম হুসেন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২-২২৭; করম আলী খান ও আজাদ আল-হোসায়নি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১২৩; Jadunath Sarkar (ed.), *op.cit.*, pp. 472-473.

[৪৬]গোলাম হুসেন সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২-১২৩।

[৪৭]ইউসুফ আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

যার পরিণতি ছিল পলাশীর বিপর্যয়।[৪৮] কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় নি। বরং নবাবী আমলে বিশেষ করে নবাব আলিবর্দী ও সিরাজ-উদ-দৌলার সময়ে অধিকাংশ উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী ও জমিদার ছিলেন হিন্দু। অর্থাৎ শাসন ব্যাপারে তারা মুসলমান নবাবদের সাথে অত্যন্ত কার্যকরভাবে জড়িত ছিলেন। এমনকি পলাশীর যুদ্ধে মোহনলাল, মীর মদন ও রাজা মানিকচাঁদসহ অনেক হিন্দু প্রাণপণে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং পলাশীর ভাগ্য বিপর্যয়ে কেবল হিন্দুরা দায়ী ছিল একথা বলা যায় না।

তবে এ কথা সত্য যে, বাংলায় মোগল শাসনের প্রথম ভাগে অর্থাৎ মোগল সুবাদারদের আমলে বাংলার প্রশাসনের উচ্চ পদসমূহে এদেশীয় হিন্দুদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয় নি। কেননা এ সময় সুবার দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ অলংকৃত করেছে মোগল সামরিক অভিজাত সদস্যরা। প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে হিন্দুদের দূরে রাখা এদেশের বৃহৎ হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোগল শাসনের প্রতি কিছুটা নেতিবাচক মনোভাবের জন্ম দেয়। তবে বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা হলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে যেমন স্বাধীন সুলতানগণ, রাষ্ট্রীয় বাস্তবতাকে অস্বীকার না করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা ও সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, মোগল আমলে বাংলার স্বাধীন নবাবগণও একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। বরং বাংলার স্বাধীন নবাবগণ স্বাধীন সুলতানের তুলনায় অধিকহারে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহে এমনকি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের পদেও হিন্দুদের নিয়োগদানে দ্বিধা করেন নি।

নবাবী আমলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদসমূহে হিন্দুদের নিয়োগের অন্যতম একটি কারণ ছিল নবাবদের বংশানুক্রমিকভাবে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া। এ ছাড়া বাংলা স্বাধীন হলে দিল্লীর সাথে বাংলার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে এদেশের অধিবাসীরাই সকল প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। এদেশের হিন্দুরা ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন ও কর্মকুশলতার দ্বারা বাংলার উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নবাবের অধীনে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে থাকে। নবাব আলিবর্দী ও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সময়ে এসে লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদার ছিল হিন্দু। রবার্ট ওরমের তালিকা থেকে দেখা যায়, আলিবর্দীর সময় দীওয়ান, তন-দীওয়ান, সাব-দীওয়ান, বখশি প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলংকৃত করেছে, একমাত্র মুসলমান বখশি হলেন মীর জাফর। আবার উনিশ জন বড় জমিদারের মধ্যে আঠারো

---

[৪৮]সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০), পৃ. ৭৫।

জনই হিন্দু।[৪৯] এ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, প্রশাসনযন্ত্রের প্রায় প্রতিটি বিভাগেই হিন্দুদের প্রাধ্যন্য বেশি ছিল।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসানে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সাময়িকভাবে এদেশীয় হিন্দুদের কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। যদিও সুলতানি আমলের ন্যায় মোগল আমলেও বাংলার জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ছিল হিন্দু। দিল্লী কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার সুবাদারদের অধীনে প্রশাসনিক পদসমূহে বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিন্দুদের নিয়োগ অনেকটাই বাধাগ্রস্থ হয়। এ সময় অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক হিন্দু রাজকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমল আরম্ভ হলে হিন্দুদের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। স্বাধীন সুলতানদের ন্যায় বাংলার নবাবগণও প্রশাসনে জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ করেন এবং এ দেশের স্থানীয় লোকদের বিশেষভাবে হিন্দুদের প্রশাসনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। বাংলার নবাবদের এ উদার নীতি একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতা এনে দেয়, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

---

[৪৯]উদ্ধৃত, *তদেব*, পৃ. ৭৬।

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

সুবা বাংলার কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোর বিন্যাস

মোহাম্মদ নাজিমুল হক*

Abstgract: The Mughal emperor Akbar annexed Bengal with the Mughal empire after defeating Da'ud khan Karrani at the battle of Rajmahal in 1576 A.D. Thenceforth Bengal became a Subah of Mughal imperial rule. The Subadar as a representative of the central authority of Delhi exercised all his power in the interest of the people of Bengal as well as to satisfy the high excellency of Mughal emperors. Regarding the administrative set up in Bengal the Subahdars in return for some prerogative powers tried to follow the central Mughal structure in most of the offices with office bearers designated as Diwan, Bakhshi, Mir-i-Bahar, Sadar, Qazi, Kutual and others. This paper aims at focusing on these aspects of administrative hierarchy with a considerable depth.

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুঘল শাসনামল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল শাসন ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে আকবরের শাসনামল থেকেই চালু হয়। বাবর ও হুমায়ুনের পক্ষে কোনো জনহিতকর ও স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা গড়া সম্ভব হয়নি। সম্রাট আকবর তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বহির্ভারতীয় ও ভারতীয় প্রথার মিশ্রণে মুঘল শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। কোনো অলঙ্কারে মনি বা হীরা বসানোর জন্য যেমন সোনার কাঠামো তৈরি করা হয় তার ওপর মনিটি বসানো হয়। তেমনই ভারতীয় কাঠামো ছিল মুঘল শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। এর উপর আকবর পারসিক–আরবীয় প্রথা আরোপ করেন। বিশেষত ষোল শতকের প্রারম্ভের দিকে ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে আঠার শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এজন্য ভারতে মুঘল শাসন ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ শাসন বলা হয়ে থাকে। সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে জনগণের কল্যাণসাধন, গণঅসন্তোষ প্রতিরোধ ও শাসন কাঠামোকে দূর্নীতিমুক্ত রাখাই ছিল মুঘল শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সম্রাট বা বাদশাহ ছিলেন মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মুঘল সাম্রাজের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার একারপক্ষে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। তাই প্রশাসনিক সুবিধার্থে মুঘল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনের

---

* ড. মোহাম্মদ নাজিমুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশাপাশি প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। সুলতানি যুগের শাসনব্যবস্থা থেকে মুঘল যুগের শাসন ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য নানা দিক থেকে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়েছিল দিল্লির একটি প্রদেশ হিসেবে। সে হিসেবে এ প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও রীতিনীতি দিল্লির সুলতানদের প্রশাসন - ব্যবস্থা ও রীতিনীতি অনুসরণ করেই প্রচলিত হয়েছিল।[১] কিন্তু স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার সুলতানদের জন্য প্রয়োজন ছিল সব শ্রেণির জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ। এজন্য তারা প্রজাসাধারণের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। ব্যাপক উদার নীতির ওপর ভিত্তি করে তাঁদের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।[২] রাজ্যের সর্বোচ্চ পদেও অনেক হিন্দু কর্মচারি নিযুক্ত হতো ।

বাংলার সুলতানরা ছিলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম। তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ, উপাধি গ্রহণ এবং মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে পারতেন।[৩] সুলতান ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস এবং তাঁকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। তিনি দেশের প্রধান প্রশাসক, সর্বশেষ বিচারক, সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তিনি রাজ্যের উচ্চ পদস্থ কর্মচারিদের নিয়োগ দিতেন।[৪] এছাড়া রাজ্যের শান্তি- শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য তিনিই দায়ী থাকতেন। বাংলার সুলতানরা প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। মুসলিম আইনজ্ঞদের মতে, সুলতানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে।[৫] যথাঃ- ১. ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করা ২. প্রজাদের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ নিস্পত্তি করা ৩. রাজ্যরক্ষা করা এবং ভ্রমণকারিদের জন্য রাস্তাঘাট নিরাপদ রাখা ৪. অপরাধ সম্বন্ধনীয় দণ্ডবিধি বলবৎ রাখা ৫. সম্ভাব্য বহিরাক্রমণ থেকে রাজ্যের সীমান্ত শক্তিশালী রাখা ৬. যারা ইসলামের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা ৭ কর আদায় করা ৮. রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পাওনা নিশ্চিত করা ৯. রাষ্ট্রে শাসনকাজ পরিচালনায় তাঁকে বৈধ কাজে সহযোগিতা প্রদানের

---

[১] I.H. Qureshi, *The Administration of the Moghul Empire* (Delhi: Low Price Pub., 1990), pp. 2-3.

[২] আব্দুল করিম, *বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থার ইতিহাস মুসলিম আমল* (১২০৫- ১৭৫৭ খ্রি.) (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৮), পৃ.২৯।

[৩] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ৪র্থ সংস্করণ (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৪০৫- ৪০৭। ১৫৯৪ খ্রি. মুঘল সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যকে বারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রদেশকে সুবা নামে অভিহিত করে। সুবাগুলো হলো এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আহমদাবাদ, বিহার, বাংলা, দিল্লি, কাবূল, লাহোর, মুলতান,ও মালায়া। বেরার, খান্দেশ ও আহমদনগর জয় করার পর সুবার সংখ্যা পনেরোতে নির্দিষ্ট করা হয়। বিস্তারিত এ কে এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, ৪র্থ সং (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৯।

[৪] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ২য় সং (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৬), পৃ. ২৫৪-২৫৫।

[৫] আব্দুল করিম, *তদেব*, পৃ. ৩১।

জন্য সৎ ও যোগ্য কর্মচারি নিয়োগ করা, এবং ১০. জনগণের দৈনন্দিন ব্যাপারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করা।[৬] মোদ্দাকথা, বাংলার সুলতানরা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে তাঁদের সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন।

পক্ষান্তরে, সুবার শাসন ব্যবস্থায় সুবাদার সুবার প্রধান হলেও তিনি সম্রাট কর্তৃক নিয়োগ লাভ করতেন। সুবা প্রশাসনেও কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা, কর্মচারিদের প্রায় অনুরূপ কর্মকর্তা-কর্মচারি ছিলেন, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিভুরূপে কাজ করতেন।[৭] এছাড়া দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ছিল মুঘল শাসন-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রদেশের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের ওপর বাধা সৃষ্টি এবং তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে দ্বৈত শাসনের উদ্ভব হয়।[৮] মুঘলদের সুবা প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় (দিল্লি) প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো।

প্রশাসনিক সুবিধার্থে মুঘল সাম্রাজ্যকে কতকগুলো সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। সুবাগুলোর আয়তন ও সংখ্যা সবসময় এক রকম ছিল না। সম্রাট আকবরের সময় ভারতে ১৫ টি সুবা ছিল।[৯] তন্মধ্যে বাংলা ছিল অন্যতম। সুবাগুলোকে আবার কতকগুলো সরকার বা বিভাগে এবং সরকারগুলোকে মহাল, পরগনা বা জেলায় ভাগ করা হয়। প্রশাসনের ক্ষুদ্রতম একক ছিল মৌজা বা গ্রাম। মুঘল প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের আদলে গড়ে ওঠেছিল।[১০] কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলোর অনুরূপ প্রাদেশিক সরকারের সার্বিক কাজকর্ম কয়েকটি দপ্তরে বিভক্ত ছিল।

সুবা বাংলার প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য

মুঘল শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। প্রাদেশিক প্রশাসনের সমস্ত প্রদেশের বিভিন্ন আয় থেকে মেটানো হতো। প্রাদেশিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মক্তব প্রভৃতি নির্মাণ পরিকল্পনা প্রাদেশিক আয় থেকেই নির্বাহ হতো।[১১] আরব শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়েও এরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু ছিল।

---

[৬] Jadunath Sarkar, *Mughal Administration*, 2nd ed.(Calcutta: M.C. Sarkar & Sons,1952), p.57.

[৭] মোহাম্মদ নূরনবী ও মো. সফিউদ্দিন সর্দার, *ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ৪৫৪।

[৮] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

[৯] এ কে এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, ৪র্থ সং (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৯।

[১০] Sriram Sharma, *Mughals Government and Administration* (Bombay: Hindu Kitabs Ltd., 1951), p.65.

[১১] আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ৬ষ্ঠ মুর্দ্রণ (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ৩৯২।

মুঘল বাংলার প্রশাসনিক মূলনীতি, ধর্মীয় রীতিনীতি, রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, দপ্তর সংগঠন, এমনকি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপাধি পর্যন্ত ছিল সরাসরি বহির্দেশ থেকে আমদানি করা। তবে স্থানীয় প্রয়োজন বিবেচনা করে আমদানি করা শাসনপ্রণালীকে উপযোগী করে তোলার জন্য তাকে সামান্য রূপান্তর করা হয়েছিল।[১২] মুঘল বাংলার শাসনব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈত-শাসন। সুবায় সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের উপর ক্ষমতার সমতা এবং তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীনেই রাখার উদ্দেশ্যে দ্বৈত-শাসনের উদ্ভব হয়।[১৩] প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যবস্থায় সুবাদারের যেমন ফৌজদার হতে নিম্নপদস্থ গ্রাম্য চৌকিদর পর্যন্ত কর্মচারিদের উপর কর্তৃত্ব ছিল, তেমনি সুবার রাজস্ব শাসন ব্যবস্থায় আমলগুজার হতে নিম্নপদস্থ পাটোয়ারি পর্যন্ত কর্মচারিদের উপর দিওয়ানের কর্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল। এ পদ্ধতি প্রকৃতিগত দিক হতে দ্বৈত প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল।ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশের তথাকথিত দ্বৈত শাসনের সাথে এর সাদৃশ্য আছে। দিওয়ান প্রশাসনিক কাঠামোতে সুবার দ্বিতীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হলেও তিনি কোনক্রমেই সুবাদারের নিম্নপদস্থ ছিলেন না, বরং সমান্তরাল ছিলেন।[১৪] এছাড়া শাসন ব্যবস্থায় আমীর ও আমিলের অনুরূপ, সুবাদার ও দিওয়ান এর উপর তীক্ষ্ণ ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিবরণী পাঠাতেন।

সুবা বাংলার শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টনের নীতি ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুবার রাজস্ব, সামরিক প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বিচার বিভাগের উপর সুবাদারের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। এসব বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত নিজ দপ্তরের প্রধানদের উপর অর্থ্যাৎ দিওয়ান, বখশি, সদর ও কাজীর উপর। এসব রাজকর্মকর্তা নিজ দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করতেন, তবে তাঁরা সেসব ক্ষেত্রে সুবাদারের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা লাভ করতেন।[১৫] ক্ষমতা বন্টনের এরূপ নীতি কোনো কোনো সুবাদারের স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ স্বাধীনতার প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত।

সুবা বাংলার পরিসীমা

সুবা বাংলা পূর্ব-পশ্চিমে চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত, দৈর্ঘ্যে ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় পর্বতমালা থেকে হুগলি জেলার মান্দারান পর্যন্ত, প্রস্থে ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এবং উড়িষ্যা যখন সুবা বাংলার সাথে যুক্ত হয় তখন এর দৈর্ঘ্য ৪৩ ক্রোশ ও প্রস্থ

---

[১২] Abul Fazl Allami, *Ain-i-Akbari*, tr.,H.Blochmann, vol., 11, 3rd ed., (Calcutta: Asiatic society, 1977), p. 134.

[১৩] Jadunath Sarkar, *op.,cit.,* p.58.

[১৪]P.Saran, *The Provincial Government of the Mughals* (Alahabad: Kitab publishers, 1941), p.121.

[১৫] S.A.Q. Husani, *Administration under the Mughals* (Dacca: The Paradise Library, 1952), p. 213

২৩ ক্রোশ বৃদ্ধি পায়। সুবা বাংলা পূর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত। এবং পশ্চিমে সুবা বিহার প্রদেশ ।[১৬] কামরূপ ও আসাম সুবা বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। সুবার শাসনকার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে সকল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল, নিম্নে তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কার্যাবলি উপস্থাপন করা হলো।

সুবাদার

মুঘল শাসনামলে যেমন প্রাদেশিক গভর্নরকে সুবাদার বলা হতো, তেমনি বাহমানী রাজ্যেও প্রাদেশিক গভর্নরকে তরফদার বলা হতো। দিল্লির সুলতানি আমলের গোড়ার দিকে প্রাদেশিক গভর্নরকে ওয়ালি এবং লোদী ও সূরী শাসনামলে তিনি হাকিম নামে পরিচিত ছিলেন।[১৭] মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার অধিকর্তাকে সরকারিভাবে সিপাহসালার উপাধিতে অভিহিত করা হয় এবং তিনি সুবাদার হিসেবে পরিচিত হন। সাধারণত সরকার কর্তৃক অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণী, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে সর্বোচ্চ সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হতো।[১৮] কিন্তু কখনো কখনো রাজপরিবারের যুবরাজ ও উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের সুবাদার পদে নিয়োগ করতো।

প্রাদেশিক সুবাদারগণ নিয়োগ লাভের পর পদমর্যাদার চিহ্নতে ভূষিত হন এবং দায়িত্বভার গ্রহণের সময় তাকে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সরকারি আদেশ ও নির্দেশমালা প্রদান করা হতো। এ আদেশনামায় স্পষ্টভাবে সুবাদারের ক্ষমতা উল্লেখ থাকতো; ন্যায়বিচার, নানাবিধ পূর্তকার্যে অংশগ্রহণ, শিক্ষা দীক্ষার প্রসার, সেনাবাহিনী পরিদর্শন, সুবার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে রাজ দরবারকে ওয়াকিফহাল করা ইত্যাদি সুবাদারের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৯] তবে সরকারি নির্দেশনামায় সুবাদারকে হুশিয়ার করা হতো যে, তিনি যেন অবাঞ্ছনীয় সঙ্গ হতে দূরে থাকেন। সুবাদার মিতব্যয়ী না

---

[১৬] এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৫৭৬-১৭৫৭), দ্বিতীয় খণ্ড, অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১।

[১৭]. V.D. Mahajan, *Mughal Rrule in India*, 10th ediion (New Delhi| S. hand, 1972), p.267. সুবা নামের উৎপত্তি হয় সম্রাট আকবরের শাসনামলে। তিনি দশম বার্ষিকী বন্দোবস্তির সময় রাজস্ব বিভাগগুলোকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেন; কতকগুলো সরকার এর সমন্বয়ে গঠিত; মহল একেকটি রাজস্ব বিভাগের প্রাথমিক স্তর। শব্দগত অর্থে সিপাহসালার বলতে সৈন্য বাহিনীর প্রধান বোঝায়। মুঘল বিজয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে সুবা বাংলার গভর্নরদের এ উপাধি যুক্তিযুক্ত ছিল। কারণ সুবা বাংলার উষালগ্ন থেকে প্রায় সব সুবাদারকেই যুদ্ধ কিংবা বিজয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। তখন সুবাদারের দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ অংশই ছিল সামরিক বিভাগ। সুবাহদার আরবি শব্দ। এর অর্থ তত্ত্বাবধায়ক বা দিকনির্দেশক। মুঘল আমলে প্রাদেশিক ভাইসরয়কে সুবাদার বলা হতো।

[১৮]Abul Fazl Allami, *Op.cit.,* p135.

[১৯] P. Saran,. *Op.cit.,* p135.

হন, হীনকর্মে লিপ্ত না থাকেন এবং সুবার সার্বিক শাসন পরিচালনায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। সুবার শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে সুবাদারের সুপারিশক্রমে উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হতো এবং অন্য নিম্নপদগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সুপারিশক্রমে পূরণ করা হত।[২০] সুবাদারের অধীনস্ত মনসবদারদের সম্পর্কেও তার সুপারিশ সম্রাট যথাযথ মর্যাদা দিতেন। সুবাদারকে মান্য করা ও সুবার শাসনকার্য পরিচালনায় তাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য সরকারি নির্দেশমালায় অভিজাত ব্যক্তি ও জায়গীরদারদের প্রতি আদেশ দেয়া হতো।[২১] সুবাদারকেও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হতো যে, সুবার জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বিধান করা অন্যতম কর্তব্য।

সুবাদার বিদ্রোহী জমিদার ও আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতেন। সুবার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির বিবরণী সুবাদারকে প্রতি মাসে দু'বার কেন্দ্রীয় রাজদরবারে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল। জল সেচের মাধ্যমে কৃষি কাজের সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য রায়তদেরকে উৎসাহিত করাও সুবাদারদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খালসা মহলের আয়ের প্রতি সুবাদার অর্থলোলুপ দৃষ্টি দিলে দিওয়ান-ই-খালসা সম্রাটের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন এ মর্মে সুবাদারকে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হতো। শেখ ও কাজীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা এবং ফকির দরবেশকে সাহায্য করা সুবাদারদের কর্তব্য ছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ দুর্বল অসহায় গরীবদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করতে না পারেন সেদিকে সুবাদার কড়া নজর রাখতেন।[২২] সুবার এখতিয়ারাধীন সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট হতে বার্ষিক কর আদায় করে কেন্দ্রীয় রাজদরবারে উক্ত রাজস্ব নিরাপদে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা সুবাদারদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল।

দিওয়ান

সুবাদারের পর প্রাদেশিক দিওয়ান সুবায় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। দিওয়ানের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করতো এবং দিওয়ান কৃতকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি গভর্নরের সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সম-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[২৩] তবে প্রদেশের প্রশাসনিক

---

[২০] S.A.Q. Husani, *Op.cit.*,p. 214.

[২১] Ibn Hasan, *The Central Sructure of the Mughal Empire* (London: Oxford University press, 1954), p.123.

[২২] I. H. Qureshi, *The Central Structure of the Mughal Empire* (London : Oxford university press, 1936), p.63.

[২৩] Abul Fazl Allami, *Ain-i-Akbari, Op.cit.*, p136. দিওয়ান শব্দটি ফার্সী হতে উদ্ভুত। এটি পারসিকদের একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান ছিল। এ বিভাগে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত উমর (রা;) এর সময় আরব শাসন ব্যবস্থায় অবসরবৃত্তির

কাঠামোতে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। এভাবে প্রদেশে দুটি সমান্তরাল ও পারস্পারিক স্বাধীন প্রশাসনিক সংগঠনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।[২৪] প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় সুবাদারের যেমন ফৌজদার হতে শুরু করে নিম্নপদস্থ গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব ছিল, তেমনি প্রদেশের রাজস্ব শাসন ব্যবস্থায় অমাত্যগণ হতে নিম্নপদস্থ পাটোয়ারী পর্যন্ত কর্মচারীদের উপর দিওয়ানের কর্তৃত্ব ছিল। এ পদ্ধতিতে প্রকৃতিগত দিক হতে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ছিল। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশের তথাকথিত দ্বৈত শাসনের সাথে এর সাদৃশ্য আছে। প্রদেশের সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষমতার উপর বাধা সৃষ্টি এবং তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত দ্বৈত শাসন প্রণালীর উদ্ভব ঘটেছিল। সুবাদার ও দিওয়ান ছিল মূলত আরব শাসন ব্যবস্থায় আমীর ও আমিলের অনুরূপ এবং তারা উভয়ে পরস্পরের কার্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। একে অন্যের কাজকর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিবরণী পাঠাতেন।[২৫] কিন্তু কোনো প্রদেশের গভর্নর ও দিওয়ান পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়ে পড়লে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাদের একজনকে কিংবা উভয়কে প্রত্যাহার করা হতো।

কেন্দ্রীয় দিওয়ান যেমন সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন, তেমনি প্রাদেশিক দিওয়ান ছিলেন প্রদেশের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান। বাজেট অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের বার্ষিক আগাম হিসাব প্রস্তুতকল্পে এবং রাজস্ব নির্ধারণ, আরোপ ও আদায় করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় দিওয়ানের অধীনেও অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিল।

প্রাদেশিক দিওয়ান কৃষি কাজের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং যাতে কেউ তার অনুমতিপত্র ব্যতীত কোষাগার হতে কোনো অর্থ গ্রহণ, নিষিদ্ধ শুল্ক বা কর আদায় করতে না পারে প্রভৃতি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আমিলদের হিসাব-নিকাশ তিনি কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন এবং দুর্নীতিপরায়ন আমিলদের পদচ্যুতির জন্য কেন্দ্রে অভিযোগ পেশ করতেন। আমিলদের অবহেলার কারণে যদি কোনো অঞ্চলের রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিতো তাহলে আদায়কৃত বকেয়া দেয় রাজস্বের পাঁচ শতাংশ হিসেবে সহজ কিস্তিতে প্রতিবছর আদায় করার বন্দোবস্ত দিওয়ানকেই করতে হতো। তিনি তাকাভি ঋণ আদায় ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের জন্য বরাদ্দ অর্থেরও খরচের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। প্রদেশের যাবতীয় সরকারি কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণও দিওয়ানের দায়িত্বাধীন ছিল।[২৬] প্রশাসনিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য কাগজপত্র,

---

প্রস্তুতকরণের তালিকা রেজিস্টার) বইকে দিওয়ান বলা হতো। দিল্লির সুলতানি আমলে ওয়াজীরের অধীনে রাজস্ব ও অর্থদপ্তর দিওয়ান নামে অভিহিত ছিল। মুঘল আমলে দিওয়ান শব্দটির ব্যবহার আরও নির্দিষ্ট ছিল এবং দিওয়ান শব্দ দ্বারা অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের প্রধানকে স্পষ্টভাবে বুঝাতো। বিসতারিত আব্দুল করিম, *বাংলার প্রশাসন - ব্যবস্থার ইতিহাস মুসলিম আমল* (১২০৫- ১৭৫৭ খ্রি.) , পৃ. ৮৯।

[২৪] V.D. Mahajan, *Op.cit.*, p. 267.

[২৫] S.A.Q. Husaini, *Op.cit.*, p. 214.

[২৬] Ibn Hasan,. *Op.cit.*, p. 124.

সুবার সদর দপ্তরের কাগজপত্র, সকল সরকারি কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিপত্র, রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী খাদ্য সামগ্রীর মূল্য তালিকা ইত্যাদি দিওয়ানের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকতো।বাজেট অর্থ্যাৎ আয়-ব্যয়ের বার্ষিক আগাম হিসাব প্রস্তুত করার জন্য এবং রাজস্ব নির্ধারণ, আরোপ ও আদায় করার উদ্দেশ্যে সুবা দিওয়ানের অধীনে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।

সুবা দিওয়ানের সচিবালয়ে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়োজিত ছিল-[২৭]

১. পেশকার বা সচিব
২. ব্যক্তিগত সহকারী
৩. একান্ত সহকারী
৪. দারোগা বা সুপারিনটেনডেন্ট
৫. মুশরিফ বা প্রধান সহকারী বা প্রধান হিসাব রক্ষক
৬. তহশিলদার-ই-দপ্তরখানা বা খাজাঞ্চি
৭. হুজুর নবীস বা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পত্র বিনিময়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেরানী
৮. সুবা-নবীস বা গভর্ণরের দপ্তরের সাথে পত্র বিনিময়ের ভারপ্রাপ্ত কেরানী
৯. ওজন ও মাপের হিসাব রাখার কেরানী
১০. সংবাদদাতা
১১. দপ্তর বন্দ
১২. কাছারীর পিয়ন ও প্রহরী।

সুবা দিওয়ানের দপ্তরের গুরুত্বপুর্ণ দুটি শাখা দপ্তর ছিল দিওয়ান-ই-খালসা ও দিওয়ান-ই-তান।[২৮] দিওয়ান-ই-খালসা জায়গীর ভূমি ও বেতন-ভাতা এবং দিওয়ান-ই-তান রাজকীয় সম্পত্তির হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করত।

সদর

সুবাদার ও দিওয়ান ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সদর নিযুক্ত করা হতো। কেন্দ্রের অনুরূপ অফিসারদের মতো সদর স্বীয় দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতেন। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় তিনি ধর্ম বিষয়ক বিভাগের প্রধান ছিলেন। সুবা শাসনব্যবস্থায় সদর ধর্ম বিষয়ক বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি সুবার ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের তদারকি এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি প্রদেশের বিচার ব্যবস্থাও পরিচালনা করতেন। তবে মুঘল শাসনামলে প্রায়শই সদর ও কাজীর বিভাগ দুটি সংযুক্ত ছিল।[২৯] তারা উভয়ে ধর্মীয় দান খয়রাত এবং শিক্ষা ব্যবস্থারও তদারক করতেন।

---

[২৭] এ কে এম আবদুল আলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫।

[২৮] আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, প. ৮৫।

[২৯] *তদেব*।

কাজী

প্রদেশের বিচার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন কাজী। তিনি কাজী-উল-কুজ্জাত কর্তৃক নিয়োজিত হতেন এবং তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে কাজ করতেন। সুবা কাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত আদালতকে সুবা আদালত বলা হত। বিচার কাজে মীর-আদল কাজীকে সাহায্য করতেন। সুবা কাজী অধীনস্ত কাজীদের নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। প্রদেশের বিচার ব্যবস্থা ছাড়াও প্রয়োজনে তিনি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি, ধর্মীয় বিষয়াবলি প্রভৃতি তত্ত্বাবধান এবং এতদসংক্রান্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করতেন। এছাড়া তিনি সুবার এতিম ও দরিদ্র লোকদের অভিভাবক হিসেবেও কাজ করতেন। প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে বেশ কিছু সংখ্যক আদালত ছিল। যেমন-প্রাথমিক ও আপীল বিভাগ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত যা আধুনিক মহকুমা হাকিম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও মুনসেফের আদালতের অনুরূপ।[৩০] আরব শাসনব্যবস্থায়ও কাজী উপরোক্ত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন।

বখশী

প্রদেশের সামরিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন বখশী। কেন্দ্রীয় বখশীর পরামর্শে সম্রাট সুবা বখশী নিয়োগ দিতেন। তিনি কেন্দ্রীয় বখশীর তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন।[৩১] বখশীর বহুবিধ দায়িত্বের মধ্যে নতুন সৈন্য সংগ্রহ ও নিয়োগ, সৈন্যবাহিনীকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় রাখা, সৈন্য সমাবেশ ও সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মনসবদার ও সৈন্যদের বেতনের দাবিপত্র মঞ্জুর, সৈন্যবাহিনীর অশ্ব ও অন্যান্য যন্ত্র পরিদর্শন, অশ্ব চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি কার্যকর করা, বিদ্রোহ দমন কাজে অথবা শত্রুও বিরুদ্ধে সুবাদারের অভিযানে সৈন্য সমাবেশ এবং যুদ্ধকালীন সময়ে সম্রাটকে সৈন্য সরবরাহ করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল।[৩২] কেন্দ্রীয় মীর বখশীর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সুবা বখশী সুবায় পালন করতেন। কখনো কখনো স্বেচ্ছাচারী সুবাদারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সুবা দিওয়ানকে বখশী পদেরও দায়িত্ব দেওয়া হত।[৩৩] উল্লেখ্য, সম্রাট জাহাঙ্গীর সুবাদার কাসিম খান চিশতীর স্বেচ্ছাচারিতা দমনের জন্য দিওয়ান মুখলিস খানকে বাংলার বখশী পদেরও দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

পোদ্দার

---

[৩০] Abul Fazl Allami,*Op.cit.*, p. 43. মুঘল আদালত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত ছিল, ১) সম্রাটের নেতৃত্বে সর্বোচ্চ আদালত, ২) কাজী-উল-কুজ্জাতের নেতৃত্বে আদালত, ৩) সুবা কাজীর নেতৃত্বে সুবা আদালত, ৪) সরকার কাজীর নেতৃত্বে সরকার আদালত এবং ৫) নাইব-ই-কাজীর নেতৃত্বে পরগনা আদালত। আব্দুল করিম, *বাংলার প্রশাসন - ব্যবস্থার ইতিহাস মুসলিম আমল* (১২০৫-১৭৫৭ খ্রি.), পৃ. ৮৯।

[৩১] Jadunath Sarkar, *Op.cit.*, p. 233.

[৩২] Sriram Sharma, *Op.cit.*, p.67.

[৩৩] Abul Fazl, *Ain–i-Akbari*, *Op.cit.*, p.65.

প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে পোদ্দার নামে একজন অফিসার নিযুক্ত ছিল। পোদ্দারের নানাবিধ কার্যের মধ্যে প্রধানতম কাজ ছিল কৃষকদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় এবং তা রাজকোষে জমা দেয়া। এছাড়াও তিনি রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ করতেন।[৩৪] কিন্তু তিনি দিওয়ানের অনুমোদন ছাড়া টাকা খরচ করতে পারতেন না।

কোতোয়াল

সুবার পুলিশ বাহিনীর প্রধান ছিলেন কোতোয়াল। কোট ও পাল হিন্দি শব্দদ্বয় হতে কতোয়াল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হলো দুর্গরক্ষক। তিনি বিভিন্ন শহরে ফাঁড়ি বসাতেন। অশ্বরোহী ও পদাতিক বাহিনী তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত থাকতো। ভারতের প্রাচীন আমলের স্থানিক এবং পশ্চিম এশিয়ার খিলাফতের প্রাথমিক যুগের মুহতাসিবের সম্মিলিত কর্তব্যাদি মুঘল আমলের কতোয়ালরা পালন করতেন।[৩৫] মুঘল আমলে শহর নগর ও শহরতলীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল কতোয়ালদের। শহরে নিয়মিত পাহারার বন্দোবস্ত, হাট–বাজার নিয়ন্ত্রণ,উত্তরাধিকারবিহীন বিষয় সম্পত্তির তদারক ও নিষ্পত্তিকরণ, অপরাধ, মদ-সুরা পান ও বিক্রয় বন্ধ করা, চোর-দস্যু ও অপরাধীকে গ্রেফতার করা, কাজীর অধীনস্তরূপে কাজীর হুকুম পালন, শহরবাসী নিরাপদ বসবাস, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি, সামাজিক অপব্যবহার ও কুপ্রথা নিরোধকরণ ইত্যাদি কতোয়ালদের প্রধান কর্তব্যাদির অন্যতম ছিল।[৩৬] তিনি শহরের প্রত্যেক অঞ্চলের জনসংখ্যার তালিকা প্রণয়ন, নতুন আগমনকারী ও বহিরাগমনকারীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেওয়া, দৈনন্দিন ঘটনাবলির প্রতি লক্ষ রাখা এবং সরাইখানার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। বেকার লোকদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করাও তাঁর কর্তব্য ছিল। তাঁকে শিশু হত্যা ও জোরপূর্বক সতীদাহ প্রথা রদ করা এবং পতিতালয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হতো।[৩৭]

ওয়াকিয়ানবিস

মুঘল যুগের প্রাদেশিক শাসন কাঠামোতে ওয়াকিয়ানবিস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। ওয়াকিয়ানবিস ছিলেন প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে সংবাদ আদান–প্রদান এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা। মূলত প্রদেশের ঘটনাবলির বিবরণী পেশ করার জন্য ওয়াকিয়ানবিসদিগকে নিযুক্ত করা হতো; কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে তাদের দ্বারা ঘটনা চেপে রাখার সম্ভাবনা থাকার দরুন গোপনে সংবাদ সংগ্রহকল্পে সুবার বিভিন্ন

---

[৩৪] P.Saran, *Op.cit.*, pp. 44-45.

[৩৫] Abul Fazl, *Ain–i-Akbari*, *Op.cit.*, pp. 44-45.

[৩৬] S. M. Edwardes and H. L. O. Garrett, *Mughal Rule in India* (Delhi: S. Chand & Sons,1956), pp. 164–65.

[৩৭] Abul Fazl, *Ain–i-Akbari*, *Op.cit.*, pp. 48-49.

অঞ্চলে গোয়েন্দারূপে নিয়োগ করা হতো।[৩৮] বস্তুতপক্ষে তারা ছিল অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদ দাতাদের শ্রেণীভুক্ত।

ওয়াকিয়ানবিস তাঁর লিখিত বিবরণী 'দারোগা-ই- ডাক' অর্থাৎ ডাক বিভাগের প্রধানের মাধ্যমে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করতেন। সুবার প্রশাসনিক জটিলতার সময় কখনো কখনো একই ব্যক্তিকে দিওয়ান, বখশি ও ওয়াকিয়ানবিস পদে নিয়োগ করা হতো।[৩৯] সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার স্বেচ্ছাচারী দিওয়ান মুখলিস খানকে বখশি ও ওয়াকিয়ানবিস পদেরও দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুঘল আমলে গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ সংস্থাও ছিল। এ সংস্থার কর্মকর্তাকে বলা হতো 'কুফিয়াহনবিস'।[৪০] দারোগা-ই-ডাক বিভাগের অধীনে সাওয়াহনিহ্ বা কুফিয়াহনবিস ছিল গুপ্তচর বেশে সংবাদদাতা। মুঘলদের এই গোপন সংবাদ প্রেরণ পদ্ধতিকে 'আখবারনবিস'ও বলা হতো।[৪১] উপরোক্ত দু'প্রকার সংবাদ সংস্থা ব্যতীত স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণের জন্য 'হরকরাহ্'[৪২] পদ্ধতিও চালু ছিল।

উপসংহার

সুবা বাংলার শাসন ব্যবস্থার কৃতিত্ব, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়যে, ইহা ছিল জনকল্যাণময় ও জনহিতৈষী শাসন - ব্যবস্থা। সরকারের প্রকৃতির দিক হতে শাসন প্রণালীতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রাধান্য লাভ করায় সুবাদারগণ বিভেদনীতির আশ্রয় না নিয়ে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কার্যে সচেষ্ট ছিলেন। নীতির দিক হতে মুঘল শাসনাধীনে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আইনের চোখে সমান ছিল। তাঁদের অবিরত সর্তকতা, সদজাগ্রত তৎপরতা ও কঠোর পরিশ্রমের দরুন জনসাধারণ নিরাপত্তা অনুভব করত।

সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার উদারনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্ম সহিষ্ণুতা অতীব প্রশংসনীয়। হিন্দু-মুসলিম সকলেরই ধর্মের স্বাধীনতা ছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নিজ নিজ

---

[৩৮] এ কে এম আবদুল আলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।

[৩৯] S. M. Edwardes and H. L. O. Garrett, *Op.cit.*, p.109. মুঘল শাসনব্যকস্থায় সরকারি চিঠিপত্র বিবিধ শ্রেণিতে ভাগ করা চলে, ক) ফরমান-সরাসরি সম্রাট কর্তৃক লিখিত চিঠি, খ) নিশান-সম্রাট ব্যতীত রাজবংশের যুবরাজ কর্তৃক লিখিত চিঠি, গ) হাসব-উল-হুকুম-সম্রাটের নির্দেশ উজির কর্তৃক লিখিত চিঠি, ঘ) সনদ-নিয়োগপত্র (নিম্ন-পদস্থ কর্মচারিদের প্রতি উর্ধতন কর্মকর্তার প্রশাসনিক আদেশ), ঙ) দসতক- সংক্ষিপ্ত সরকারি পাস বা অনুমতি পত্র।

[৪০] *Ibid.*

[৪১] I.H. Qureshi, *Op.cit.*, p. 232.

[৪২] P.Saran, *Op.cit.*, pp. 47-48. হরকরাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সংবাদবহণকারি। কিন্তু মুঘল শাসনব্যবস্থায় তিনি ছিলেন একজন গুপ্তচর। তিনি গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং কেন্দ্রে সংবাদ পাঠাতেন। (বিস্তারিত এ কে এম আব্দুল আলীম, *ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস*, পৃ.১৯৮।)

ধর্ম পালনে কেহই রাষ্ট্রের তরফ হতে কোনো বাধা-বিঘ্ন বা হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হত না। মুঘল প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের অবিকল ক্ষুদ্র চিত্র ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলোর অনুরূপ সুবার কাজকর্মও কয়েকটি দপ্তরের মাধমে পরিচালিত হতো। পরিশেষে বলা যায় মুঘল রাষ্ট্র একটি সামরিক রাষ্ট্র ছিল না, কিংবা সার্বিকভাবে একটি পলিশি রাষ্ট্রও ছিল না। উক্ত স্তর দু'টি অতিক্রম করে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে সুবা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

নয়াবাদ মসজিদে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণির মোটিফ

নূরুল আমীন•

Abstract : Terra-cotta containing human, animal and vegetal mities plaque is one of the major ancient symbolic representations of human civilization. This ancient arbitrary sign is also noticeable in the subcontinent. Earthen pottery along with terra-cotta plaque was found in different archaeological places of Harappa and Mahenjadaro. Terra-cotta plaque is also found in several historical places of Bangladesh. In order to enhance the beauty and artistic value, terra-cotta plaque is widely used in the temples, mosques, offices and even in houses. But, animal motifs in terra-cotta plaque in the Nayabad Mosque is simply a rare incident. Keeping in mind the size of the doors of the mosque, its plaques are kept smaller in size and are decorated with flowers, leaves and animal motifs. This essay explains the animal motifs used in the Nayabad mosque.

ভূমিকা

প্রত্যেক জাতির উপাসনা করার জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা উপাসনালয়। তাই মুসলিম জাতির জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে মসজিদ। মসজিদ হলো মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। "মসজিদ শব্দটি 'সাজাদা' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'সাজাদা' অর্থ সিজদার স্থান। অর্থাৎ যেখানে সিজদা করা হয় সে জায়গাকেই মসজিদ বলা হয়। সাজাদা শব্দটি আরবি বা ফারসি নয়, সম্ভবত আরামায়িক ভাষা থেকে এসেছে। মসজিদকে রসুল করীম (সাঃ) সিজদা প্রদানের স্থান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অধ্যাপক সৈয়দ মাহমুদুল হাসান মসজিদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলেছেন, অন্যান্য যে সমস্ত সংজ্ঞা ও শব্দাবলি এসে পড়ে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মুসাল্লা'। 'সালাত' শব্দ থেকে মুসাল্লা কথাটির উৎপত্তি হয়েছে সিজদার মতো 'সালাত' শব্দটিও; সম্ভবত আরামায়িক মতান্তরে সিরিয়েক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যে স্থানে সালাত অর্থাৎ নামাজ পড়া হয় তাকেই মুসাল্লা বলা হয়। ইসলামের আদি যুগে মসদিজ ও মুসাল্লা শব্দ দুটির

• ড. নূরুল আমীন, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচলন দেখা যায়।"[১] হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণকে নিয়ে মদিনায় হিযরত করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আর এটিই হলো ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক মসজিদ। যার পরিমাপ ছিলো ১০০ বর্গ হাত এবং উচ্চতা ৭ হাত । প্রাচীরগুলো ছিলো রোদে শুকানো ইটের।[২] মুসলমানেরা যখন এই উপমহাদেশে আসেন তখন থেকেই তাঁরা উন্নতমানের স্থাপত্যরীতির সাথে পরিচিত হন। মুসলিম স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য হলো খিলান, গম্বুজ, মিনার, মিহরাব ইত্যাদি যা আগে থেকেই পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়ায় পরিচিত ছিলো।

বাংলাদেশে মসজিদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দের অব্যবহিত পর প্রায় ৭০০ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ের রাজা-বাদশা, সুলতান, নৃপতি ও ধর্মীয় ব্যক্তিগণ মসজিদ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৩] "কিন্তু স্থাপত্যে নমুনা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন স্থানীয় উপাদান। স্থাপত্য নির্মাণে দেশীয় উপাদান ব্যবহৃত হতো। এ সম্পর্কে মোবাশ্বের আলীর মতামত প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মাটির গুণেই এখানে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির চিত্রফলকের শিল্প গড়ে উঠে।"[৪]

পোড়ামাটির ফলকচিত্র (টেরাকোটা)

'টেরা' 'কোটা' শব্দ দুটি ল্যাটিন শব্দ 'টেরা' এবং 'কোটা' থেকে গৃহীত। ল্যাটিন ভাষায় 'Terra' শব্দের অর্থ 'Earth' বা মাটি। রোমান মিথে Terra হচ্ছে পৃথিবীর দেবী। গ্রিকরা একে সম্বোধন করতেন বলে তাদের 'Gaea' বলে। অপর দিকে 'cotta' হচ্ছে 'Cuocera'-এর স্ত্রীবাচক যার অর্থ রান্না করা বা হিট দেওয়া। অর্থাৎ 'cotta' হচ্ছে 'baked' বা পোড়ানো। আক্ষরিক অর্থে 'টেরাকোটা' শব্দটি পোড়ামাটিকে বুঝায়।[৫] ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, "বাংলা শিল্প সাহিত্যে বর্তমানে সুপ্রচলিত লাতিন ভাষাশ্রয়ী

---

[১] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বিশ্বের সেরা মুসলিম স্থাপত্যকীর্তি* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০৬), পৃ ৩০।

[২] মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধানে* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০৬), পৃ ৭৩।

[৩] মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ও মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ঐতিহ্য* (ঢাকা : বই পড়া, ২০০৪), পৃ ৪১

[৪] মোবাশ্বের আলী, *বাংলাদেশের সন্ধানে* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ ১৯৮৬), পৃ ১৭৮

[৫] Firoz Mahmud, *Prospects of Material Folk Culture Studies and Folk Life Mmuseums in Bangladesh* (Dhaka : Bangla Academy, 1993), p. 97.

একটি ইতালীয় যুগ্ম শব্দ। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'টেরা'=মৃত্তিকা, 'কোটা' = দগ্ধ, অর্থাৎ 'দগ্ধ মৃত্তিকা'। চারুকলায় শব্দটি পোড়ামাটির শিল্পকর্মকে বুঝায়।"[৬]

পোড়ামাটির ফলকচিত্র এবং সকল মৃৎসামগ্রী আর্দেনওয়ারের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও শিল্প সমালোচকদের মতে টেরাকোটা হলো গ্লেজবিহীন মৃৎসামগ্রী। যেমন, হাঁড়ি, পাতিল, সরা, মটকা, সানকি, কলকে, হাতি, ঘোড়া, পুতুল, খেলনা, ফুলদানি, ফলকচিত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ কাদামাটি দিয়ে তৈরি করে শুকিয়ে পোড়ানোর পর যে রূপ ধারণ করে তাকেই টেরাকোটা বলে। আভিধানিক অর্থে টেরাকোটার বাংলা রূপান্তর হচ্ছে পোড়ামাটি এবং এই শব্দটিই যুক্তিযুক্ত।

পক্ষান্তরে, কাদামাটি দিয়ে স্ল্যাব তৈরি করার পর 'লেদার হার্ড' হলে খোদাই কিংবা মাটি পেস্টিং করে কোনো দৃশ্য বা নক্শা করার পর তা ছায়ার মধ্যে শুকিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পোড়ানোর পর তাকে পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা বলা হয়। মাটি বা বডির উপর নির্ভর করে টেরাকোটার তাপমাত্রা ৭৫০° সে থেকে ১০০০° সে. পর্যন্ত হতে পারে।

কলাবিদগণের মতে টেরাকোটা দুই প্রকার, কালধর্মী (Age-bound) অপরটি কালহীন (Ageless)। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে লোকায়ত পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে। কালানুযায়ী লোকায়ত ফলকগুলো তিনটি ভাগে বিভক্ত।

১। আদি পর্ব
২। মধ্য পর্ব
৩। অন্তপর্ব বা সমকালীন।

বাংলার পোড়ামাটি-মন্দির, মসজিদ ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পরীতিকে ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন নিম্নোক্ত ভাবে দেখিয়েছেন।[৭]

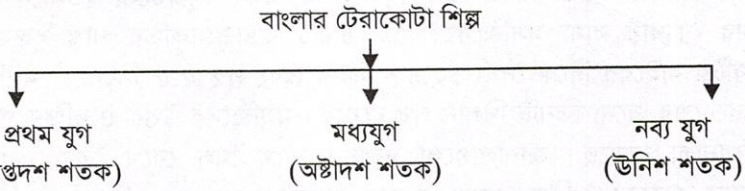

মধ্যযুগে পোড়ামাটির শিল্পে মুসলমানদের অবদান : বাংলায় মুসলমানদের আগমণ ঘটে মূলত ত্রয়োদশ শতকে। উপরর্যুক্ত মুসলমানরা অধিকাংশই ছিলেন তুর্ক-আফগান বংশধর। এই বিজয়ী মুসলমানরা এ দেশে এসে শাসক হিসেবে এ অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে, ফলে ভিন্ন একটি সংস্কৃতি বাংলায় বিদ্যমান সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রন ঘটে। এর ফলে এ অঞ্চলে

---

[৬] বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* (কলকাতা : অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৪), পৃ. ২০৬।

[৭] প্রদ্যোত ঘোষ, *বাংলার লোক শিল্প* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০০), পৃ. ৫৫।

পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পবোধ, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। সেই সাথে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ করে মসজিদগুলোতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই সময়ের মসজিদগুলোর দেয়ালে পোড়ামাটির নক্শাকৃত ফলক দ্বারা অলংকরণ করার রীতি লক্ষ্য করা যায়। ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন বলেছেন: "মুসলমানেরাই পোড়ামাটি অলংকরণের রীতি এবং নক্শা (বা স্থাপত্য কৌশল) সম্পর্কে পরিচয় ঘটায় এবং পরে তা মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।"[৮]

অলংকরণের ক্ষেত্রে বাংলা অঞ্চলে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার ছিলো সনাতন রীতির। মুসলমানদের আগমনের পর, এই রীতির সাথে তারা পরিচিত হয়ে ওঠে এবং তারা এই রীতিকে পরিবর্তন করে তাদের মতো করে অলংকরণ করে। মুসলমানদের তৈরি স্থাপত্যগুলো খুব কমই টিকে আছে। যেগুলো টিকে আছে তার মধ্যে টাঙ্গাইলের আতিয়া জামে মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা শাহী মসজিদ, চিকা মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি টেরাকোটা অলংকৃত মসজিদ ও দিনাজপুরের নয়াবাদ মসজিদ ইত্যাদি।

নয়াবাদ মসজিদের ফলকচিত্র

দিনাজপুর জেলাস্থ কাহারোল উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের নয়াবাদ গ্রামে খোলামেলা জায়গায় খুব মনোরম পরিবেশে নয়াবাদ মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের মাঝখানের খিলান পথের উপরে ফার্সি ভাষায় রচিত লিপি থেকে জানা যায় সম্রাট শাহ আলমের আমলে ২-২-১২০০ বঙ্গাব্দে (১৭৯৩ খ্রিঃ) মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদটি নির্মাণের মূল কারণ হলো কান্তনগর মন্দির তৈরির সময় পশ্চিমা দেশ থেকে আগত স্থাপত্য নির্মাণ কর্মীরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম নয়াবাদে বাসস্থান তৈরি করে এবং সেখানে তারা মসজিদটি নির্মাণ করে। মসজিদটি আয়তকার ও তিন গম্বুজবিশিষ্ট, তবে গম্বুজগুলো বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর চার কোণায় বাঘা মসজিদের মতো চারটি অষ্টাভূজাকৃতির পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে। মসজিদটির বাইরের দিকে দৈর্ঘ্য ১২.৪৫ মিটার এবং প্রস্থ ৫.৫ মিটার।[৯] মসজিদের পূর্ব দিকে প্রবেশের জন্যে তিনটি খিলান পথ রয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে একটি করে জানালা রয়েছে। জানালাগুলো দরজার সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের ভেতরে পশ্চিম পাশে রয়েছে তিনটি মিহরাব। দু'পাশের দুটি মিহরাব; মাঝখানের মিহরাবের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট। মসজিদে অর্ধগোলাকৃতির তিনটি গম্বুজ রয়েছে তবে মাঝখানের চেয়ে পাশের দুটি গম্বুজ ছোট। মসজিদের সামনের পুরো দেয়ালে খোপ খোপ করে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা আবৃত। মসজিদের তিনটি দরজায় বহুখাঁজযুক্ত (multi-cusped) খিলান রয়েছে। মসজিদের চারকোণে অষ্টাভূজ আকৃতির কর্ণার

---

[৮] ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন, পোড়ামাটি -মন্দির, স্বপনবসু (সম্পা), *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির - টেরাকোটা* (কলকাতা : বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষৎ, ২০০৮), পৃ. ৬।

[৯] সানিয়া সিতারা, 'নয়াবাদ মসজিদ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা পিডিয়া* ১ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৯।

টাওয়ারের উপর চারটি ছত্রী, যার উপর চারটি ছোট গম্বুজ রয়েছে। কর্ণার টাওয়ারের প্রতিটির মধ্যে চারটি ব্যান্ড রয়েছে। টাওয়ারের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমের প্রাচীর সাদামাটা ইট ও পলেস্তরা দিয়ে তৈরি। মসজিদের মাঝখানের দরজার তিন পাশে ৩৩টি, অপর দুইপাশের দরজা দুটিতে ৩৮টি করে সর্বমোট ফলকের সংখ্যা ১০৯টি। তবে ফলকগুলো অনেক জায়গায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিছু কিছু খুলেও গিয়েছে। ফলকগুলোর বিষয়বস্তু হলো, ফুল, লতা-পাতা, জোড়া পাখি, ময়ূর, কাঠবিড়ালী, খরগোশ ইত্যাদি (চিত্র ১)।

এরকম প্রাণির মোটিফ হাতি, ঘোড়া, গরু, সিংহ এবং টিয়া, ময়না ইত্যাদি পাখির চিত্রফলক দিনাজপুরের দায়রা মসজিদেও দেখতে পাওয়া যায়।[১০] নয়াবাদ মসজিদে স্থাপিত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকচিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো:

কাঠবিড়ালীসহ পেয়ারা গাছ

এই ফলকচিত্রটিতে দেখানো হয়েছে একটি পেয়ারা গাছ; কিন্তু গাছটি স্বাভাবিক গাছের মতো নয়। গাছটি একটি গোলাকার পিলারের মতো হলেও নিচে ডিজাইন করা। অনেকটা পুরাতন জমিদার বাড়ির পিলারের মতো। গাছের কাণ্ডটির কিছু উপরে গোলাকার ব্যাণ্ড দিয়ে তার উপর থেকে দুই পাশে দুটি করে ডাল বের করা হয়েছে। দুটি ডালেই দুটি করে পেয়ারা ঝুলছে। মনে হয় যেন পেয়ারার ভারে গাছের ডাল বাঁকা হয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। দুটি ডালের মাঝখানে একটি ফুলদানির মতো দেখা যাচ্ছে। ফুলদানির মুখে আবার গোল ক্যাক্টাসের মতো একটি ফুল ফুটে আছে। নিচে দুটি কাঠবিড়ালীকে লম্ফমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। দুটি কাঠবিড়ালীই সামনের পা গাছের মধ্যে ভর করে উঠার চেষ্টা করছে। দেখে মনে হবে যেন গাছে উঠে পেয়ারা খাবে। ফলকটি অনেক জায়গায় ক্ষয়প্রাপ্ত, মনে হবে উইপোকা খেয়ে গর্ত করেছে। অবয়ব দেখলে উঁই পোকার কাঠ কাটার মতো মনে হবে। উল্লেখ্য এ ফলকটির নিচে ও দুই পাশে সোজা হলেও উপরের অংশ আর্চের মতো করে তৈরি করা হয়েছে। ফলকটির মডেলিং ভালো হয়েছে, এটি চারকোণা স্ল্যাব তৈরি করে তার মধ্যে খোদাই করে মডেলিং করা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে সাদা সাদা চুনের মতো। এতে সহজেই বোঝা যাচ্ছে এটি চুন সুরকির মর্টার দিয়ে ফলকটি দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু ফলকটি ২০০ বছর আগে তৈরি করা হয়েছে তাই ক্ষয় হওয়াটাই স্বাভাবিক, তাই ফলকের রং দেখে পোড়ানোর তাপমাত্রা অনুমান করা যাচ্ছে না (চিত্র ২)।

ময়ূরসহ ফুল গাছ

এই ফলকচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে ময়ূর এবং তার পিঠের উপর একটি গাছ। ফলকটির নিচে একটি গোলাকার বেইজ; তার একটু উপরে দড়ির মতো প্যাঁচানো ডিজাইন আবার তার

---

[১০] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৮৪), পৃ ১৩৬

উপর একটু বড় গোলাকার বেইজ। গোলাকার বেইজের মধ্যে ময়ূরটি বসে আছে এবং ময়ুরের পিঠের উপর থেকে উক্ত গাছের উপরের অংশ দেখা যাচ্ছে। গাছের ডগায় রয়েছে একটি ফুটন্ত ফুল। গাছের দুই পাশ থেকে দড়ির মতো প্যাঁচানো দুটি ডালে ফুল ফুটেছে। বেইজের পাশ থেকেও ছোট দুটি লতার মতো উঠে গেছে, যার শীর্ষে আরও পাতা দেখা যাচ্ছে। ময়ূরটির মুখ উপরের দিকে উঠানো এবং ঠোঁট ফুলের সাথে লেগে আছে ; তাতে মনে হচ্ছে ময়ূর ফুলের মধু খাচ্ছে। মসজিদে প্রাণির ছবি যেমন বিরল ঘটনা তেমনিভাবে ময়ূর ফুলের মধু খাবে এটিও একটি বিরল ঘটনা। তবে চারকোণা আকৃতির ফলকচিত্রটির মডেলিং খুব সুন্দর এবং বিষয়ভিত্তিক। ময়ূর, গাছ, ফুল, ডালপালা সব মিলে একটি সুন্দর কম্পোজিশন। এই ফলকটিও ক্ষয়প্রাপ্ত, তবে ময়ুরের পেটের অংশ একটু বেশি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। এই ফলকটির চারপাশে ছোট ছোট চুনের দানা দেখা যাচ্ছে, এতে আরো বেশি প্রমাণ করা যায় যে চুন সুরকি দিয়ে ফলকটি আটকানো হয়েছিল। ফলকের অবয়বের রং দেখে তাপমাত্রা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না (চিত্র নং ৩)।

ফুলগাছে জোড়া পাখি

এই ফলক চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে দুটি পাখি ফুল গাছে বসে আছে। গাছটির শুরুতেই একটি অর্ধবৃত্তাকার ফুল। তার দু'পাশে দুটি নক্শা আকারে পাতা নির্মাণ করা হয়েছে যা অনেকটা আমাদের ঐতিহ্যবাহী পাখন পিঠার নক্শা র মতো। ফুল থেকে একটি গাছ এবং গাছের শীর্ষ স্থানে একটি ফুল যার অবয়ব অনেকটা গোলাপ ফুলের মতো। গাছের দুপাশে দুটি পাতা দেখে মনে হয় ফনা তোলা সাপের মতো। এই পাতার উপর দুটি পাখি বসে আছে। ডান পাশের পাখির ঠোঁট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দুটি পাখিরই একটি পা পাতার উপর এবং অন্য একটি পা ফুলের উপর দিয়ে যেন একটি অন্যটিকে আঘাত করছে বা আকড়ে ধরছে। মুখ দুটি একটির সাথে অন্যটি লাগানো অনেকটা ঝগড়ার দৃশ্যের মতো ফুটে উঠেছে। যদি প্রণয় হতো তাহলে পা দিয়ে আকড়ে ধরার কথা নয়। উল্লেখ্য যে এই ফলকচিত্রটির মডেলিং কম্পোজিশন একটু ব্যতিক্রম। পাতা এবং ফুল গাছ একই সমান। ফলকটি একটি স্ল্যাবের উপর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। সবশেষে লাইন দিয়ে পাতা-ফুল-পাখির কাজটি খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিচের দিকে কোণাকৃতি হলেও উপরের দিকে পাখির মাথার উপর আর্চের মতো নক্শা আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলকটি বর্তমানে ক্ষয়প্রাপ্ত, এর অনেক জায়গায় ছোট ছোট গর্ত এবং সাদা রঙের ফাঙ্গাস ধরেছে। এই ফলকটির রং দেখে মনে হচ্ছে ৮০০° সে. তাপমাত্রায় উপরে পোড়ানো (চিত্র ৪)।

জোড়া পাখিসহ ফুলগাছ

এ ফলক চিত্রটিতে দুটি পাখি ও একটি ফুলগাছ দেখা যাচ্ছে। ফলকচিত্রটি বেশির ভাগই ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভেঙ্গে গেছে, তবুও দুটি পাখি খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে

ময়ূর। পেখম তুলে বসে আছে। আমাদের লোকসংস্কৃতি ঘুড়ি ও পাখার মধ্যে এ ধরনের পাখির ছবি দেখা যায়। প্রাচীন এই ময়ূরের ড্রইংটি পরবর্তীতে লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদানে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই ফলকের ময়ূরগুলোর নিচের অংশ ও বাম পাশের মাথার অংশ ভেঙ্গে গেলেও বুঝতে অসুবিধে হয়না। ময়ূরের উপরে ফুলগাছের কিছু অংশ রয়েছে যার দুই পাশে দুটি ফুটন্ত ফুল এবং তার উপরে ফুলের কলি। এটিও একটি স্ল্যাব তৈরি করে টুলস্ দিয়ে খোদাই করে মডেলিং করা হয়েছে। মডেলিং করার পর লাইন টেনে ময়ূর এবং ফুলগাছের অবয়ব আরো সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলকের নিচের অংশ কোণাকৃতি হলেও উপরে আর্চের মতো করে তৈরি করা। ফলকটির রং দেখে মনে হয় ৮৫০° সে. তাপমাত্রার উপরে পোড়ানো হয়েছে (চিত্র ৫)।

ফুলগাছে জোড়া পাখি

এই ফলকচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে একটি গাছে ৫টি ফুল এবং দুটি পাখি চিত্রিত হয়েছে। পাখি দুটির মধ্যে প্রণয় ভাব লক্ষ্যনীয়। গাছটি তিন স্তরে খাঁজকাটা বেইজের মধ্যে থাকলে উপরের খাঁজটি দড়ির মতো নক্শা করা। বেইজ থেকে চারটি ডাল বের হয়েছে এবং প্রতিটি ডালেই একটি করে ফুটন্ত ফুল ফুটে নিচের দিকে ঝুলে আছে। ফুলের ভারে গাছের ডাল নুয়ে পড়েছে। গাছটি রিপিটিশন স্টাইলে তৈরি করা হয়েছে। মাঝখানের ডালে ফুটন্ত ফুলে দুটি পাখি বসে আছে। দেখে মনে হয় ঠোঁটের সাথে ঠোঁট মিশিয়ে তারা আনন্দ করছে এবং ঠোঁটের এক্সপ্রেশন দেখে মনে হয় তারা ভালোবাসায় মগ্ন। এই ফলকটিও ক্ষয়প্রাপ্ত এবং অনেক জায়গায় ফাঙ্গাস পড়েছে এবং অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছে। বিশেষ করে পাখি দুটির দেহের অংশ ভেঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে। তবে তা ভেঙ্গে গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয়না। ফলকটির মডেলিং খুব ভালো হয়েছে। ফলকটিতে টুলস্ দিয়ে চেপে ও লাইন টেনে দেয়াতে ফুল ও পাতার অংশ আরো বাস্তবধর্মী করা হয়েছে। এ ফলকটির নিচে কোণাকৃতি হলেও উপরের অংশ আর্চের মতো। তবে উপরের অংশটুকু ভেঙ্গে গিয়েছে। ফলকটির কালার উজ্জ্বল লালচে রঙের। দেখে মনে হয় এটিও ৮৫০° সে. তাপমাত্রার উপরে পোড়ানো (চিত্র ৬)।

খরগোশসহ ডালিমগাছ

এই ফলকচিত্রটিতে একটি গাছ এবং গাছের দুপাশে দুটি খরগোশ। গাছটি অনেকটা নক্শা আঁকারে। ফলকটির বেশির ভাগ অংশই কারুকাজ দিয়ে ভরাট। গাছটি দেখে মনে হয় ডালিম গাছ। গাছের দুপাশে দুটি করে এবং উপরে একটি ডালিম। ডালিমের ভারে গাছের ডাল বাঁকা হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে। খরগোশ দুটি লম্ফমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, সামনের দুটি পা গাছের মধ্যে ভর করে এবং মুখ গাছের সাথে লেগে আছে। মনে হচ্ছে যেন গাছের ছাল খাচ্ছে। অনেক জায়গায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে কিছু কিছু অংশ ভেঙ্গেও গিয়েছে। এটিও স্ল্যাবের উপর টুলস্ দিয়ে খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলকের

মডেলিং রিয়েলেস্টিক এবং খুব নিখুঁতভাবে করা হয়েছে। ফলকের রং দেখে মনে হয় এটিও ৮৫০° সে. তাপমাত্রার উপরে পোড়ানো (চিত্র ৭)।

ফুলগাছে জোড়া পাখি

এ ফলকচিত্রটির মধ্যে একটি ফুলগাছ এবং দুটি পাখি আছে। একটি টবের মতো বেইজের উপর থেকে একটি ফুলগাছ এবং দুপাশে দুটি ফুটন্ত ফুল দুটি পাতা আছে। গাছের শীর্ষস্থানের ফুলে দুটি পাখি বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে পাখি দুটি বিশ্রাম নিচ্ছে বা রাত যাপন করছে। রাতের বেলায় পাখি তার পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে যেভাবে ঘুমায় বা বিশ্রাম নেয় এই ফলকচিত্রে তা দেখানো হয়েছে। পাখি দুটির মুখ দুদিকে ফিরানো থাকলেও এক্সপ্রেশনে বা অভিব্যক্তিতে বিশ্রাম কিংবা ঘুমানোর মতো দেখা যায়। ফুল দুটি দেখতে বাস্তবে কসমস ফুলের মতো। ফলকটির মডেলিং দেখে মনে হবে রিয়েলিস্টিক বা বাস্তবধর্মী। এই ফলকটিতেও ফাঙ্গাস ধরেছে এবং তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ফলকটির নিচের অংশ কোণাকৃতি এবং উপরের অংশ আর্চের মতো। ফলকের রং দেখে মনে হয় ৮৫০° সে. তাপমাত্রার উপরে পোড়ানো (চিত্র ৮)। উল্লেখ্য মসজিদের প্রতি খোপের মধ্যে একটি করে ফলক এবং প্রতিটি ফলকের অংশ মসজিদের দরজার উপরের অংশের মতো আর্চ আকৃতির ঢেউয়ের মতো করে ডিজাইন করে তৈরি করা হয়েছে।

ফুলগাছ

এই ফলকচিত্রটি অর্ধবৃত্তাকার ফুলের উপর থেকে শুরু হয়েছে। ফুলটির মাঝখানে একটি গাছ তার দুপাশে দুটি কলি ও কতগুলো পাতা রয়েছে। গাছের মাঝখানে একটি ফুল, তার পাশ দিয়ে দুটি ডাল এবং ডালের ফুল নিচ দিকে ঝুলে আছে। গাছের শেষ প্রান্তে একটি ফুল ও দুপাশে কলি। উল্লেখ্য যে, এই ফলকটির নিচের দুই কোণা থেকেও এক চতুর্থাংশ ফুল দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। ফলে নিচের অংশ সম্পূর্ণটাই প্রায় ভরাট। উপরের অংশেও ফাকা অংশ কম। কম্পোজিশন ও মডেলিং খুব সুন্দর হয়েছে। এটিও স্ল্যাবের উপর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। তবে এতে লাইনের ব্যবহার কম। এই ফলকটির উপরে আর্চের মতো দেখানো হয়েছে। এই ফলকটিরও কালার দেখে মনে হয় ৮৫০° সে. তাপমাত্রার উপরে পোড়ানো (চিত্র ৯)।

নক্‌শাযুক্ত ফুল

এই ফলকটি একটু ব্যতিক্রম। নিচ থেকে উঠলেও গাছের গোড়া বা ডালের উর্ধ্বমুখী অবয়ব দেখা যায় না। গাছের মাঝে একটি বেণ্ড-তার দুই পাশ থেকে ডালপালা নিচে ও উপরের দিকে গিয়েছে। এটি অনেকটা ফুলের তোড়ার মতো দেখা যায়। এ রকম নক্‌শা

দারুশিল্পে বেশি দেখা যায়। তবে এটির মডেলিং খুব নিখুঁত। এটিও স্ল্যাবের উপর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। মডেলিং করার পর টুলস্ দিয়ে লাইন টেনে লতা-পাতা ও ফুলের অবয়ব খুব সুন্দর ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে এ ফলকটি দেখলে মনে হয় ২০০ বছর আগের নয় যেন এটি সমকালীন সময়ের ফলকচিত্র। ফলকটির রং দেখে মনে হয় ৯০০° সে. তাপমাত্রার কাছাকাছি পোড়ানো (চিত্র ১০)।

ডালিম গাছ

এই ফলকটিতে দেখা যাচ্ছে ডালিম গাছ। অর্ধবৃত্তাকার ফুলের মতো ডিজাইন। তার মধ্যে লতা আকৃতির ডাল-পালা ও ডালিম ফল। ডালিমগুলো নিচের দিকে ঝুলে আছে এবং ডাল বাঁকা হয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে। উল্লেখ্য দুই পাশের দুটি ডালিম একই রকম যেন মাটিতে লেগে যাবে। এই ফলকটিও খুব ভরাট করে রিপিটিশন ডিজাইন করে তৈরি করেছে। ফলকটির অনেক জায়গায় ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও এখনো এর সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি। এটির মডেলিংও ভালো হয়েছে। কালার দেখে মনে হয় ৯০০° সে. তাপমাত্রার কাছাকাছি পোড়ানো।

এই ফলকটি রিপিটিশন হলেও এর ডিজাইনের বৈশিষ্ট একটু ভিন্ন। কারণ গাছের গোঁড়ায় পাতা তার উপর বেণ্ড। বেণ্ড থেকে দুটি পাতা নিচে এবং দুটি পাতা ভাঁজ হয়ে গাছের মধ্যে লেগে আছে। গাছের দুইপাশ থেকে দুটি ডাল বের হয়ে উপরের দিকে দুটি পাতা দেখানো হয়েছে। গাছের শেষ প্রান্তে একটি ফুল ফুটে আছে কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় খুব ভালোভাবে বুঝা যাচ্ছে না। তবে ফলকটি দেখে মনে হবে নক্শাধর্মী, যা রিপিটিশন করে তৈরি করা হয়েছে। এই ফলকটি ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও ডিজাইন খুব সহজেই বুঝা যায়। ফলকচিত্রটির মডেলিং খুব ভালো এবং নিচের দিকে কোণাকৃতি হলেও উপরের দিকে আর্চের মতো। কালার দেখে মনে হয় এটি ৮৫০° সে. তাপমাত্রায় পোড়ানো (চিত্র ১১)।

উপসংহার

নয়াবাদ মসজিদের ফলকচিত্রে প্রাণির ছবির ব্যবহার একটি বিরল ঘটনা। এ বিরল ঘটনার কারণ মসজিদের ঈমাম এবং স্থানীয় মুরুব্বী লোকজন বলতে পারেনি। অনেকের ধারণা কান্তনগরের কান্তজী মন্দির নির্মাণের সময় যেহেতু এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে হয়তোবা তখন মিস্ত্রিরা মন্দিরের ফলকের মতো প্রাণির মোটিফ এই মসজিদের গাত্রে লাগিয়েছে। তবে সঠিক তথ্য কেউ দিতে পারেননি। আর এসব ফলকচিত্রের আকৃতিগুলো মসজিদের দরজার ডিজাইনের সাথে মিল রেখে ছোট ছোট করে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ফলকচিত্রই নিচে কোণাযুক্ত এবং উপরে মসজিদের দরজার বহুখাঁজযুক্ত খিলানের মতো।

এসব ফলকচিত্রগুলো বেশিরভাগই লোনা ধরে ও ভেঙ্গে গিয়েছে। ফলকগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হলো ফলকচিত্রের মাটিতে ক্ষারীয় উপাদানের আধিক্য। দুইশত বছর পূর্বের মৃৎশিল্পীদের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞান ছিলো না। যদি

মাটির সাথে ৮% বেরিয়াম অক্সাইড ব্যবহার করা হতো তা হলে পোড়ানোর পর এই সব ক্ষয় আরো কম হতো। বর্তমানে এই পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে সংরক্ষণ করা হলে পরবর্তী প্রজন্ম এই বিরল ফলকচিত্রগুলো দেখতে পাবে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকরা যেমন উপকৃত হবে তেমনিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক সমৃদ্ধ হবে।

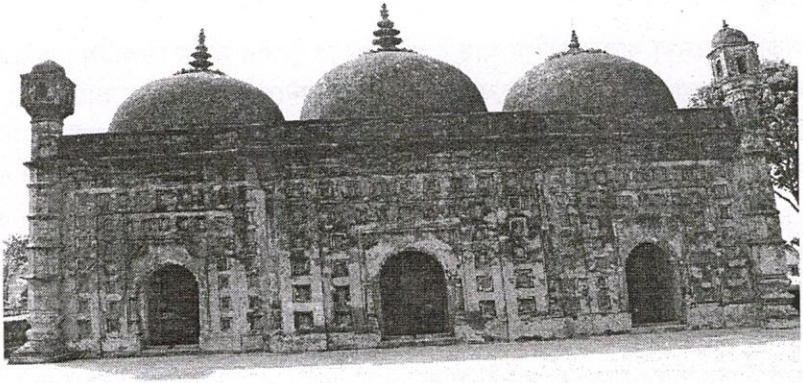

চিত্র ১: নয়াবাদ মসজিদ

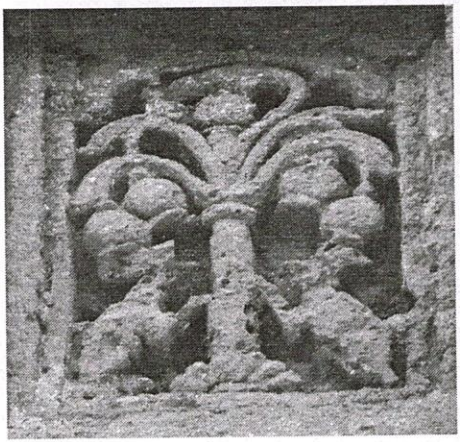

চিত্র ২ : কাঠবিড়ালীসহ পেয়ারা গাছ

চিত্র ৩ : ময়ূরসহ ফুলগাছ

চিত্র ৪ : ফুলগাছে জোড়া পাখি

চিত্র ৫ : জোড়া পাখিসহ ফুলগাছ

চিত্র ৬ : ফুলগাছে জোড়া পাখি

চিত্র ৭ : খরগোসসহ ডালিমগাছ

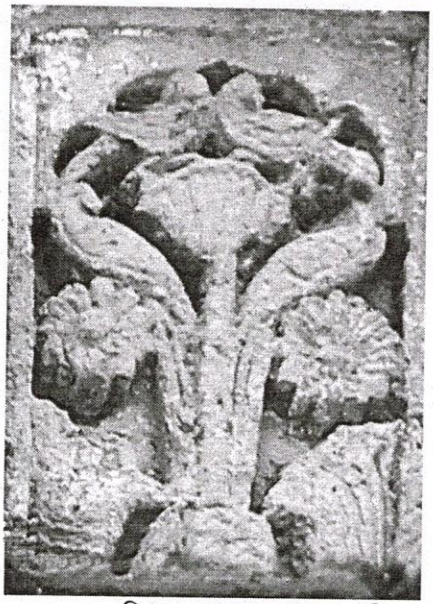

চিত্র ৮ : ফুলগাছে জোড়া পাখি

চিত্র ৯ : ফুলগাছ

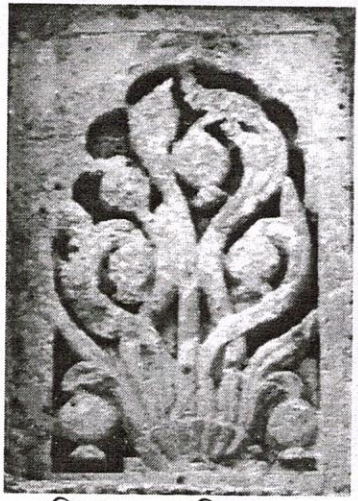

চিত্র ১০: ডালিমগাছ

চিত্র ১১ : নক্‌শাযুক্ত ফুল

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল উদ্ভবের প্রেক্ষাপট (১৯৬০-১৯৭২) : একটি পর্যালোচনা

মোহাঃ রোকনুজ্জামান*

Abstract: The 'Jatiyo Samajtantrik Dal' (National Socialist Party; called JSD) is one of the political parties of Bangladesh. This paper discusses the history of the formation and growth of JSD. A group of radical student leaders, who believed in revolutionary ideas, organized student movement in the 1960s against the autocratic military ruler of the then Pakistan, General Ayub Khan. These student leaders believed in Marxist ideals; they also believed in the concept of sovereign and independent East Pakistan. Hiding their motive they worked in the student organization of Awami League, the party that led the liberation movement of Bangladesh and they also participated in the liberation war of Bangladesh in 1971.In the independent Bangladesh these radical students created a separate student organization as a result of their conflict with the student wing of the ruling party. Then they formed a separate political party with the goal to establish socialism in Bangladesh. Against this backdrop, on 31 October 1972 the Jatiyo Samajtantrik Dal emerged in Bangladesh. The present article deals with the background of the emergence and growth of JSD as a political party.

ভূমিকা

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার করে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠিত হলেও এ দলের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল ষাটের দশকে। ১৯৫০ এর দশকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তা একদিকে বাংলা ভাষাকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করে অপরদিকে তা অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় প্রথম পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ষাটের দশকের শুরুতে পাকিস্তান সরকারের শিক্ষানীতি ও জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে পাকিস্তান বিরোধী বৃহত্তর

* ড. মোহাঃ রোকনুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ভোলা সরকারি কলেজ , ভোলা।

আন্দোলন গড়ে তুলেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা । এ আন্দোলনসমূহ সম্পূর্ণ সফল না হলেও তা ক্রমেই সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলেছিল। পাকিস্তান বিরোধী অপর আর একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে যা অবশেষে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয় ও তার পরিণতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ঘটায়। ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে গুরূত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও তার নেতারা। এ নেতারাই পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেছিলেন। এ সকল নেতার রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরোধিতার মাধ্যমে। সামরিক শাসনের বিরোধিতার পাশাপাশি তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে মার্কসবাদের আদর্শের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক এক বাংলাদেশ হিসেবে। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৫৮ সালে সংবিধান বাতিল করে সেনাপ্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। এভাবে চার বছর দেশ পরিচালনার পর ১৯৬২ সালের ১ মার্চে নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন।[১] তাতে জনসাধারণের কোন ইচ্ছার কোন প্রতিফলন ঘটে নি। ফলে মানুষের মধ্যে আইয়ুব শাসন বিরোধী চাপা ক্ষোভ জন্ম নিতে শুরু করে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো গোপনে সংগঠিত হতে থাকে।

১৯৬১ সালের শেষে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়। আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিব ও তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে মণি সিংহ ও খোকা রায় এসব গোপন বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এতে পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন, পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক ইউনিট প্রথা বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষকদের খাজনা হ্রাস, স্বাধীন বৈদেশিক নীতির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়।[২]

এ সময় রাজনীতিবিদদের নির্যাতন করে রাজনৈতিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার নীতি গ্রহণ করে আইয়ুব সরকার। এরই অংশহিসেবে বিদেশী অর্থানুকূল্যে দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় ১৯৬২ সালের ২৯ জানুয়ারি। এই গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, প্রকাশ্যে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এই

---

[১] এফ জামান, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি* (ঢাকা : বই বিতান, ১৯৮৫), পৃ. ২৩৩।

[২] পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (১৯৬৮) গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির *রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ ৫১-৫২।

আন্দোলনের প্রথমেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমেদ, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), কফিল উদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদ ও কোরবান আলী প্রমুখ নেতা গ্রেফতার হন। ফলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে আসে ছাত্রদের হাতে। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এ ক্ষেত্রে গুরূত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে।

সমাজতান্ত্রিক নিউক্লিয়াস ও ভবিষ্যৎ জাসদ নেতাদের কার্যক্রম

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পরবর্তীতে জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খান। হিটলারের 'মেইন ক্যাম্প'-এর অনুরাগী পাঠক সিরাজুল আলম খান কঠোর জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের মধ্যে সংস্কারমুখী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটান। তিনি ছাত্রলীগের শীর্ষপদসমূহে তারই মতো জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসীদের সমাবেশ ঘটাতে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি ছাড়াও কাজী আরেফ আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক ও নূর আলম জিকু প্রমুখ নেতাদের সমন্বয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে এক জাতীয়তাবাদী নিউক্লিয়াস গড়ে তোলেন। যারা বাম ধারার অনুসারী ও দ্রুত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ে তোলার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করতো সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতা আসবে না।[৩]

পরবর্তীকালে জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কাজী আরেফের মতে, 'আমরা আরো কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিই যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি প্রগতিশীল সংগঠনে রূপান্তর করবো।[৪] প্রাথমিক অবস্থায় তিন সদস্য নিউক্লিয়াসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই তিন সদস্য হলেন, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ।[৫] পরে অন্যেরা এই বিপ্লবী নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হন।[৬] প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরূদ্ধে এবং বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের লক্ষ্যে ছাত্রলীগের মধ্যে কাজ করে যায়।[৭] বামধারার এই সংগঠনটির সাথে মার্কসবাদী দল বা কোন সংগঠনের আদর্শিক বিরোধ না থাকলেও এ নিউক্লিয়াসের সদস্যরা ছিল কঠোরভাবে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তারা 'শ্রেণী সংগ্রাম' এর নামে পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে

---

[৩] মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ* (ঢাকা : মীরা প্রকাশন, ১৯৯০), পৃ. ২৯।

[৪] কাজী আরেফ আহমেদ, "ইতিহাসের নির্মোহ গতিধারা", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২৮ মার্চ ১৯৯৫।

[৫] সিরাজুল আলম খান ছিলেন ১৯৬২-৬৩ সালের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি সংগঠনের মধ্যে তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে অধিক পরিচিত। আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন ১৯৬২-৬৩ সালের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক। কাজী আরেফ আহমেদ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

[৬] কাজী আরেফ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫।

[৭] *পূর্বোক্ত*।

বিদ্যমান বৈষম্য বা ভিন্ন জাতীয় অধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে সম্মত ছিলেন না।[৮] তারা পাকিস্তানি শোষণ প্রক্রিয়াকে জাতিগত নিপীড়ন হিসেবে দেখার পক্ষপাতী ছিল।[৯] দুই পাকিস্তানের দীর্ঘস্থায়ী ও সমন্বিত আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে এই নেতারা অবাস্তব ও উদ্ভট বলে মনে করতেন। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে তারা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে একীভূত করে দেখেন। সমাজতন্ত্রের পূর্বে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিষয়টি তাদের কাছে মূখ্য হয়ে উঠে। তারা এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব একমাত্র পন্থা বলে মনে করেন।[১০] এই গ্রুপ নিজেদের 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে অভিহিত করতো।[১১] ১৯৬৪ সালে তারা *স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ* নামে সাইক্লোস্টাইল করা একটি গোপন পত্রিকা বের করে। পর পর তিনটি সংখ্যা বের করার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। এর পর বিপ্লবী পরিষদ কোন পত্রিকা প্রকাশ না হলেও এ সংগঠন কর্মী সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।[১২]

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াসের মূল থিসিস ছিল, ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে বাঙালি জাতির সামনে জাতিগত প্রশ্নই বড়। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ ক্ষেত্র বিবেচনা করে, মাওসেতুং এর দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী এ মুহূর্তে বাঙালি জাতির প্রধান দ্বন্দ্ব পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক গোষ্ঠীর সাথে। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ বর্তমানে জাতিগত নিপীড়নে রূপ নিয়েছে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাঙালি জাতির স্বাধীনতা তথা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।[১৩]

সচেতনভাবে নিউক্লিয়াস গঠন করলেও এ সংগঠনের নেতারা ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করতো যেহেতু বঙ্গবন্ধু ও তার দল স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত তাই তারা আওয়ামী লীগের সাথে থাকা উচিত বলে মনে করতো। তবে তারা একই সাথে বিশ্বাস করতো যে, আওয়ামী লীগ বিপ্লবী দল নয়, তাদের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো বিপ্লবী কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন এক পর্যায়ে এ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাদের স্বাধীন অবস্থান ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে।[১৪] এ বিষয়ে সিরাজুল ইসলাম খানের বক্তব্য ছিল, আমরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম যে, এমন এক সময় আসবে যখন

---

[৮] লরেন্স লিফশুলৎস (মুনীর হোসেন অনূদিত), *অসমাপ্ত বিপ্লব, তাহেরের শেষ কথা* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান), ১৯৮৮, পৃ. ৪১।

[৯] এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, "১৯৬২ সালের সমাজতান্ত্রিক নিউক্লিয়াস: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা", *কলা অনুষদ সাময়িকী*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, জুন, ১৯৯৯।

[১০] লরেন্স লিফশুলৎস, *পূর্বোক্ত।*

[১১] আলতাফ পারভেজ, *অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ কর্ণেল তাহের ও জাসদ* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৫), পৃ. ২৬।

[১২] মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত।*

[১৩] লরেন্স লিফশুলৎস, *পূর্বোক্ত।*

[১৪] ঐ, পৃ. ৮৭।

হয়তো শেখ মুজিবকে পরিত্যাগ করে তাদের একটি নতুন রাজনৈতিক ধারা রচনা করতে হবে।[১৫]

তারা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে গুরূত্বপূর্ণ মনে করে তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার চেষ্টা করতো। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জেল থেকে বেরিয়ে এলে এ নিউক্লিয়াসের সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হয়।[১৬] এ সময় থেকে নিউক্লিয়াস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ তারা ১৯৪৮ সালে ভারত বিভক্তির পর কমিউনিস্ট পার্টি ভারত, পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে যে ভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সে জাতীয় কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হোক তা চায় নাই।[১৭] পরে এ নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত হন ছাত্রলীগের শেখ মণি, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ নেতারা। তবে এ সকল নেতারা নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কারণ নিউক্লিয়াস নেতৃবৃন্দ তাদের আস্থায় আনতে পারেননি।

ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে চলছিল রাজনৈতিক আদর্শগত শূন্যতা। *স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ* বা নিউক্লিয়াস গঠনের পর থেকে ছাত্রলীগের মধ্য থেকে কর্মী সংগ্রহ, প্রচার ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়। ছাত্রলীগ, শ্রমিকলীগ ও আওয়ামী লীগ থেকে নির্ভীক, সৎ ও নিষ্কলুষ চরিত্রবান কর্মীদের বিপ্লবী পরিষদের সদস্য করা হয়।[১৮] এই 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' এর কেন্দ্রীয় সেলের তিন সদস্য নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। সিরাজুল আলম খান শ্রমিক ফ্রন্ট, কাজী আরেফ ছাত্রফ্রন্ট এবং আব্দুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সাথে যোগাযোগ।[১৯] তারা সবসময় সচেষ্ট ছিলেন দলের ভিতর পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে সুস্পষ্টভাবে জনমত তৈরি করা। দলের ভিতরে তাদের পরিচয় ছিল আওয়ামী লীগের সবচেয়ে সাচ্চা ও লড়াকু তরুণ হিসেবে।[২০]

এভাবে ছাত্রলীগের মধ্যে একদল উদীয়মান তরুণ নেতা নিজেদের মধ্যকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে কাজ করে। ১৯৬২ সালে প্রথমে সোহরাওয়ার্দীর মুক্তিকে কেন্দ্র করে যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির পর তা আইয়ুব খান প্রবর্তিত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন এবং

---

[১৫] মওদুদ আহমদ (জগলুল আহমদ, অনূদিত), *শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল* (ঢাকা : ইউ পি এল, ১৯৮৭), পৃ. ৩০৫।

[১৬] এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪।

[১৭] মোহাঃ রোকনুজ্জামান, *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি* (ঢাকা মীরা প্রকাশন, বইমেলা-২০০৫) পৃ. ২৬।

[১৮] কাজী আরেফ আহমেদ, *পূর্বোক্ত* ।

[১৯] *ঐ*।

[২০] লরেন্স লিফশুলৎস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩।

আরও পরে তা আরও বিস্তৃত হয় আইয়ুব খান প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে যখন আইয়ুব খানের সামরিক নির্যাতনে নিষ্পেষিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বড় কোন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন সেখানে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যাকে ইস্যু করে পূর্ব বাংলায় এভাবে একের পর এক আন্দোলন গড়ে দেশে আন্দোলনের পরিবেশ বজায় রাখে। আইয়ুব শাসনের ব্যর্থতার দিক জনসাধারণের নিকট উন্মোচন করে। যদিও ছাত্রদের এ সকল আন্দোলন সফল হয় নাই কিন্তু দেশে এক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ফলে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগের পক্ষে সহজ হয়েছিল ৬-দফা ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার।[২১]

৬-দফা আন্দোলন ও জাসদ নেতৃবৃন্দ

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্নটি শুধু মাত্র *স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের* মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সমগ্র সংগঠনের নেতা- কর্মীদের মধ্যেই এর অপরিহার্যতা অনুভূত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলন বর্জন করে ঢাকা বিমান বন্দরে 'বাঙালির মুক্তির সনদ' নামে অভিহিত করে ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

প্রকৃতপক্ষে ৬-দফা কর্মসূচির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৬-দফা কর্মসূচি শোষিত ও নির্যাতিত বাঙালির নিকট 'ম্যাগনাকার্টা' রূপে অভিনন্দিত হয়েছিল। তৎকালীন জনপ্রিয় ও শক্তিশালী গণসংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা মাওলানা ভাসানী ৬ দফার বিকল্প ১১-দফায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করা শুরু করেন। যদিও পরে তা জনপ্রিয়তা পায় নি। তবে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছাত্ররা ছাত্রলীগের মধ্যেও অবস্থান করে কাজ করত। তারা ১১-দফার চাইতে ৬-দফাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।[২২] যদিও ছাত্রলীগের এই সমাজতন্ত্রীরা পরে গঠন করেছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ। কিন্তু ষাটের দশকের মধ্যভাগে তারা আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকেই কাজ করা অধিকতর সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করলে ছাত্রলীগের বিপ্লবী নিউক্লিয়াস সেল তাদের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেন। তারা ৬-দফাকে এক দফায় পরিণত করার তৎপরতায় নেমে পড়ে। ১৯৬৬ সাল থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ৬-দফাভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলন দ্রুত জনসমর্থন পেতে থাকে। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগ ৬-দফার একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত হয়। বাংলার অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনগুলি ক্রমেই ৬-দফার গুরুত্ব

---

[২১] মোহাঃ রোকনুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।

[২২] মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড* (ঢাকা : ওয়ার্সী প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ৮৩।

উপলব্ধি করে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেও তাদের দৃষ্টিতে এতে অপূর্ণতা রয়ে গেছে বলে তারা তা সমর্থন করতে পারছিল না। কারণ তাদের মনের কথাটি ছিল না। আবার সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য অর্জন ও দেশের জন্য প্রয়োজন ছিল সার্বজনীন ঐক্য। এই অবস্থায় ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ১৯৬৭-তে এর সূত্রপাত ঘটান ছাত্র নেতৃবৃন্দ। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, ১৯৬৮-১৯৬৯ এর গণআন্দোলন পর্যন্ত তাদের কর্মতৎপরতার মধ্যে তেমন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের এক বড় অংশ স্বাধীন বিপ্লবী নিউক্লিয়াসের দ্বারা প্রভাবিত হয় ও তাদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে।[২৩]

১৯৬৮ সালের শেষে ক্রমেই পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে বাংলাদেশের থাকার অসারতা সম্পর্কে একাধিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সচেতন হয়ে উঠে। ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় মাওলানা ভাসানী 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার' কথা বলেন। ১৯৬৮ সালের ১ ডিসেম্বরে স্বাধীনতার আহ্বান সম্মলিত সিরাজ শিকদারের শ্রমিক সংগঠন, পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস প্রকাশ করে।[২৪] বাইরের এই প্রভাব পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ভেতর স্বাধীনতার পক্ষে দ্রুত মেরুকরণ ঘটাতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা ছাত্রলীগের সভায় যোগদান করে বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে শ্লোগান তোলেন। এভাবে ষাটের দশকের শেষে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ধারণা একটি গণদাবিতে রূপান্তর হয়, যা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে শক্তিশালী করে তোলে। বামপন্থী ছাত্র নেতৃবৃন্দ ৬-দফাকে সীমাবদ্ধ কর্মসূচি বলে মনে করতো। তাদের মতে, ৬-দফায় সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোন কথা নেই। এতে আন্তর্জাতিক বিষয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচি ও শিক্ষা বিষয়ক দাবিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সবশেষে ১৯৬৯ সালে অনেক আলোচনার পর ছাত্রনেতৃবৃন্দ ৬-দফার সাথে একে ঠিক রেখে এর সাথে আরও পাঁচটি দাবি যোগ করে মোট ১১-দফা প্রণয়ন করেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঐতিহাসিক ১১ দফা রচনা সম্পন্ন হয়। মোট ৪টি ছাত্র সংগঠন এবং ডাকসুর নেতাদের নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রচিত হয়। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলন ডেকে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের অবহিত করা হয়।[২৫]

১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থান ও বিপ্লবী নিউক্লিয়াসের কর্মতৎপরতা

সিরাজুল আলম খানদের ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে প্রগতিশীল কর্মতৎপরতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে এক অগ্রসর অবস্থানের দিকে নিয়ে যায়, যা

---

[২৩] মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২।

[২৪] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র,পটভূমি, দ্বিতীয় খণ্ড*, ১৯৫৮-১৯৭১ (ঢাকা : তথ্য-মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।), পৃ, ১৭৩।

[২৫] মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ২০২।

ছাত্রলীগের অতীত সংবিধানের রাজনীতির ঐতিহ্যের সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি ছিল অনিবার্য। আওয়ামী লীগ মূলত একটি মধ্যপন্থী দল, পথপরিক্রমায় বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেও গণভিত্তি অর্জন করে। আইয়ুব খানের চীনপন্থী নীতির কারণে দেশের বাম দলগুলো যখন তাকে সমর্থন করেছিলো তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীর লয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীনে চলে আসে। আওয়ামী লীগের কর্মসূচিগুলিতে শোষণহীন সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত থাকায় বহু র‍্যাডিক্যাল তরুণ এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্টে যোগ দেয়। এভাবে ক্রমশ ছাত্রলীগে সংস্কারপন্থী চিন্তার প্রাধান্য বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর থেকে ১৯৭১ সালের মার্চে পুনরায় গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত উল্লেখিত যুব সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগে এত প্রবল ছিল যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতকে প্রাধান্য দিতে হতো।[২৬]

নিউক্লিয়াস বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের নীতিতেও বিশ্বাসী ছিল। তারই অংশ হিসেবে 'জয় বাংলা বাহিনী' গঠিত হয়।[২৭] বিপ্লবী পরিষদ ও তার নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক মেধা ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে দ্রুত এ গ্রুপ শক্তিশালী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে নিজেদের অবস্থান সংহত করে নিতে সক্ষম হয় এবং অভাবনীয় দ্রুততার সাথে নিজস্ব সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটায়। নিউক্লিয়াস সেলের সদস্যরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দলে দলে গ্রামে গিয়ে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল। জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ শহুরে তরুণরা গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে, অন্যদিকে অশিক্ষিত-দরিদ্র-দুর্বল বাঙালি এ শহুরে তরুণদের যুবকদের কাছে থেকে জানতে পারে শ্রেণী সংগ্রাম ও রাজনীতির কথা।[২৮]

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বিভিন্ন পার্টি দলিল ও ব্যক্তিগত কথোপকথনের মাধ্যমে সিরাজুল আলম খান ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অনেক সদস্য দাবি করে থাকেন যে, মার্কসীয় মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য থেকেই তারা আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে কাজ করতেন। এরা মনে করতেন, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক এবং তা একই সময়ে অর্জন করা সম্ভব। অনেকটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই এরা সমাজতন্ত্র কায়েমের স্বপ্ন দেখতেন। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজনৈতিক কার্যকলাপ ও হত্যাকান্ড শুরূ হয়। আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে স্বৈরশাসক আইয়ুব

---

[২৬] মওদুদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত।*

[২৭] মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

[২৮] আলতাফ পারভেজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬-২৭।

খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে বিদায় নেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভের পরই সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং সংবিধান বাতিল করেন। তিনি সেই সাথে গুরূত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন তা হল, (১) পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে পূর্বতন চারটি প্রদেশের পুনরুজ্জীবন এবং (২) জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহকে প্রতিনিধিত্ব প্রদান। সে অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ তিনি এক আইনগত কাঠামো আদেশ (Legal Framework Order) জারি করেন। এতে পাকিস্তানের জন্য একটি ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিষদের ৩০০ জন সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং বাকি ১৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, যাঁরা ৩০০ জন সদস্যের দ্বারা মনোনীত হতেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় পরিষদ গঠন করা। জাতীয় পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করবে এবং সংবিধান প্রণয়নের পর জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা রূপে কাজ করবে। সুতরাং সাংবিধানিক প্রশ্নটিই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।

আওয়ামী লীগ ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে তার নির্বাচনী ইশ্‌তেহার প্রণয়ন করে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে 'গণভোট' বলে ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের জনগণকে শোষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ ও তাদের বাঙালি দোসরদের তীব্র সমালোচনা করেন। মস্কোপন্থী ন্যাপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে এবং ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দান করেন। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের চার মাস আগেই সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন এ অংশ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে তখন এ অংশের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। ১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট বলাকা ভবনের তৃতীয় তলায় অনুষ্ঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভার শেষ দিনে সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ ও স্বপন চৌধুরী স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রচুর বাকবিতন্ডার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি ৫৫-৭ ভোটে গৃহীত হয়।[২৯] স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাব গ্রহণ করায় নিউক্লিয়াস বহির্ভুত আওয়ামী-ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের একাংশ অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু এতে বিপুল জঙ্গী কর্মী বাহিনীর সমর্থন থাকায় এক্ষেত্রে তারা নিরূপায় ছিলেন।

---

[২৯] ঐ।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু নভেম্বর মাসের প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী তফসিল নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন ভোট বর্জন করেন।[৩০] কিন্তু আওয়ামী লীগ ডিসেম্বরের নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে থাকে। তাছাড়া স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবার জন্য গ্রামে গ্রামে এরা নিজস্ব কর্মী ও সমর্থকদের পাঠিয়ে দেয়। এ সময় আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেবার জন্য হাজার হাজার শিক্ষিত শহুরে যুবকদের গ্রামে পাঠানো হয়।

১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে তালিকাভূক্ত ভোটার সংখ্যা ছিল ৩, ১২, ১১, ২২০ এবং প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৫.০৯%।[৩১] পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচির পক্ষে নিরঙ্কুশ রায় প্রদান করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় নির্বাচন এবং এই নির্বাচন ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে পাকিস্তানের অসারতা প্রমাণ কর। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬০টি লাভ করে আওয়ামী লীগ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন মাত্র আটজন। তারা সবাই পরাজিত হন। অপরদিকে ভুট্টোর পিপলস পার্টির জাতীয় পরিষদে ৮৩টি আসনই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে পিপ্‌লস পার্টির কোন প্রার্থীই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি উভয়ই ছিল আঞ্চলিক দল। তারা যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত এবং আদর্শ ও কর্মসূচির দিক দিয়ে ছিল পরস্পরবিরোধী। সুতরাং দুই অঞ্চলে দুই দলের বিজয় পাকিস্তানের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে। মুসলিম লীগ, জামায়াত-ই-ইসলাম, জামায়েত-ই-উলামা-ই-ইসলাম প্রভৃতি পাকিস্তান ভিত্তিক দল যারা শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে ছিল তাদের বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে বস্তুত পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে।

আইনগত কাঠামো আদেশে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটি প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ আসন সংখ্যা

---

[৩০] জগলুল আলম, *বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা (১৯৪৮-৮৯)* (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯০), পৃ. ৫০-৫১।

31 Pakistan Election Commission, *Report on General Election, Pakistan (1970-71,)* Vol.-I, 1972.

ছিল ৩০০। আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক পরিষদসমূহের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে।[৩২]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ভালো চোখে দেখেনি। তারা বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করে তাদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় বৈঠক হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগের দাবি স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সব সময় শাসক দল ছিল অনড়। অন্য দিকে মওলানা ভাসানীর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও ঘেরাও, জ্বালাও পোড়াও কর্মসূচিসহ ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের আন্দোলন কর্মসূচির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। তাছাড়াও পরিকল্পনামাফিক নিয়ন্ত্রিত ছাত্রলীগের মধ্যকার লড়াকু সৈনিক সংঘতো ছিলই। বলা যায়, ইতোমধ্যেই তারা স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রচার শুরু করেন। এ সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পিকিংপন্থীরাও স্বাধীনতার প্রশ্নে এক ও অনড় ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৬ দফার মধ্যে সাধারণ মানুষ মুক্তির পথ দেখতে পায় এবং এক অবিনাশী সাহসী পদক্ষেপে ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে যায় স্বাধীনতা অর্জনের দিকে। আওয়ামী লীগ এই স্বাধীনতাকামী মানুষের আবেগ, তার তীব্র সংগ্রামী চেতনাকে দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে কাজে লাগায়। যদিও ৬ দফা দিয়ে আইয়ুব সরকারকে অশান্ত রাখতে পারলেও পরবর্তীতে সাধারণ জনগণের সামনে এসে তা এক দফায় রূপান্তরিত হয়।[৩৩]

কিন্তু পশ্চিমাদের আশাভঙ্গ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিজয় হয়। কিন্তু এই বিজয়ে সামরিক জান্তারা শঙ্কিত হয়। তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা প্রকাশ করেন। পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো যিনি পশ্চিম পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন তার ক্ষমতালিপ্সার কারণে, সামরিক জান্তারা তাকেই বেছে নেয় তাদের উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে কারণ যেহেতু জুলফিকার আলী ভুট্টো বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সামরিক বাহিনীর নীল নক্শার কারণে জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসতে রাজি হন নাই।[৩৪]

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা স্পষ্টত লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তখন সমাজতান্ত্রিক নিউক্লিয়াস বা *স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ* পূর্ব

---

[৩২] আবুল ফজল, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংঘাত ও পর্যালোচনা-(১৯৭১-৯১)* (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৮), পৃ. ৫০।

[৩৩] মাসুদুল হক,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০।

[34] *Pakistan Times*, 21 December, 1970.

বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম এক দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। তারই অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ 'জয় বাংলা বাহিনী' তাদের নির্মিত পতাকাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় স্বাধীনতার পতাকা হিসেবে উত্তোলন করে। ৩ মার্চ তারা পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইস্তেহার পাঠ করে। এ নেতারাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করেছিলেন ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করতে যে, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'[৩৫]

পরিস্থিতি ক্রমেই বিস্ফোরণোন্মুখ হচ্ছিল। এ অবস্থায় ১৯৭১ সালের ২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিউক্লিয়াসের নেতাদের সঙ্গে নতুন করে বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকে তাজউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এখানে বঙ্গবন্ধু তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনে তাজউদ্দিন আহমদকে নিয়ে সামগ্রিক কর্মকান্ড পরিচালনার পরামর্শ দেন। প্রবাসে সরকার গঠন, সশস্ত্র বাহিনী গঠন, অস্ত্র সংগ্রহ, ভারতে আশ্রয় ও সে দেশের সহযোগিতা, এবং তার অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে সরকার গঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।[৩৬] পরে ২৩ মার্চ নিউক্লিয়াসের চার নেতা সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শেখ মণি এবং তোফায়েল আহমদের সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদকে নিয়ে পুনরায় বৈঠকে বসেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, নিউক্লিয়াস ও যুব নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে পাকিস্তানি হামলা শুরুর পূর্বেই বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন।[৩৭]

মুজিব বাহিনী ও নিউক্লিয়াস নেতৃবৃন্দ

মুক্তিযুদ্ধ শুরূ হলে নিউক্লিয়াস নেতৃবৃন্দ দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা ভারতে গঠিত মূল মুক্তিবাহিনীতে যোগদান না করে মুজিব বাহিনী নামে পৃথক এক মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তা কোন বড় বিষয় ছিল না কারণ টাঙ্গাইল এলাকায় একইভাবে কাদের সিদ্দিকী মূল মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীতে যোগদান না করে পৃথকভাবে তার নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নিউক্লিয়াসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সিরাজুল আলম খান, হাসানুল হক ইনু, কাজী আরেফ আহমেদ পরবর্তীতে শাজাহান সিরাজ, আসম আব্দুর রব, নূর আলম জিকু মুজিব বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু নিউক্লিয়াসের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে পরবর্তী জাসদ নেতাদের সম্পর্কে বলেন যে, সিরাজুল আলম খানের উপর শিলিগুড়ির পাংগা ক্যাম্পের দায়িত্ব ছিল।[৩৮] এ সময় সিরাজুল আলম খান গোপনে কলকাতায় এসে নকশাল ও এস.ইউ.সি'র (S.U.C) এর সাথে যোগাযোগ করতেন।আর হাসানুল হক ইনু ছিলেন তানদুয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধানের দায়িত্বে। তিনি

---

[৩৫] এ.টি.এম আতিকুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।

[৩৬] কাজী আরেফ আহমেদ, *পূর্বোক্ত।*

[৩৭] এ.টি.এম. আতিকুর রহমান, *পূর্বোক্ত।*

[৩৮] মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮০।

দশ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সেই সাথে তাদের মার্কসবাদ সম্পর্কেও পাঠদান করতেন। যদিও পরবর্তীতে এ খবর পেয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এ কেন্দ্র বন্ধ করে দেন।[৩৯] শাজাহান সিরাজ সিরাজুল আলম খানের নির্দেশমত মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে সাথে থেকেছেন। সিরাজুল আলম খানের উপর পূর্ব থেকেই ভারতীয় সমাজতন্ত্রী শিবদাস ঘোষের 'সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার' (S.U.C) এর আদর্শিক প্রভাব ছিল প্রবল। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে (S.U.C) অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার এর শিবদাস ঘোষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[৪০] ভারতের প্রধান দুই কমিউনিস্ট পার্টি সি.পি.এম. (C.P.M) ও সি.পি.আই (C.P.I) এর পাশাপাশি শিবদাস ঘোষের এস.ইউ.সি (S.U.C) এর মৌলিক আদর্শগত পার্থক্য ছিল এই যে, তারা মনে করত ভারতের সমাজ ও অর্থনীতি পূর্ণমাত্রায় পুঁজিবাদী অপরদিকে সি পি এম ও সি পি আই তা মনে করতো না। এদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে সিরাজুল আলম খান ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে শিবদাস ঘোষের ব্যাখ্যাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।[৪১]

এভাবে দেখা যায় ছাত্রলীগ সদস্যগণ (ভবিষ্যৎ জাসদ) সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যদিও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম সমালোচিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের পর পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসেন ও স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ ও নিউক্লিয়াস নেতৃবৃন্দের সাথে বঙ্গবন্ধুর মতপার্থক্য

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছিল দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনতা। আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর সার্থকতা এখানে যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তর করে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাতে সামিল করতে পেরেছিলেন। প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী সকল রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর এদের সবারই প্রত্যাশা ছিল কিছু প্রাপ্তির কিন্তু সবাই আশাহত হয় আওয়ামী লীগের এককভাবে রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করায়।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াস কর্তৃপক্ষের সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রথম মতান্তর ঘটে সরকার গঠন প্রশ্নে। এ সময় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে

---

[৩৯] *ঐ*।

[৪০] "জাসদ বাসদের ভ্রান্ত, দোদুল্যমান ও বিভ্রান্তির রাজনীতি প্রসঙ্গে," *লক্ষ্মীপুর খোলা চিঠি গ্রুপ* শীর্ষক লিফলেট, ১৯৮১, পৃ. ৩৬।

[৪১] মোহাঃ রোকনুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩৯।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক শক্তিকে অর্ন্তভুক্ত করে একটি জাতীয় বিপ্লবী সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়। ১৯৭২ সালের ২৫ মে এক বিবৃতিতে আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নূরূল আম্বিয়া দাবি জানান যে, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে গণপরিষদ ও মন্ত্রিসভা বাতিল করা হোক এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠন করা হোক জাতীয় সরকার।[৪২] বঙ্গবন্ধু এসকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৪৩] পরবর্তীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হবার পর তারা এ বিষয়টি উল্লেখ করেন এভাবে,

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, যারা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের দ্বারা অবদমিত ছিল, তাদেরই স্বার্থের প্রতিভূ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শক্তিগুলোকে নিয়ে অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকার গড়ে তোলার পরিবর্তে কেবলমাত্র তাঁর দল আওয়ামী লীগের একক সরকার গঠনের মধ্যদিয়ে সকলের সম্মিলিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত ফল আত্মসাৎ করেন এবং জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করেন।[৪৪]

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ও নিউক্লিয়াস নেতা হাসানুল হক ইনু বঙ্গবন্ধুর কাছে ৬-দফা দাবি পেশ করেন। এগুলি হলো :

১. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও মতের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে সরকারি ঘোষণা বলে অস্ত্রশস্ত্রসহ ক্যাম্পে একত্রিত করে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং সরকারিভাবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে মর্যাদাবান করতে হবে।

২. পাকিস্তান ও বৃটিশের ছেড়ে যাওয়া ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বদলে নতুন প্রশাসনের অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে তাদেরকে মেধা অনুযায়ী কাজে লাগাতে হবে। এদের মধ্যে যারা স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনে আসতে চায়, তাদেরকে মেধা অনুযায়ী সুযোগ দিতে হবে।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, তবে সে বাহিনী প্রচলিত বাহিনীর মতো হবে না। এ বাহিনী হবে জনগণের বাহিনী। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে তাদের নিয়োগ করতে হবে।

৪. অস্থায়ী সরকার ও আওয়ামী লীগের এম এন এ ও এম পি-যারা ভারতে অবস্থানকালে দুর্নীতি করেছে, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার এবং ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ যারা জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে লড়েছে, তাদেরকে আওয়ামী লীগে আসার আহ্বান জানাতে হবে।

---

[42] *The Bangladesh Observer*, 26 May, 1972.

[৪৩] মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১ ও লরেন্স লিফশুলৎস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭।

[৪৪] *"বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিপ্লবের পর্যায় সম্পর্কে খসড়া থিসিস"*, জানুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ২৮।

৫. সরকার প্রধান নয়, দলীয় প্রধান হিসেবে শেখ মুজিব সরকারের বাইরে থেকে সরকারের ভুল ভ্রান্তিকেই শুধু দেখিয়ে দেবেন না, সেটা নিরসনের নির্দেশ দান করবেন এবং দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৬. বাইরে থেকে যে বিপুল সাহায্য আসছে তা প্রধানত দেশ পুনর্গঠনে ও গণশিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে হবে।[৪৫]

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের দ্বিতীয় দফায় এ সকল প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে তাদের সাথে বঙ্গবন্ধু তথা আওয়ামী লীগের দূরত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং সংকট আরও ঘনীভূত হয় এ সময় ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু ডাকসু নির্বাচন নিয়ে।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিভক্তি

স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগে স্বাধীনতার পর পরই প্রকাশ্য সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত বির্তক দেখা দেয়। বিতর্কের কারণ ছিল, সদ্য স্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ সমাজ কাঠামোর চরিত্র কি হবে এবং রাষ্ট্রের এই সূচনা মুহূর্তে এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এ বিষয়ে ছাত্রলীগ মতপার্থক্যগত কারণে স্পষ্টত দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ প্রভাবিত ছাত্রলীগের বিপ্লবী অংশ 'সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এ অংশের নেতৃত্বে ছিলেন আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ। অপরদিকে নূরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখন সমর্থকগণ, 'গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ' এর পক্ষে শ্লোগান তোলেন। রাজনীতি সচেতন বাঙালি তখন এই দুই ধারাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী ও মুজিববাদী বলে আখ্যায়িত করেন। ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দুটি প্যানেল জমা পড়ে। পরে ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই ছাত্রলীগ আনুষ্ঠানিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। দুটি ভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ পৃথক পৃথকভাবে সম্মেলনের আয়োজন করে।

ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জুলাই মাসের ২১, ২২, ২৩ তারিখে। ছাত্রলীগের মুজিববাদী অংশের সম্মেলনের আয়োজন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং সমাজতন্ত্রী অংশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে। উভয় গ্রুপ এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম রাখে। বাস্তবে মতাদর্শিক বির্তকের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল নিরপেক্ষ। বিবদমান উভয় পক্ষই বঙ্গবন্ধুর সহানুভূতি ও সমর্থন কামনা করছিল। কারণ বঙ্গবন্ধু তখন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। সম্মেলনের পূর্বের দিনও সমাজতন্ত্রী অংশ বঙ্গবন্ধুর প্রতি 'সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত অনুরোধ' রেখেছিলেন তাঁর নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখার। ছাত্রলীগের এ সম্মেলনকালে বঙ্গবন্ধু যোগ দেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুজিববাদীদের সম্মেলন স্থলে। ফলে এ সময় থেকেই সমাজতন্ত্রী তথা সিরাজুল

---

[৪৫] মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১।

আলম খানদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটতে থাকে ও জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল গঠনের প্রকাশ্য প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এভাবে ছাত্রলীগ ভেঙ্গে দু'ভাগ হবার পর একই আদর্শগত বিতর্কে আওয়ামী লীগের কৃষক ফ্রন্ট জাতীয় কৃষক লীগ ও শ্রমিক ফ্রন্ট জাতীয় শ্রমিক লীগ যথাক্রমে ১৯৭২ সালের মে ও জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়। বিভক্ত কৃষক লীগের আবদুল মালেক, শহীদুল্লাহ ও হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বাধীন অংশ এবং বিভক্ত শ্রমিক লীগের মোঃ শাজাহান ও রূহুল আমীন ভুঁইয়ার নেতৃত্বাধীন অংশ ছাত্রলীগের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের পক্ষাবলম্বন করে।[৪৬] এভাবে আওয়ামী লীগ থেকে আনুষ্ঠানিক বিভক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর আওয়ামী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ ও কৃষক লীগ সংগঠকরা প্রথম একটি রাজনৈতিক দল গঠনের আভাস দেন ১৯৭২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায়। এভাবে বক্তৃতা করতে গিয়ে আ স ম আব্দুর রব বলেন, "আমরা আমাদের নিজেদের সংগঠন চাই, কোন নেতৃত্ব দখলের জন্য নয়, আমরা দেশের মেহনতি মানুষের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনাদের নিজস্ব সংগঠন খাড়া করার দায়িত্ব নিলাম, যদি কোনদিন আমাদের মধ্যে নেতৃত্ব দখলের প্রবণতা দেখেন তাহলে জনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আমাদেরকে দেবেন।"[৪৭] এভাবে শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের প্রক্রিয়া।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয়। এই নব গঠিত রাজনৈতিক দলে আনুষ্ঠানিকভাবে এম. এ. জলিল (মেজর জলিল) এবং আ স ম আব্দুর রবকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষিত হয়। আহ্বায়ক কমিটির নাম :

(১) এম. এ. জলিল (মেজর জলিল, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার) আহ্বায়ক।

(২) আ স ম আব্দুর রব (ছাত্র নেতা, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা) আহ্বায়ক।

(৩) জনাব শাজাহান সিরাজ (সদস্য, প্রাক্তন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক)।

(৪) শ্রী বিধান কৃষ্ণ সেন (সদস্য, আগরতলা মামলার আসামী ও মুক্তিযোদ্ধা)।

(৫) জনাব নূর আলম জিকু (সদস্য, প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা)।

(৬) জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ (সদস্য, আগরতলা মামলার আসামী ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নৌবাহিনীর অন্যতম কমান্ডার)।

(৭) জনাব রহমত আলী (সদস্য, প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা)।[৪৮]

---

[৪৬] আলতাফ পারভেজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১।

[৪৭] *দৈনিক গণকণ্ঠ*, সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৭২।

[৪৮] *দৈনিক গণকণ্ঠ*, নভেম্বর ১, ১৯৭২।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয় :

> বাঙালি জাতি প্রচন্ড বিপ্লবী শক্তির অধিকারী কিন্তু সমগ্র জাতির সে বিপ্লবী চেতনা আজ প্রায় সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত স্তব্ধ। মুজিব সরকার রাষ্ট্র ও রাজনীতি দিয়েছে, তার ফলে বাঙালি জাতি এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। এসব অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তন করে সঠিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রভিত্তিক রাজনীতি নির্ধারণের জন্য দলের প্রগতিশীল অংশ নিরন্তর চাপ প্রয়োগ করে গেছে, কিন্তু তাদের কথায় কোন কর্ণপাত করা হয়নি। বর্তমান সুবিধাভোগী গোষ্ঠী গোটা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র তাদের করায়ত্ত। বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভরশীল এই মুজিব সরকার দেশের অরাজক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। মেহনতি শ্রমিক সমাজ উঠতি পুঁজিপতি ও শিল্প প্রশাসক গোষ্ঠীর যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে আর ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী প্রথার নিগড়ে কৃষক সমাজের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শোষক আর শোষিতের শ্রেণী দ্বন্দ্বই হলো প্রধান শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং এর অবসান না হওয়া পর্যন্ত শোষণ অব্যাহত থাকবে। শ্রেণী দ্বন্দ্ব অবসানের জন্য, শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশের কারণে সহায়ক শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক সংগঠনের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন তা উপলব্ধি করেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জন্ম লাভ করেছে।[৪৯]

এ ছাড়া জাসদ তার ঘোষণাপত্রে ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে :

১. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ও কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম।

২. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সফল সামাজিক বিপ্লব সংগঠনে সর্ব প্রকার সহায়তা দান।

৩. সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা।

৪. বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবী চেতনার জন্ম দেওয়া ও বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সত্তা অক্ষুন্ন রাখা।

৫. সাম্প্রদায়িকতার বিষদাঁত ভেঙ্গে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি মনোভাবের ভিত্তিতে মেহনতি মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা।

৬. যুদ্ধ জোট বহির্ভুত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হানিকর সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তি বাতিল। মানব সভ্যতার দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ সকল প্রকার আগ্রাসী শক্তির বিরূদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া ও চীনসহ যে কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এসব দেশের যে কোন প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দেশবাসীর জঙ্গী ঐক্য সৃষ্টি করা।

---

[৪৯] "প্রথম ঘোষণাপত্র জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল," *দৈনিক সংবাদ*, নভেম্বর ১, ১৯৭২।

৭. বিশ্বের সর্ব প্রকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা দান। বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা।

৮. সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করা।[৫০]

এভাবে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে জাসদের অভ্যুদয় দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক আলোডন ঘটায়। এ সময় আওয়ামী লীগের যুবকর্মীদের একটি বিরাট অংশ দলের কার্যকলাপে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া এ দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তথা পাকিস্তানপন্থী জামায়াত-ই-ইসলাম, মুসলিম লীগ ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দলে দলে জাসদে যোগদান করে।[৫১] ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সে সময় আওয়ামী লীগ বিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ দেশের বিপ্লবী শক্তি ছাড়াও রক্ষণশীল শক্তির মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে জাসদের জন্ম হলেও সব ইস্যুতে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা হয়ে দাঁড়ায় তাদের রাজনৈতিক তৎপরতার প্রধান উদ্দেশ্য। এভাবে প্রতিষ্ঠার পর চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও অতিবিপ্লবী শক্তিদ্বয়কে সাথে নিয়ে জাসদের যাত্রা শুরু হয়।

উপসংহার

দীর্ঘ সময়ের পথ পরিক্রমায় ষাটের দশকের ছাত্র নেতৃবৃন্দ সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ঐতিহাসিক বাস্তবতায় সামজতন্ত্রের বাস্তব ব্যাখ্যা ও কর্মসূচী নির্মাণসহ জাতীয় রাজনৈতিক সংকটে জাসদের ভূমিকা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোচিত এক বিষয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী ও শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কসবাদী দল হিসাবে জাতীয় সমজাতান্ত্রিক দল যে তাদের উদ্দেশ্যে সফল হন নাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই তবে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী এক দল হিসাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রগতিশীল ভূমিকা রাখতে যে সক্ষম হয়েছে এ দলের পরবর্তীকালীন ভূমিকা পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করা যায়।

---

[৫০] *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ১ নভেম্বর, ১৯৭২।

[৫১] মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ- শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৬।

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

নারীর মর্যাদা সমুন্নীতকরণে 'মাহর'-এর ভূমিকা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন*

Abstract: 'Mahor' (known as 'Mohorana') is an important concept in Islamic marrage system. It is mandatory for the husbands to pay 'Mahor'. But this is not done properly in Bangladesh, which badly affects the status of women in society. In this paper the author tried to explain how timely payment of 'Mahor' can upgrade the status of women in our society.

ভূমিকা

সভ্য সমাজে পরিবার সংগঠনের বৈধ প্রক্রিয়া 'বিবাহ'। বিশ্বের কেনো কেনো দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিয়ে ব্যতিরেকেই একত্রবাসের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। তবে ইসলাম ধর্মে এটি অনাচারের মধ্যে গণ্য। ইসলাম কেবল বিয়ের মাধ্যমেই পরিবার গঠন বা নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনকে বৈধ বিবেচনা করে। মানব প্রজন্মের ধারাকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান করেছে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি। আর পরিবার সংগঠনের সোপানটি হ'ল বিয়ে। বিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক দুজন নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনের উদ্বোধন করে। যুগ যুগ ধরে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ নারী-পুরুষের দৈহিক-মানসিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, ভবিষৎ প্রজন্মের সামাজিক অবস্থান ও পরিচয় সংরক্ষণের অপরিহার্য পন্থা হিসেবে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটিকে বৈধতা প্রদান করে এসেছে। বিয়ে মানব গোষ্ঠিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এজন্য ইসলাম বিয়েকে ধর্মীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম মুসলমানদের বিয়ের বিধি-বিধানও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। মুসলমানদের বিয়ের রীতি-নীতির মধ্যে একটি আবশ্যিক শর্ত হলো 'মাহর'। এটি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় অর্থ বা সম্পদ। বিয়েতে স্বামীর মাহর প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামে উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য বিয়ে যেমন অপরিহার্য তদ্রুপ বিয়ের একটি অংশ হিসেবে 'মাহর' নির্ধারণ একইরূপ অত্যাবশকীয়। Joseph Schacht বলেন যে, বিয়ে সাধারণ আইনে একটি চুক্তি এবং এটি স্ত্রী গ্রহণের একটি উন্নত প্রক্রিয়া নির্দেশ করে, বর কণের প্রকৃত অভিভাবকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে, এবং সে দায়িত্ব নেয় বিয়ে সংক্রান্ত উপহার বা উপঢৌকন প্রদানের। তবে প্রাক ইসলামি যুগের প্রথানুযায়ী অভিভাবককে নয়, স্ত্রীকেই।[১] আলোচ্য নিবন্ধটিতে ইসলামে বিয়েতে

---

* ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford:: Clarendon press, 1964), p. 161.

'মাহরের' তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের বিয়েতে 'মাহর' এর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর আলোকপাতের প্রয়াস রয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক সাবলম্বন এবং মর্যাদা সমুন্নতকরণের ক্ষেত্রে 'মাহরের' গুরুত্বও নিবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে।

মাহরের উৎপত্তির প্রাথমিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষে বিয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে একই রক্তধারার মধ্যে বিয়ের রীতি অবলুপ্ত হয়। অন্য গোত্র বা বংশ থেকে স্ত্রী সংগ্রহ করার বিধান এ যুগে পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত প্রাচীন সমাজে অপহরণ কিংবা লুণ্ঠনের মাধ্যমে স্ত্রী নিয়ে আসতো। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘাত-প্রতিঘাত কমে এসে ক্রমান্বয়ে সমাজ স্থিতিশীলতার দিকে ধাবিত হয়। এর ফলে ক্রমায়তভাবে অপহরণ, লুণ্ঠনের মাধ্যমে কন্যা সংগ্রহ করে বিয়ের প্রথা লোপ পেতে থাকে। এ যুগে পুরুষ কাঙ্খিত নারীকে আপন করে পাওয়ার জন্য কন্যার পিতা বা অভিভাবকের বাড়িতে মজুর খাটত। দীর্ঘদিন শ্রম দানের পর কণের পিতা বা অভিভাবক উক্ত ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিতো।[২] হযরত মুসা (আঃ) কে তাঁর শ্বশুর শুয়াইব (আ.) স্বীয় কন্যার সাথে বিয়ে দিতে রাজী হয়ে ছিলেন এই শর্তে যে হযরত মুসা (আঃ) দশ বছর কণের পিতার জন্য শ্রম দেবেন।[৩] কালক্রমে এই প্রথা পরিবর্তিত হয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে শ্রমের স্থলে অর্থ প্রদান করে স্ত্রীকে গ্রহণ করার নিয়ম চালু হয়।[৪] এভাবেই বিয়েতে মাহর দানের সূচনা। তবে পৃথিবীর সবর্ত্রই মাহর প্রদান প্রচলিত ছিল এমন নয়। কিছু কিছু সমাজে বিভিন্ন রূপে এই প্রথাটির অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

শাব্দিক অর্থে 'মাহর' অর্থ হলো দান বা প্রতিদান। মাহরের প্রতিশব্দ হিসেবে আস-সিদ্যাক, আস সাদুকা, আল-উজরা, প্রভৃতি শব্দ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম বিয়েতে মাহর হল বর-কণে উভয় পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত সম্পদ যা স্বামী স্ত্রীকে প্রদান করে বা করবে। এই মাহর নির্ধারণে কণের সন্তুষ্টি ও সম্মতি থাকতে হবে এবং স্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই অর্থ প্রদান করবে বা করার সম্মতি জ্ঞাপন করবে। সাদাক এবং মাহর শব্দ দু'টি সমার্থক। কিন্তু প্রাক ইসলামি যুগে দুটি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিয়েতে স্বামী স্ত্রীকে যে উপহার সামগ্রী প্রদান করে তা সাদাক নামে অভিহিত। অন্যদিকে মাহর স্ত্রীর পিতা বা অভিভাবককে প্রদান করা হতো। W. Robertson Smith বলেন, ''ইসলামে সাধারণভাবে সাদাক অর্থ উপঢৌকন যা মাহরের সমার্থক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাদাক হল স্ত্রীর জন্য উপহার এবং মাহর স্ত্রীর পিতা মাতার জন্য''[৫] কাজেই কণের পিতা-মাতা বা অভিভাবককে 'মাহর' প্রদান করে বিয়ে করার রীতি প্রাক ইসলামি যুগে প্রচলিত বহু প্রকার বিয়ের মধ্যে একটি ছিল। এ

---

[২] শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহ্হারী, *ইসলামে নারীর অধিকার*, অনুবাদ নূর হোসেন মজিদী ও আব্দুল কুদ্দুস বাদশা (ঢাকা ঃ আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭), পৃ. ১৮৬।

[৩] *তদেব*, পৃ. ১৯৬।

[৪] *তদেব*, পৃ. ১৮৭।

[৫] W. Robertson Smith, *Kinship And Marriage in Early Arabia* (Cambridge : at the University Press, 1885), p. 76.

ধরনের বিয়েকে সাদিকা বিয়ে বলা হয়েছে। অভিভাবককে অর্থ বা মাহর দিয়ে বিয়ে করা স্ত্রী ক্রয় করার সমার্থে বিবেচনা করা হ'ত। এ প্রসঙ্গে Smith বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেমেটিকদের মধ্যে অর্থের বিনিময়ে যে বিয়ে পরিদৃষ্ট হয় তাতে স্বামী স্ত্রীর প্রভূ হিসেবে পরিগণিত।[৬] ইহুদীদের মধ্যেও মাহর প্রদানের রীতি দেখা যায়। ইহুদীরা মাহর শব্দটিকে মোহর নামে অভিহিত করতো। এক্ষেত্রেও বর 'মোহরের' অর্থ কন্যার পিতা-মাতাকে প্রদান করত। তবে ইহুদী ধর্মে স্ত্রী বিয়ের সময় বা পরবর্তীতে মাহর পাওয়ার অধিকার রাখত না, স্বামীর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলে অথবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলেই স্ত্রী মাহর পেত।[৭] এথেন্সে ও রোমান সাম্রাজ্যে মাহর বা উপঢৌকন প্রচলিত ছিল তবে স্বামী স্ত্রীকে প্রদান করত না বরং স্ত্রী অর্থ সম্পদ নিয়ে স্বামীর সংসারে পদার্পণ করত।[৮]

প্রাক ইসলামী যুগে প্রচলিত কণের অভিভাবককে মাহর প্রদানের বিধান নিষিদ্ধ করে স্ত্রীকে 'মাহর' দেয়ার নির্দেশ দেয়। Levy বলেন, ''হযরত মোহাম্মদের (সা.) সময় পর্যন্ত পূর্বের তুলনায় প্রথাটিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। বর তখনও টাকা দিতো, কিন্তু তা শুধু স্ত্রীকে দিতে হত, পিতাকে বা অন্য কেনো আত্মীয়কে নয়, ফলে মাহার সাদক একই অর্থবোধক হয়ে দাড়ায়।''[৯] ইসলাম নারীর জন্য অবমাননাকর বহু প্রাক ইসলাম রীতি বিলুপ্ত করে এবং পরিবারে ও সমাজে নারীর মর্যাদা উন্নীতকরণে অনেক বিধি বিধানের প্রবর্তন করে। 'মাহর' এমনই একটি বিধান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ''অন্য সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এইভাবে যে, ''তোমরা সম্পদের বিনিময়ে (মাহরের বিনিময়ে) তাদের লাভ (বিয়ে করা) করতে চাইবে। যৌন পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, দৈহিক কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নহে আর যে অর্থ বা সম্পদের বিনিময়ে তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও, তাদের সেই নির্ধারিত বিনিময় প্রদান করিও''।[১০] এই আয়াতে পরিস্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, নারীদের পুরুষরা বিয়ের মাধ্যমে সহধর্মিনীর মর্যাদা দেবে নিজের যৌন পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, দৈহিক কামনা চরিতার্থ করার হীন মনোবৃত্তি নিয়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে মাহর বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বোঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে, বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে।[১১] তায়েবজীর মতে, মাহর বা উপঢৌকন একটি নির্দিষ্ট

---

[৬] *Ibid*, p. 79.

[৭] M.A. Qureshi, *Muslim Law of Marriage Divorce And Maintenance* (New Delhi : Deep publications, 1995), p. 96.

[৮] *Ibid.*

[৯] Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge : At the University Press, 1965), p. 95.

[১০] আল কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত, ২৪।

[১১] ইবনুল আবেদীন শামী, *রাদুল মুহতার*, ৩য় খন্ড (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৯), পৃ. ১০০-১০১,উদ্ধৃত মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মুসলিম বিবাহে মাহর, একটি পর্যালোচনা, গবেষণা পত্রিকা, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ম সংখ্যা, ২০০৪-

পরিমাণ অর্থ যা বিবাহের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয়, এটি দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি অথবা আইনের প্রয়োগ।[১২] Mulla বলেন যে, মাহর অথবা উপঢৌকন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অথবা সম্পদ যা স্ত্রী বিবাহ উপলক্ষে স্বামীর কাছ থেকে গ্রহণ করে।[১৩]

স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাহর

মাহর প্রাপ্তির মাধ্যমে ইসলামী বিবাহ রীতিতে স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকে নিম্নলিখিতভাবে পর্যালোচনা করা যায় :

স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান

মাহর প্রদত্ত হয় স্ত্রীকে মর্যাদা প্রদানের নিমিত্তে। নারী ও পুরুষ উভয়েই দাম্পত্য জীবন প্রারম্ভের সময় একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যেন দৈহিক-মানসিক সম্পর্ক গড়ে তোলায় উদ্যোগী হয় - ইসলাম এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রারম্ভিক নিদর্শন হিসেবে স্বামীকে মাহর প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। মাহর এমন এক অর্থ সম্পদ যা বিয়ের সময় স্ত্রী স্বামীর কাছে প্রত্যাশা করে। এটি প্রদানে বা নির্ধারণে স্ত্রী স্বামীর প্রতি প্রীত হয়ে তার সাথে সাংসারিক জীবনে পদার্পনের শুভ সূচনা করে, অন্যদিকে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বিয়ের সময় বা পরে নির্ধারণ করা যায়। বৈবাহিক সম্পর্কের স্থিতিবস্থা বা এ চুক্তির নিরসন উভয় ক্ষেত্রেই এটি স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্ত অর্থ। আবদুর রহিমের মতে, এটি বলা সঠিক হবে না যে মুসলিম আইন অনুযায়ী মাহর কেবলমাত্র বিবাহ বন্ধনের জন্য স্বামী কর্তৃক নিঃস্বার্থভাবে প্রদেয়। বাস্তবক্ষেত্রে মুসলিম আইন অনুযায়ী এটি স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বাধ্যতামূলক আরোপিত শর্ত।[১৪]

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম ধর্মে বিয়েতে মাহর নির্ধারণে কণের মত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কণে স্বীয় অভিভাবকদের কাছে তার কাঙ্খিত মাহরের পরিমাণ জানাতে পারে বা অভিভাবকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ধার্যকৃত মাহরের পরিমাণ সম্পর্কে মতৈক্যে পৌছাতে পারে। কণেপক্ষ কণের পূর্ণ সম্মতি নিয়েই পাত্রপক্ষের সাথে মাহর নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনায় বসবে - এটি ইসলামি বিধান। দাবীকৃত মাহর পাত্র প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে কণে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে। কণের মর্যাদা, সৌন্দর্য, গুণাবলী বিবেচনা করে সাধারণত মাহরের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কাজেই মাহর প্রদানের মধ্য দিয়েই স্বামী স্ত্রীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। প্রাপ্য মাহর পরিশোধ স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার। দাম্পত্য

২০০৫, পৃ. ১২৮; মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১৫১-১৫২।

[১২] Tyabji, *Muslim Law*, p. 107; Quoted by M.A. Qureshi, *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, p. 96.

[১৩] Mulla, *Mahomedan Law*, p. 277; Quoted by M.A. Qureshi, *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, p. 96.

[১৪] Abdur Rahim, *Principles of Mohammedan Jurisprudence*, p. 334, Quoted by M.A. Qureshi, *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, p. 97.

জীবনে স্ত্রীও যে স্বামীর সহকর্মী, এবং একে অপরের উপর অধিকার সম্পন্ন, মাহর প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে বিষয়টি স্বীকৃত হয়।

স্বামী-স্ত্রীর হৃদ্যতা সৃষ্টি

পবিত্র কুরআন শরীফে কর্তা বা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পরিবার প্রধানের দায়িত্ব পুরুষের। স্বামীর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে স্ত্রীর যাবতীয় চাহিদা পূরণ ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহের। স্ত্রী স্বামীর সহযোগী হিসেবে স্বামীর মনোরঞ্জন, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, পারিবারিক কর্মকাণ্ডের প্রাত্যহিক তত্ত্বাবধান, সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি নানা কর্মের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ইসলাম অর্থ-উপার্জন সংক্রান্ত কেনো কার্যভার নারীর জন্য বাধ্যতামূলক করেনি। উপার্জনক্ষম পুরুষ দাম্পত্য জীবন প্রবাহে সংগিনীকে তার দাবীকৃত অর্থ বা সম্পদ দিয়ে নতুন জীবন শুরু করে থাকে। এই বিধান উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার সৃষ্টিতে অনবদ্য অবদান রাখে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'মাহর' বিয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়। আল্লামা শাওকানীর মতে, ''নবী করিম (স.) স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভেই স্ত্রীকে কিছু না কিছু দেয়ার জন্য বলেছেন।[১৫]

নারীর অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি

জাগতিক পথ পরিক্রমায় ব্যক্তিমাত্রেরই নিজস্ব আর্থিক অবস্থানের সুদৃঢ়তার প্রয়োজন রয়েছে। সাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে মাহরের ভূমিকা সামান্যতম হলেও 'মাহর' পাওয়ার অধিকার নারীর। মাহর হিসেবে প্রাপ্য অর্থ নারীর সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থ। এই অর্থে সে নিজের জন্য সম্পদ ক্রয় করতে পারে, অর্থ উপার্জনের জন্য অংশীদারী ব্যবসায় লগ্নি করতে পারে। কিংবা সে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এম.এম. সিদ্দিকী বলেন যে, বিয়ের পর মহিলাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থে ইসলাম স্বামীকে যুক্তিসঙ্গত মাহর প্রদানে আইনানুগভাবে বাধ্য করেছে।[১৬] এম.এম কোরাইশীর মতে, মুসলিম আইনে বিয়ে স্ত্রীর অধিকারের রক্ষাকবচ যা তাঁর সামাজিক মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থান সুনিশ্চিত করে।[১৭]

পুরুষের তালাক প্রদানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে। মুসলিম বিয়েতে 'মাহরের' উপস্থিতি তালাক চর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলা যায়। তবে এটি আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ইরানী লেখক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহ্হারী বলেন, ''সবচেয়ে ভিত্তিহীন কথা হলো, যারা মোহরানাকে পুরুষের তালাকের অধিকারের বিপরীতে নারীর জন্য একটি আর্থিক জামানতস্বরূপ বলে উল্লেখ করে থাকে। তারা দাবী করে, ইসলাম যে মোহরানাকে প্রবর্তন করেছে তার কারণ হলো এটাই। মোহরানা নারীর

---

[১৫] মওলানা, মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

[১৬] Mohammad Mazheruddin Siddiqi, *Women in Islam* (Lahore : Institute of Islamic Culture, 1966), p. 53

[১৭] M.A. Qureshi, *Muslim Law of Marriage, Divorce And Maintenance,* p. 53.

আর্থিক জামানত হিসেবে ইসলাম বিবেচনা করেনি।"[১৮] মর্তুজা মোতাহ্হারী এই যুক্তি সম্পূর্ণ রূপে মেনে নেয়া যায় না। স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন 'মাহর' প্রদানের মূল কারণ হলেও বিয়ে বিচ্ছেদের পথে অন্তরায় হিসেবে এর ভূমিকা তুচ্ছ করা যাবে না। ক্ষেত্র বিশেষে মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে থাকে। মওলানা মোহাম্মদ আলী যথার্থই বলেন যে, সাধারণভাবে মাহর স্বামীর তালাক প্রদানের অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়।[১৯]

মাহরের কেনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। মাহর ধার্য করার দায়িত্ব পাত্র ও পাত্রী উভয়পক্ষের ওপর অর্পিত এবং উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদনে মাহর নির্দিষ্ট হয়েই বিবাহ চুক্তিটিকে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইমাম শাফেয়ী মাহরের কোনো নূন্যতম অর্থ নির্ধারণ করেননি বরং উভয়পক্ষের ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করে।[২০] হাম্বলী মতবাদীদের মতও অনুরূপ। হানাফি মতে, মোহরানা এক দিনার বা দশ দিরহামের অধিক হতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে মাহর পাত্রের প্রদানের সামর্থ সাপেক্ষেই ধার্য হতে হবে। অনুরূপভাবে পাত্রীর সন্তুষ্টির প্রশ্নও এখানে প্রণিধানযোগ্য। কণে যদি তার স্বামীর কাছ থেকে সামান্য দ্রব্যাদির বিনিময়ে বিয়েতে রাজী হয় তাহলে নির্বিঘ্নে বিয়ে হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সামান্য মাহরে স্ত্রী তুষ্ট হয়েছে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। অভিভাবক বা মেয়ের পক্ষ কেউই 'মাহরের' অপর্যাপ্ততা নিয়ে স্বামীকে প্রশ্নবিদ্ধ করেনি। স্ত্রীর সন্তুষ্টি মাহর আদায়ের মূল লক্ষ বলে বিবেচিত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (দ.) সামান্য এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিয়ের অনুমোদন দিয়েছিলেন।[২১] ফিকাহ বিশারদগণ মনে করেন, মহানবী (দ.) এর পর এ ধরনের 'মাহরের' বিনিময়ে বিয়ে সম্পন্ন করার অধিকার কারো নেই।[২২] মহানবী (দ.) মাহরের ক্ষেত্রে অর্থ নির্দিষ্ট করে দেননি। ইসলাম এক সার্বজনীন ধর্ম। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এ ধর্মাবলম্বী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্মে এ ধর্মাবলম্বীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈপরিত্য বৈবাহিক রীতিকে প্রভাবিত করছে এবং এটিই স্বাভাবিক। সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ব্যক্তির মন-মানসিকতার, রীতি-নীতির রূপান্তর ঘটে থাকে প্রতিনিয়তই। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বিন্যস্ত সামাজিক স্তরে ভিন্ন মাত্রায় 'মাহর' নির্ধারিত হতে পারে। এম.এম. কোরাইশীর মতে, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে মাহরের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ মাহরের পরিমাণ নির্ধারণে নির্দিষ্ট কেনো আইন নেই। মাহরের পরিমাণ নির্ধারণ নির্ভর করে পক্ষ দ্বয়ের

---

[১৮] শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহ্হারী, *ইসলামে নারীর অধিকার*, পৃ. ২০২।

[১৯] Maulana Muhamad Ali, *The Religion of Islam* (Lahore: The Ahmadiah Anjuman Ishat Islam, 1950), p. 624.

[২০] ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮শ খণ্ড) (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃ. ৭৫৩।

[২১] মওলানা আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, পৃ. ১৫৭।

[২২] ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮শ খন্ড), পৃ. ৭৫৩।

সামাজিক মর্যাদা ও সমাজের অবস্থার ওপর।[২৩] মহানবী (দ.) উম্মুল মোমেনিনদের বিয়ের সময় পাঁচশত বা পাঁচশতাধিক দিরহাম মাহর প্রদান করেছিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হযরত উম্মু হাবিবা ঃ বিনত আবী সুফিয়ান। আবিসিনিয়া হিজরতকালে উম্মে হাবিবা বৈধব্য লাভ করেন। হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর সাথে উম্মে হাবিবার বিয়ের সময় আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাসী চার হাজার দিরহাম অর্থ মাহর হিসেবে নিজ তহবিল থেকে প্রদান করেছিলেন।[২৪] এক্ষেত্রে মহানবী (দ.) কেনো মন্তব্য করেননি।

বিয়ের সময় সম্পূর্ণ মাহর প্রদান করা সর্বোত্তম। মহানবী (দ.) মাহর প্রদান করে বৈবাহিক জীবন প্রারম্ভের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহানবী (দ.) হযরত আয়েশা (রা.) কে বিয়ের পর পিতৃগৃহে রেখেছিলেন দু'কারণে। প্রথমতঃ হযরত আয়েশা (রা.) বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠেননি; দ্বিতীয়তঃ মাহর প্রদানের মত অর্থ তার কাছে ছিল না। হযরত আয়েশা স্বামী গৃহে গমনের উপযুক্ত বয়প্রাপ্তির পর হযরত আবুবকর মহানবীকে (দ.) মাহরের পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণের অনুরোধ করেন। মহানবী (দ.) ঋণ গ্রহণ করে মাহর প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। হযরত আবুবকর (রা.) ঋণের অর্থ প্রদান মাত্র গ্রহণ করবেন এই শর্তে রাজী হলে মহানবী (দ.) ঋণ নিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) কে 'মাহর' দেন এবং তাঁকে ঘরে তুলে আনেন।[২৫] স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমার (রা.) বিয়ের পর মহানবী (দ.) হযরত আলীকে মাহর পরিশোধের নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) এর কাছে এ সময় নগদ অর্থ না থাকায় মহানবী (দ.) আলীকে তাঁর লোহবর্মটি বিক্রয়ের পরামর্শ দেন। হযরত আলী লৌহবর্ম বিক্রয় করে মাহরের অর্থ সংগ্রহ করেন। উপরোক্ত দু'টি উদাহরণে প্রতীয়মান হয় যে, বিয়ের আসরে মাহর প্রদান সর্বোত্তম। এর সপক্ষে বিধান রয়েছে যে, কেনো স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে মাহর প্রাপ্তির পূর্বে তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে অপারগতা প্রকাশের অধিকার রাখে। মাহর বিয়ের সময় প্রদানে অসমর্থ হলে স্বামী স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে পরবর্তীতে পরিশোধ করতে পারে। মাহরের কিছু অংশ প্রদান করেও বিয়ে সুসম্পন্ন হতে পারে। বাকী অংশ স্বামী নির্দিষ্ট সময় নিয়ে দু'বছর বা তিন বছর পরে এটি আদায় করতে পারে। স্ত্রী চাইলে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে পারে। আল কুরআনে নির্দেশ রয়েছে ''আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহর স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মাহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে।[২৬] তবে স্ত্রী চাওয়া মাত্রই মাহর প্রদান করতে হবে। মাহর নির্ধারণ ছাড়াই কেনো বিয়ে সম্পন্ন হলে কণের পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী মাহর ধার্য হবে। যেমন তার মা, ফুফু বা অন্য বোনের বিয়েতে যে পরিমাণ মাহর দেওয়া হয়েছিল সেই পরিমাণ মাহর

---

[২৩] M.A. Qureshi, *Muslim Law of Marraige, Divorce And Maintenance*, p. 99.
[২৪] ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮শ খন্ড), পৃ. ৭৫৩।
[২৫] মওলানা নূরুল রহমান, উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭), পৃ. ৩৫-৩৬; সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, ইসলামে নারীর স্বাধীকার ও বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপট, *গবেষণা পত্রিকা*, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৪১-৪২।
[২৬] আল-কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত, ৪।

দেয় বলে বিবেচিত হবে।[২৭] এভাবে মাহর ধার্য করাকে মাহরে মিছাল বলে। মাহরে মিছালের বিবেচনার সময় কণের সঙ্গে তুলনীয় মহিলাকে কণের সমপর্যায়ের হতে হবে।[২৮] মাহর প্রদানকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে। নির্ধারিত মাহর দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভেই পরিশোধ করা সর্বোত্তম।[২৯] স্বামীকে স্ত্রীর মাহর প্রদান নিজের ঋণ স্বরূপ বিবেচনা করতে হবে এবং মাহর প্রদান করার আর্থিক সামর্থ এবং মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই বিয়ে করতে হবে। প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষকেই মাহর পরিশোধ করতে হবে। অবৈধ অর্থ হতে মাহর আদায় করা হলে তা 'মাহর' হিসেবে গণ্য হবে না। অবশ্যই বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ থেকেই মাহর আদায় করতে হবে।

বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারে মাহর ধার্য ও আদায়

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ অধ্যুষিত এদেশটিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের কাছাকাছি। এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ জনগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের অধিকাংশ বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলামিক রীতি-নীতির প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। মুসলিম বিয়ের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত 'মাহর' এর প্রতি মুসলিম জনগোষ্ঠির একাংশের দৃষ্টিভঙ্গি অস্বচ্ছ। নিম্নে আলোচনায় বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

যৌতুক প্রথা

ইসলাম বিয়েতে নারীকে যে সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে বাংলাদেশে তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে - যৌতুক প্রথা। ইসলাম ধর্মে বিয়েতে যৌতুকের কেনো স্থান নেই। অথচ এই অনৈসলামিক প্রথা মুসলিম পরিবারের বিয়ে অনুষ্ঠানে অনধিকার অনুপ্রবেশ করে শরীয়াসম্মত বিয়ের রীতিকে অবমাননা করছে, কলুষিত করেছে পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে। যৌতুক হল কণের পিতা প্রদত্ত নগদ অর্থ ও সম্পদ যা বিয়ের শর্ত সাপেক্ষে কণের অভিভাবক বর বা বরের অভিভাবককে দেয়। যৌতুক দেয়ার শর্তেই এই বিয়ে সম্পন্ন হয়। যৌতুকের এবং মাহরের অবস্থিতি বিয়েতে মাহর প্রদানের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্বকে অর্থহীন করে তোলে। যৌতুক প্রথায় কণের অভিভাবকের অসমর্থতা সত্তেও বর ও বরের অভিভাবকের চাহিদা অনুযায়ী নগদ অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, বাড়ী-গাড়ী, জমি ইত্যাদি প্রদান করতে হচ্ছে। এতে ঋণগ্রস্থ, নিঃস্ব হয়ে পড়ছে কণের অভিভাবক। যৌতুক নামক সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়ছে মুসলিম সমাজ। অথচ ইসলাম যৌতুক গ্রহণকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও জঘন্য হীন কর্ম হিসেবে বিবেচনা করে। মহানবী (দ.) বলেন, ''যে ব্যক্তি সম্মান লাভের আশায় বিয়ে করে আল্লাহ্ তার লাঞ্চনা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে তাকে সম্পদ লাভের আশায় বিয়ে

---

[২৭] ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮শ খণ্ড), পৃ. ৭৫২।
[২৮] ড. মুহম্মদ মাহবুবুর রহমান, মুসলিম বিবাহে মাহর ঃ একটি পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
[২৯] ইসলামী বিশ্বকোষ (১৮শ খণ্ড), পৃ. ৭৫২।

করে আল্লাহ্ তার দারিদ্রতাই বৃদ্ধি করে দেন।"[৩০] এ হাদীস থেকেই অনুমিত হয় যে, অর্থ সম্পদ প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে বিবাহ ইসলামী শরীয়ত বিরোধী। কণের পিতা বা অভিভাবক কর্তৃক কন্যাকে কেনো উপহার উপঢৌকন প্রদান করা ইসলাম অননুমোদিত - তা নয়। পিতা স্বীয় কন্যা বা জামাতাকে পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কার গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবই দিতে পারে তবে তা কখনো বিয়ের শর্ত হিসেবে নয়।[৩১] শর্ত হিসেবে দ্রব্য-সামগ্রী প্রদেয় হলে তা হবে সম্পূর্ণভাবে ইসলামী রীতির পরিপন্থী। কণের পিতা তার মেয়ে-জামাতাকে যা কিছু দেবে তা হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত এবং সামর্থ অনুযায়ী। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুক নামক অভিশাপের কষাঘাতে কণের পিতা ও পরিবার পর্যুদস্ত হচ্ছে। 'মাহর' প্রাপ্তির মাধ্যমে স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করে ঘরে আনার বিধান যে ধর্মে রয়েছে সেই ধর্মে স্ত্রী লাঞ্ছিত হচ্ছে যৌতুকের দাবী মেটাতে গিয়ে। এটি বাংলাদেশের উচ্চমধ্যবিত্ত, নিম্নধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সব সমাজের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌতুক প্রথা মুসলিম নারীর মর্যাদাকে অবনমিত করেছে। 'মাহর' এর বিপরীতার্থক হওয়ার এই ঘৃণ্য প্রথা 'মাহর' আদায়কে প্রহসনে পরিণত করেছে। কাজেই যৌতুক প্রথাকে অবলুপ্ত করে এবং যথাযথভাবে মাহর আদায় করে মুসলিম সমাজে স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা উন্নীতকরণের যাত্রা শুরু করতে হবে।

কণের অসচেতনা

ইসলামী বিধান অনুযায়ী কণে স্বয়ং স্বীয় বিবাহের 'মাহর' নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। অভিভাবক কণের সাথে আলোচনা করে কণের প্রতিনিধি হিসেবে বরপক্ষের সাথে মাহর ধার্যে বসবে। কিন্তু বাংলাদেশে 'মাহর' ধার্যের ক্ষেত্রে কণের ভূমিকা এখনও গৌণ হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিগত শতকে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। শিক্ষিত নারীদের এক বিরাট অংশ নানা পেশায় যেমন - শিক্ষকতা, চিকিৎসা, প্রশাসন, অফিস-আদালত, ব্যাংক, এনজিও ইত্যাদি এমনকি প্রতিরক্ষায় যোগদান করে পুরুষের সাথে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে চলেছে। নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত নারীদের 'মাহরের' ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকার যৌক্তিকতা অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষিত নারীরাও ইসলাম প্রদত্ত 'বিয়েতে নারীর অধিকার' আদায়ে সচেতন হচ্ছে না। পরিবার কণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে 'মাহর' নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে বিয়েতে এমন ঘটনা কমই ঘটছে। দু'পক্ষের বিবাহ চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার এক পর্যায়ে কণে পক্ষ 'মাহরের' প্রস্তাব উত্থাপন করে, বরপক্ষ সেটির পক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করে অথবা উভয় পক্ষই বাক-বিতন্ডার মাধ্যমে স্বীয় মত বহাল রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টার শেষে মতৈক্যে পৌছায়। 'মাহর' নির্ধারণের পরে অথবা বিয়ের আসরে কণে ধার্যকৃত মাহরের

---

[৩০] ইমাম তাবারানী আল-মুজামুল আওসাত, অনুচ্ছেদ ঃ মিন ইসমিহী ইবরাহীম (কায়রো ঃ দারুল হারামাইন ১৪১৫ হি.,), পৃ. ২১ উদ্ধৃত, কামরুজ্জামান শামীম, যৌতুক প্রতিরোধ ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, ইসলামী আইন ও বিচার বর্ষ - ৯ সংখ্যা, পৃ. ১৪২।

[৩১] মওলানা আবদুর রহিম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ. ১৬২।

পরিমাণ জানতে পারে। এটি বাংলাদেশে বিয়ে অনুষ্ঠানের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা স্বীয় 'মাহর' ধার্যের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। হযরত ওমর (রা.) মাহরের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম করার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু হযরত ওমরের ঐ প্রচেষ্টার বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করে একজন মহিলা বলেন, ''তুমি লোকদেরকে মেয়েদের মোহরানার পরিমাণ চারশ দিরহামের বেশী বাঁধতে নিষেধ করছো?''[৩২] তুমি কি শোননি আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন - ''তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাকো তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না।''[৩৩] এই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে হযরত উমর বললেন - একজন মহিলা সঠিক বলতে পারলো ভুল করলো একজন রাষ্ট্রনেতা।'' ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাদের 'মাহর' এর অধিকার নিয়ে 'রাষ্ট্রনায়কের' ভুল ধরেছিলেন একজন মহিলা। এই উদাহরণ মনে রেখে আজ বাংলাদেশে 'মাহর' নির্ধারণের অধিকার নিয়ে নারীদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। 'মাহর আদায় বিলম্বিত হলে স্ত্রীদের স্বামীর কর্তব্যের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

মাহর ধার্যে ও আদায়ে অসামঞ্জস্যতা

বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাসকে মোটামুটি চারটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। সমাজে উচ্চবিত্তের সংখ্যা কম। অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভবে তারা সমাজে শীর্ষস্থানে রয়েছে। অঢেল বিত্তের স্রোতধারায় বহমান যাদের জীবন, তাদের সংখ্যা এদেশে নগণ্য। 'মাহর' সংক্রান্ত সমস্যা এ সমাজের সমস্যা নয়। মধ্যবিত্তের তিনটি স্তরেই 'মাহর' ধার্য ও পরিশোধ সংক্রান্ত অসমাঞ্জস্যতা বিদ্যমান। এ সমাজে মাহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে বিশাল অংক নির্দিষ্ট করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষ মাহরের পরিমাণকে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে চলেছে। মাহরের কিয়দংশ পরিশোধ এ দেশের বিয়ের ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত প্রথা বাকী অংশ আদায়ের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। বাকী অংশ স্বামী কর্তৃক অবশ্যই প্রদেয় এবং স্ত্রী চাওয়া মাত্রই তা প্রদত্ত হবে এই বিষয়টি স্মরণ রেখে মাহর ধার্য করা যুক্তি সঙ্গত। পাত্রী পক্ষ বিয়েতে অধিক পরিমাণ মাহর ধার্যের ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে কণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এটি সঠিক নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে 'মাহর' সংসার ভাঙ্গনের জোয়ারে বাধ হিসেবে কাজ করবে - এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাহর' ধার্য অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী কর্ম। সংসার ভেঙ্গে গেলে স্বামীকে 'মাহরের' দায়বদ্ধতায় ঋণী করার দুরভিসন্ধি নিয়ে 'মাহর' ধার্য - কেনোক্রমে শরীয়সম্মত বা বিবেকসম্মত কাজ নয়। এজন্যই মহানবী (দ.) বলেছেন, ''সবচেয়ে উত্তম পরিমাণের 'মাহর' হচ্ছে তা যা আদায়

---

[৩২] *তদেব*, পৃ. ১৫৮-১৫৯।
[৩৩] আল কুরআন ঃ সুরা নিসা, আয়াত, ২০।

করা খুবই সহজসাধ্য।"[৩৪] দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্দ্ধমানতা, জীবনযাত্রার ব্যয়বহুলতার দূর্বিপাকে প্রাণান্ত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা কমেনি বরং পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় যথেষ্ঠ পরিমাণ ব্যয়ের পর সম্পূর্ণ মাহর আদায়ের মত আর্থিক অবস্থা যদি পাত্রের না থাকে তাহলে পর্বত প্রমাণ মাহরের বোঝা তার কাঁধে চাপাতে হবে কেন? মূলতঃ মাহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পরিবার গুলোকে দু'টো বিষয়ে সচেতন হতে হবে। প্রথমতঃ কণের মর্যাদা বিবেচনায় রেখে মাহর নির্ধারণ, দ্বিতীয়তঃ পাত্রের পক্ষে তা আদায় সহজসাধ্য কি না? মাহর ধার্য করে তা আদায় করার সদিচ্ছা যদি না থাকে, অথবা আদায় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে পরিমাণ 'মাহর' নির্ধারণ করা অবশ্যই যৌক্তিক নয়। বিয়ের সময় বিশাল অংকের মাহর ধার্য করে পরবর্তীতে তা প্রদান করার বিষয়টি অগ্রাহ্য করার মত মানসিকতা সম্পন্ন স্বামীর সংখ্যা বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজে কম নয়। মোট কথা এ ধরনের ব্যক্তির কাছে 'মাহর' নির্ধারণ এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এটি আদায়যোগ্য ঋণ বলে তারা বিবেচনায় আনে না। আল কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, ''তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রীদের মাহর পরিশোধ করিয়া দাও''।[৩৫] মাহর পরিশোধের বিষয়টিকে যে ব্যক্তি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কররে সে শরীয়া পরিপন্থী কাজ করে থাকে। মহানবী (দ.) এ ধরনের ব্যক্তিকে 'ব্যাভিচারী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ২০০৭ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সম্পন্ন কিছু বিয়ের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে এ সময়ের অনেক বিয়েতেই ৫ থেকে ১০ লাখ পর্যন্ত মাহর ধার্য করা হয়েছে। একজন প্রথম শ্রেণীর চাকুরীজীবীর যা আয় তা থেকে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর সে কিভাবে বিশাল অংকের মাহর পরিশোধ করবে? পৈত্রিক সম্পত্তি কিংবা পিতার আর্থিক সাহায্য পেয়ে কিছু সংখ্যক স্বামী স্ত্রীর মাহর পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু নিজের অর্থে যে ব্যক্তি স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোনের দায়িত্ব পালন করে অথবা শুধুমাত্র স্ত্রীকে নিয়েই সংসার করছে তার পক্ষে বিশাল অংকের মাহর প্রদান কিভাবে সম্ভব? অথচ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে মাহর হচ্ছে অবশ্য পরিশোধ্য ঋণ। বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা মৃত্যু হলেও এ ঋণ পরিশোধযোগ্য। মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে তার স্ত্রীর মাহর দিতে হবে।

নিম্নবিত্ত পারিবারিক কাঠামোয় মুসলিম বিবাহ রীতি সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন করা হচ্ছে। যৌতুকের শেকড় সমাজের এ স্তরের গভীরে প্রোথিত। মাহর ধার্যের ক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে রয়েছে ইসলামী বিয়ে-রীতির চরম অবমাননা। তালাক প্রথার অহেতুক চর্চার ফলে সুস্থ সুন্দর পারিবারিক জীবনের সুশীতল ছায়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অগণিত শিশু। স্বামীর আয় রোজগারের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে নিম্নবিত্তদের মধ্যে মাহর ধার্য করা হয় না আর করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী মাহর আদায় অপরিহার্য বিবেচনা করে না। কায়িক শ্রমে নিয়োজিত প্রান্তিক চাষী বা শ্রমজীবি খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে শিক্ষার অভাব, ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞানতা ইত্যাদি কারণে মাহরের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনা দেখা যায়। তবে

---

[৩৪] সুনান আবু দাউদ, পৃ. ২৮৮।
[৩৫] আল কুরআন, সুরা নিসা, আয়াত, ৪।

যৌতুক প্রথার অবাধ চর্চা এ সমাজে মাহরকে গুরুত্বহীন করে তোলার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে। যৌতুকের ক্রমাগত চাপে স্ত্রী কখনো নির্যাতিত লাঞ্ছিত হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসছে, কখনো স্বামী ও তার পরিবারের নির্মমতার বলি হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। নিম্নবিত্ত পরিবারে নারী সবচেয়ে নিগৃহীত হচ্ছে কেবল যৌতুকের কারণে। ১৯৮৪ সালে যৌতুক বিরোধী আইন হয়েছে, এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। তবে শুধু আইনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। ধর্ম সংক্রান্ত প্রচারনা অনুষ্ঠানগুলোতে 'মাহর' সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে হবে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দরিদ্র ব্যক্তি যদি যৌতুক পরিহার করে সামর্থ অনুযায়ী 'মাহর' দিয়ে স্ত্রীকে মর্যাদা প্রদান করে তবে তার মধ্যেই সে কল্যাণ খুজে পাবে। স্বামীর সামান্য মাহরই দারিদ্র নিপড়িত নারীদের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের ন্যায় কাজ করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে নারীরা ঋণ গ্রহণ করে কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগীর খামার ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। মাহরের অর্থ নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে সামান্যতম সহায়ক হলে পরিবারে এর প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। যৌতুক প্রথার নিষ্ঠুর দংশন থেকে নিম্নবিত্ত সমাজ পরিত্রাণ পাবে। সেই সাথে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হৃদতার সম্পর্কও গড়ে উঠবে।

স্বামী-স্ত্রীর হৃদ্যতা পরিপূর্ণ একটি সুখী পরিবার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ইসলাম মাহর আদায়কে স্বামীর ওপর বাধ্যতামূলক করেছে। মুসলিম সমাজের সকল স্তরে যথাযথভাবে 'মাহর' আদায় হলে পরিবার ও সমাজে এর প্রভাব হবে সুখকর। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ধর্মীয় নির্দেশনা পালন করে মাহর আদায় করবে সে কখনোই ঘৃণিত যৌতুক গ্রহণ সমর্থন করবে না। বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারে যথার্থ মাহর ধার্য এবং আদায় এ ধর্মের নারীদের মর্যাদাকে সমুন্নত করবে। সমাজের সকল স্তরের নারী-পুরুষের মাহর আদায় সম্পর্কে সচেতনতা সমাজ ও পরিবারের জন্য সুখ-শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনবে।

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

হাসান আজিজুল হকের গল্পে দারিদ্র্য, শোষণ ও প্রতিবাদ

চন্দন আনোয়ার*

Abstract : Hasan Azizul Huq is a realistic fiction writer. He has delineated, in a very objective manner, the reality of poverty and famine in Bangladesh in his stories. The fate of poor people has not changed much in independent Bangladesh, let alone during the Pakistan regime. Discrimination among different classes in the society has been on the increase for many reasons such as, unrest in power politics, lack of democracy and good governance, the rise of neo-capitalists in the capitalist social system etc. Laborers, farmers, indigenous people and people of other professions from the lower class are finding it more difficult to lead their lives. The economic order in the rural areas is breaking down. On the other hand, luxury and glamour are increasing in the cities. In 1974, a famine greatly shattered the sense of humanity. Those who escaped famine and poverty in the rural areas went to the cities for survival; but they experienced an abject reality of a new sort. The beneficiaries of famine purchased their physical body in exchange for money. This article discusses how with a faithful Marxist spirit, Hasan Azizul Huq has spoken against all discriminations in his stories.

ভূমিকা

ছোটগল্পের লেখক হিসেবে হাসান আজিজুল হকের আবির্ভাব বিশ শতকের ষাটের দশকে। লেখালেখির শুরচ থেকেই তিনি শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধনের আকাঙ্ক্ষা লালন করে আসছেন। পুঁজিবাদী বিশ্বে সিংহভাগ মানুষের উৎপাদন, শ্রম, সম্পদ, সুখ কুক্ষিগত হয় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে। শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিশোষণ যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে শ্রেণিবিরোধ। এই বিরোধে শোষিতের শক্তি জাগরণের বিকল্প নেই বলে করেন হাসান আজিজুল হক। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত, অধিকারবঞ্চিত, পশ্চাৎপদ ও রাষ্ট্রের রাজনীতির মারপ্যাঁচের ফাঁদে পড়া অথবা অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য নিয়তির শিকার মানুষেরা তাঁর গল্পের চরিত্র। তবে, তাঁর চরিত্ররা ফাঁদে আটকে থাকতে বা পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে কখনো সমষ্টিগতভাবে, কখনো ব্যক্তি একাই কঠিন প্রত্যয় ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়ায়।

---

* ড. চন্দন আনোয়ার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

এই সংগ্রামে প্রতিপক্ষ কুশীলবদের অপশক্তির ভিত্ নড়ে ওঠে এবং নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পড়ে।

বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তের বেঁচে থাকার লড়াই

মানুষের বাস্তব ও ব্যবহারিক মুক্তির জন্য পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা উচ্ছেদের বিকল্প নেই, এই ধারণা নিয়ে হাসান আজিজুল হক প্রথম গল্প 'শকুন' (১৯৬০) লেখেন। পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রতীক শকুনটিকে নৃশংসভাবে হত্যার ভেতর দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে পুঁজিবাদী সমাজবিরোধী সংগ্রামে সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেন। এই গল্পে ফুটে ওঠে শ্রেণিবৈষম্য ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সামষ্টিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতীকায়িত রূপ। সন্ধ্যার আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণে বিধ্বস্ত ও চলৎশক্তিরহিত বৃহৎ আকৃতির বয়সী শকুনকে ঘিরে একদল গ্রাম্য ছেলে খেলায় মেতে ওঠে।[১] এই খেলা শুধু খেলা থাকে না, যখন ওরা শকুনটিকে পল্লীসমাজের শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি মোল্লা, মোড়ল, সুদখোর মহাজনের সাথে তুলনা করে। ছেলেরাও আর শুধু ছেলেমানুষ থাকে না। শ্রেণিশোষণের শিকার বিপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্দশা ও দ্রোহ যুগপৎভাবে উঠে আসে ওদের পারস্পরিক কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপে। তারা ভয়ানক প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। শকুনকে উদ্দেশ্য করে বলে, "তোকে দেখে লোব—তুই তো শিকুনি, তোর গায়ে গন্ধ, তু ভাগাড়ে মরা গরচ খাস, কুকুরের সাথে ছেঁড়াছেঁড়ি করিস—তোকে দেখে রাগ লাগে ক্যানে?"[২]

শকুন সমাজ শোষকের প্রতীক। প্রতীকার্থে, মৃত্যুপরাকীর্ণ বিধ্বস্ত সময় ও বন্ধ্যা বাংলাদেশের প্রতীক। শকুনের ধারালো নখ-ঠোঁটের আঁচড়ে মৃত বা জীবিত প্রাণীর মাংস ভক্ষণের বীভৎস দৃশ্যের মতো বীভৎসভাবে শোষণকর্ম চালায় সমাজশোষকেরা। ছেলেরা শকুনটাকে যেভাবে চিহ্নিত করে তাতে একদিকে যেমন শোষণের নির্মম বাস্তবতা ফুটে ওঠে, তেমনি জেগে ওঠে প্রতিশোধস্পৃহা। নিরন্তর তাড়া করে ধরে একটার পর একটা পালক ছিঁড়ে শকুনটির মৃত্যু নিশ্চিত করে ছেলেরা যখন ঘরে ফেরে তখন তারা আগামীকালের কথা ভাবে অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা ভাবে। গ্রামে প্রবেশমুখে ন্যাড়া বেলগাছের আবছায় তারা আবিষ্কার করে কদু শেখের বিধবা বোন ও সমাজশোষক জমিরদ্দির অনৈতিক সম্পর্ক। সকালে গ্রামের মানুষজন আবিষ্কার করে মৃত শকুন ও

---

[১] কায়েস আহমদের সাথে আলাপচারিতায় লেখক বলেন, 'আমার শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে, ঠিক যেমনটা দেখেছিলাম, হুবহু সেই রকম করেই লিখেছি, গল্পের শুরুতে যেমন এক সন্ধ্যায় কতগুলো ছেলের বসে থাকার বর্ণনা আছে, অমনি করে আমরা বসেছিলাম, অমনি করেই একটা শকুন এসে পড়ে গিয়েছিল আর আমরা হৈ হৈ করে তার পিছনে মাঠের ওপর দিয়ে, গ্রামের গলিঘুঁজি দিয়ে অমনি করেই তাড়া করে ছুটেছিলাম এবং গল্পের শেষাংশ যা আছে—ওই রকম ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল।' কায়েস আহমেদ, "সাক্ষাৎকার", *উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা*, হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত (ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ৬২।

[২] হাসান আজিজুল হক, "শকুন", *সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য* (ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী পূর্ব পাকিস্তান শাখা, বর্ধমান হাউস, ১৩৭১)। পৃ. ৭। এই গ্রন্থের গল্পসংখ্যা ১০ টি : 'শকুন', 'তৃষ্ণা', 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', 'উত্তর বসন্তে', 'বিমর্ষ রাত্রি, প্রথম প্রহর', 'মন তার শঙ্খিনী', 'সীমানা', 'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী', 'আবর্তের সম্মুখে' এবং 'গুনিন'। অতঃপর আলোচনায় গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত।

অর্ধস্ফুট একটি মানব শিশু। যেহেতু শকুন শকুনের মাংস খায় না, তাই মানব শিশুর লোভে অসংখ্য উন্মত্ত শকুন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে। গ্রামের মানুষদের না জানার ভণিতা ও অসংখ্য উন্মত্ত শকুনের ছুটে আসার দৃশ্য সমাজশোষকের শক্তিমত্তার প্রতীক।

সামাজিক অবক্ষয়, গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনৈতিক জীবনাচরণ, বিশ শতকের মধ্যাংশের পরে পাকিস্তানি শাসনামলের বিশৃঙ্খল বাস্তবতায় অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিবিরোধের প্রতিফলন ঘটে গল্পের বিষয়-বিন্যাসে। এই বিরোধ থেকে মুক্তির জন্য শোষিতের সংঘবদ্ধ ও স্বোপার্জিত শক্তির বিকল্প নেই। শকুনটিকে হত্যার ঘটনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

> 'হাসান তাঁর প্রথম গল্প শকুনের মধ্য দিয়ে যেন সমকালীন সমাজ জীবনের ভূমিকা বা মুখবন্ধ রচনা করেছেন—এ গল্প পড়লেই বোঝা যায় হাসান তৎকালীন পাকিস্তানের অবক্ষয়-পীড়িত সমাজের কথক হিসেবে অবতীর্ণ হতে চাচ্ছেন। চারপাশের জীবনের পরিকীর্ণতা-বিষণ্নতা, রুগ্নতা, হতাশা-বঞ্চনা এক সঙ্গে সাধারণ মানুষকে গেঁথে ফেলে কিভাবে দারুণ অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে এক অন্ধকার থেকে আর এক নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে নিক্ষিপ্ত করছে, হাসান খুব কাছের থেকে গল্পের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।'[৩]

হাসান আজিজুল হকের *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* গ্রন্থের 'আমৃত্যু আজীবন' গল্পের বিস্তৃত পটভূমিতে প্রকৃতি রাজ্যে মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, আর শ্রেণিশোষিত সমাজে নিম্নশ্রেণির মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইকে একসূত্রে গেঁথেছেন। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক বর্গাচাষী পরিবার, একটি গোখরা সাপ ও একটি পুরনো বিল নিয়ে গল্পের কাহিনি। কিন্তু এই কাহিনি স্থান-কাল-সময় উত্তীর্ণ ও শিল্পোত্তীর্ণ একটি কাহিনি এবং এর কুশীলব পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে এই মুহূর্তে জন্ম নেওয়া মানুষটিও। অর্থাৎ পাঠককে মানবসভ্যতার বিবর্তনের একটি মৌল সত্যের মুখোমুখি উপস্থিত করেন লেখক। অমোঘ ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির নিয়তির কাছে মানুষ অসহায় কিন্তু পরাজয় মেনে নিতে মানুষের জন্ম হয়নি, মানুষ পরাজয় মেনে নেয় না, সর্বস্বান্ত হয়েও আমৃত্যু আজীবন লড়াই করে, একজন পরাজিত হলে সেখান থেকে শুরু করে আর একজন। প্রকৃতি রাজ্যের এই নির্বিকার নিষ্ঠুর লড়াই আদিকালের। এই গল্পটি সম্পর্কে সনৎকুমার সাহার মন্তব্য :

> আমার তো মনে হয়, 'আমৃত্যু আজীবন' শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেই এক অমূল্য সম্পদ। গল্পে পাই মহাকাব্যিক বিস্তার। মৃত্তিকা সংলগ্ন শুদ্ধ মানুষের অন্তহীন জয় পরাজয়ে ফুটে উঠে মানব ভাগ্যেরই অসহায় সত্য পরিণাম। ভাব কল্পনাকে ভাষা অনুসরণ করে। তার সরল অনাবিল ঐশ্বর্যে আমরা বিমোহিত হই।[৪]

প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত প্রাণীটির উপস্থিতি করমালির জীবনসংগ্রামের শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে। বেঁচে থাকার লড়ায়ে টিকে থাকার অংশ হিসেবে করমালি পরিত্যক্ত জমির জঙ্গল সাফ করে চাষাবাদ করতে মরিয়া, প্রতিপক্ষ সাপটিও মরিয়া হয়ে প্রতিহত করে তাকে উচ্ছেদের চেষ্টাকে। শত্রুকে পরাস্ত করার কৌশল হিসেবে সাপটি ছোবল মারে

---

[৩] আবু জাফর, *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৩০।

[৪] সনৎকুমার সাহা, *এই বাঙলায়* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১৭৮।

করমালির একমাত্র অবলম্বন দুটি গরুর একটিকে। এতে করমালি বিনা চেষ্টায় বা বিনা প্রতিরোধেই পরাজিত হয়। স্ত্রী ও সন্তান বলদের পরিপূরক হওয়ার প্রস্তাব করলে পরাজয় আরো মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। স্ত্রী বলে, "আমারে দিয়ে হয় না? কও। আমি তো দেহিছি দামড়া না থাকলে দুধের গাই দিয়ে আবাদ করিছো জমি। এ্যাহন আমারে দিয়া পারবা না? রহমালিকে পেটে ধরিছি—তোমার সংসার টানতিছি এতদিন। আমি পারবানে—দেহো তুমি।"[৫]

সাপটি ভয়ঙ্কর শোষক ও অমোঘ শক্তির প্রতীক। তার পরাজয় নেই। মানুষের সংগ্রামের সাথে সে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জুড়ে আছে। এই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া, পরাজিত হওয়া, ফের নতুন কৌশল ও শক্তি নিয়ে লড়াই অব্যাহত রাখা—এই নিয়তিতেই আটকে আছে মানুষ। এই নিয়তি মানুষের জীবনপ্রবাহে নিঃশব্দে নিরন্তর বহমান। এ কখনো দৃশ্যমান, আবার কখনো অদৃশ্যমান। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী এর রূপ ও প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন। কখনো সাপ, কখনো জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, প্লাবন, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিচিত্র রূপ নিয়ে গ্রাস করে বা পরাস্ত করে মানুষের সংগ্রাম, আর্তি ও স্বপ্নকে।

সংগ্রামী মানুষ চিরকাল এই নিয়তিকে মোকাবেলা করে আসছে। জীবনের প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয় অপরাজেয় মহিমা ও বেঁচে থাকার অনিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে। তাই, করমালি বেঁচে থাকার লড়ায়ে হারতে চায় না। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় এক রহস্যের জালে আটকা সে। সাপটি সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রতীক। এই রহস্যের কাছে করমালির ব্যর্থতা, পরাজয়, মৃত্যু অত্যন্ত তুচ্ছ বা মূল্যহীন। করমালির অবচেতন মনে ভয়ানক এক নারকীয় দৃশ্য ভেসে ওঠে—গোখরা সাপটির হা মুখে অন্ধকার অতল গহ্বর সৃষ্ট হয়েছে—সেই গহ্বরে একে একে প্রবেশ করছে সে নিজে, তার মা, স্ত্রী, ছেলে রহমালি, ভিটেবাড়ি, গ্রাম সব কিছুই।

লেখক করমালির টিকে থাকার লড়াইকে চরম নির্লিপ্ত ও নির্বিকারভাবে বর্ণনা করেন। গল্পের শেষে পিতা করমালির লড়ায়ের ভার উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলে রহমালির হাতে তুলে দেন। অর্থাৎ এই লড়াই আদিঅন্তহীন। এই লড়াই থেমে নেই, এই লড়ায়ের শেষও নেই, আছে শুধু এক জীবন থেকে আরেক জীবনে বয়ে চলার ব্যাপার।[৬] যে দুর্জ্ঞেয় শক্তির

---

[৫] হাসান আজিজুল হক, "আমৃত্যু আজীবন", *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৯৯৮), পৃ. ৮৪। এই গ্রন্থের গল্পসংখ্যা ৮টি : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী', 'সারাদুপুর', 'অন্তর্গত নিষাদ', 'মারী', উটপাখি', 'সুখের সন্ধানে' এবং 'আমৃত্যু আজীবন'। অতঃপর আলোচনায় গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত।

[৬] এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত : সেখানে (আমৃত্যু আজীবন) একজন ভাগচাষীর কথা এসেছে, বাংলাদেশের কোটি-কোটি নিরন্ন ভূমিহীন গ্রামের সাধারণ প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি সে। তার মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু সেখানে গল্পটা শেষ না করে আমি আরো একটা বাক্য যোগ করেছি। তার পুত্র আসছে এবং বর্ষণের মধ্যে তার বাবার দেহটাকে তুলে নিয়ে সবল পায়ে বাড়ির দিকে ফিরছে। জীবনটা শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। এক জীবন থেকে প্রবাহিত হচ্ছে আরেক জীবনে। এখানে থামার কোন বিষয় নেই। ঠিক যেন রিলে রেসের মতো। ঠিক যেন একটা প্রদীপ থেকে আরেকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়া। পৃথিবীটাকে আমি এভাবেই দেখার চেষ্টা করি। সব জায়গায় মূলকথা একটাই—লড়াই

বিরুদ্ধে পরাস্ত বাবা, সেই শক্তির বিরুদ্ধে ছেলেকেও লড়ায়ে নামতে হবে। মিখায়েল বাখতিন বলেন, "প্রতিটি তাৎপর্যই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। এই সংঘর্ষে ব্যক্তি কখনো কখনো সামাজিক ইতিহাসের প্রতিপক্ষ। আধিপত্যবর্গের ভাবাদর্শ যখন ব্যক্তিসত্তাকে বিড়ম্বিত করে, এই সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে ব্যবহারিক ও নান্দনিক ক্ষেত্রে।"[৭]

জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' গল্পে নিয়তির যে নিষ্ঠুর ও আকস্মিক ভূমিকা হাসান আজিজুল হকের গল্পের করমালির জীবনেও তাই ঘটে। তিনি পরাবাস্তব চৈতন্যকে ব্যবহার করে করমালির নিয়তির অনিবার্যতা ও নির্দেশ্য ভবিতব্যকে স্পষ্ট করেন, যা জগদীশ গুপ্তের গল্পের বিষয় থেকে কিছুটা আলাদা।

এই গল্পটি লেখার সময় হাসান আজিজুল হক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। তিনি 'দি ওল্ডম্যান এন্ড দি সি' উপন্যাসে কিউবার ধীবর সান্টিয়াগোর লড়ায়ের মহত্ত্ব করমালির মধ্যে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন। তবে, সনৎকুমার সাহার মতে, 'দি ওল্ডম্যান এন্ড দি সি'-এর তুলনায় 'আমৃত্যু আজীবন' শ্রেয়। কারণ, সমুদ্রের হাঙরের সাথে সান্টিয়াগোর যে দ্বন্দ্ব তা মূলত তার নিজেরই সৃষ্টি। করমালির দ্বন্দ্ব তৈরি করতে হয় না। স্বাভাবিক দৈনন্দিন বাস্তবতার মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব, বৃত্ত ছাড়িয়ে আলাদা করে কোথাও যেতেও হয় না। তার অবহেলিত ও বঞ্চিত জীবনই ডেকে আনে সাপকে। এখানে সে একাও নয়। স্ত্রী-সন্তানের সাথে আছে তারই মতো অসংখ্য ক্ষেতমজুর, শ্রমিক, বর্গাচাষী।[৮]

জোতদারের দৌরাত্ম্য

গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় জোতদার-জমিদার অসীম ক্ষমতা অধিকারী বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। তারা গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের শ্রমকে নানাকৌশলে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিলোপের পরে এই জোতদারশ্রেণি সামন্তপ্রভুর ভূমিকায় চলে আসে। এরা দরিদ্র অসহায় মানুষের নিয়তি বা ভাগ্যবিধাতা। প্রতিবাদের ভাষা ও সামর্থ্যের অভাব, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে দরিদ্র মানুষেরা জোতদারের উপর নির্ভরশীল এবং জোতদারের শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয়ে ক্রীতদাসত্বের গ্লানিতে ভোগে। রাষ্ট্র প্রশাসন বা আইনি কাঠামো জোতদারের অনুকূলেই কাজ করে। এই জোতদারশ্রেণির দৌরাত্ম্য ও ক্ষমতার কাছে সরকার ও সরকারের আইন পর্যন্ত অকার্যকর।

করা ও জীবিত থাকা। শিবলি নোমান ও সৌভিক রেজা, সাক্ষাৎকার, *উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা*, পৃ. ২৪৪।

[৭] তপোধীর ভট্টাচার্য, *বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬), পৃ. ৫৬।

[৮] সনৎকুমার সাহা, "হাসান আজিজুল হক : ফিরে দেখা," *বিজ্ঞাপনপর্ব*, হাসান আজিজুল হক সংখ্যা (কলকাতা), শ্রাবণ ১৩৯৫, পৃ. ১০৭।

'চালচিত্রের খুঁটিনাটি' গ্রন্থের 'ভিতরে খানিকটা' গল্পের জোতদার আনোয়ারের বাড়িতে প্রজা নিপীড়নের জন্য দোনলা বন্দুক আছে। তবে তার সম্পত্তি রক্ষার্থে নয়, সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব পালন করে সরকার। তার দম্ভোক্তি, "আখমাড়াই কল যেমন আখের রসটুকু নিংড়ে ছিবড়েটা বের করে দেয়, ঠিক সেইভাবেই আমি ওদের শ্রম নিংড়ে নিচ্ছি।"[৯] এদের নিজের চৌহদ্দির মধ্যে স্বঘোষিত বা স্বনির্মিত আইন চলে। আর তার প্রমাণ মেলে 'মা-মেয়ের সংসার' গ্রন্থের 'মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত' গল্পের জোতদারের দম্ভোক্তি থেকে—"আইন বানাইয়া লইবে জোতদার। জোতদারের এলাকায় জোতদারের আইন, সরকার কি করিবে? আইন যাহা দরকার জোতদার তৈরি করিবে। দ্যাশ চালাইতে হইবে না, কি কহেন?"[১০]

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুরের এই জোতদারের অধীন ভূমিহীন কৃষক একামতউল্লাকে এক একর জমি বরাদ্দের সরকারি প্রচারণার সত্যতা যাচাই করতে যান ঠাণ্ডা মাথার সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন।[১১] জোতদারের ভুঁড়ির সাইজ দেখে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি নিশ্চিত হন, "বহু খালবিল জমাজমি পেটের মধ্যে ভাঙরানোর ক্ষমতা তার আছে, সে অজগরের মতো আমুণ্ড গোটাগুটি খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত।" (পৃ. ২৬) এছাড়া জোতদার কৌশলী, চতুর ও বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী। সরকারের বিরুদ্ধে লেখার জন্যে সাংবাদিকের সঙ্গে একপ্রকার ধমকের সুরে কথা বলে। তার নিজের শ্রেণি অবস্থান, ক্ষমতা, আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় করণীয় কর্ম একেবারে খোলাসা করে বলে এবং বলার মধ্যে কোনো প্রকার সংকোচ বা আড়ালের চেষ্টা নেই। অর্থাৎ সে তার নিজের অবস্থান ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

'ভাতুয়া' ও 'মাহিন্দা' দুটি আঞ্চলিক শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে শ্রমজীবী ভূমিহীন কৃষকের উপরে জোতদারের অকহতব্য নির্যাতনের ইতিহাস। জোতদারের কাছ থেকে পাঁচ শ টাকা ঋণ নিলে সেই ঋণের সুদ-আসল পরিশোধ করতে হয় শুধুমাত্র পেটের খাদ্যের বিনিময়ে কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে। গ্রহীতা সারাজীবনে পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার সন্তান, তার সন্তান ব্যর্থ হলে তার সন্তান—এভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় এই ঋণের ঘানি টানতে হয়। এদের বলা হয় 'ভাতুয়া'। আবার, যারা ভাত-মাইনা পায় কিন্তু জোতদারের

---

[৯] হাসান আজিজুল হক "ভিতরে খানিকটা", *চালচিত্রের খুঁটিনাটি* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ৮৯।

[১০] হাসান আজিজুল হক, *মা-মেয়ের সংসার* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ২৬। এই গ্রন্থের গল্পসংখ্যা ৭টি : 'সম্মেলন', 'মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে', 'মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত', 'বিলি ব্যবস্থা', 'ঘের', 'জননী এবং 'মা-মেয়ের সংসার'। অতঃপর আলোচনায় গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত।

[১১] উল্লেখ্য, গল্পের সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন (১৯৪৫-১৯৯৫) বাস্তব চরিত্র। তাঁর জন্ম ও পৈতৃক নিবাস রংপুর। উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার সাংবাদিকতা তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। গ্রামীণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। 'দৈনিক সংবাদে'র সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে সত্যনিষ্ঠ ও জীবনভিত্তিক প্রতিবেদন ও রিপোর্টের জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। সাংবাদিকতায় অবদান রাখার জন্য তিনি জহুর হোসেন চৌধুরী স্বর্ণপদক (১৯৮১), ফিলিপস পুরস্কার (১৯৮৭), ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স পুরস্কার, বগুড়া লেখক চক্রের পুরস্কার প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন।

স্থায়ীভাবে বাঁধা শ্রমিক, তাদেরকে বলা হয় 'মাহিন্দা'। বাস্তবে মাহিন্দারা ভাতুয়ার মতোই।

সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন চেয়ারম্যান, জোতদার, তহশিলদার সবাইকে ভালোভাবে জেনে, শুনে, জমির দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এসেছেন। তিনি একামতউল্লার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, "জমিনটা আপনের, আপনে জানেন না বাহে, এই জমিন আপনে পাইছেন, জোতদার আপনেরে কয় নাই। কোনোদিন কহিবে না, আপনে ভাতুয়া থাকিয়া যাইবেন। জমিন আপনের দখলে নিয়া ন্যান বাহে।" (পৃ. ২৮) মন্ত্র ধরেছে বুঝে মোনাজাতউদ্দিন আর এখানে থাকার প্রয়োজন মনে করেননি। এরপর তিনি বিশাল ক্যামেরা ও ভারি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে অন্য কোনো অনিয়ম বা অবিচারের বিরুদ্ধে এভাবেই মন্ত্র দেবার কাজে বেরিয়ে পড়েন। আর সেদিনই একামতউল্লা জমির মালিকানা দাবি করে জোতদারের কাছে। একামতউল্লার কঠিন জেদ, নৈতিক মনোবল ও একের পর এক চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয় জোতদার।

> জমিটা হামারে দ্যান মালিক। আপনের তো অভাব নেই। অত খাইবেন না, প্যাটত্ জায়গা হইবে না।
>
> বার দশেক এই রকম আসা-যাওয়ায় জোতদার উত্ত্যক্ত আর কোণঠাসা।
>
> জমি লইয়া কি করিবেন বাহে তোমরা! গরচ-মহিষ নাই, সার-বীজ নাই। জমি তো পড়ি থাকিবে।
>
> জমিটা তাহলে হামার কহেন মালিক।
>
> তুমরা কি হামার নহে? তুমার বউ কি হামার নহে?
>
> হামার বউ হামার মালিক। (পৃ. ২৯)

শ্রমজীবী শোষিত মানুষের ভিতরের সুপ্ত বা দমিত ক্রোধ বা অধিকারবোধকে একবার জাগিয়ে তুলতে পারলে ভয়ানক রূপ নিয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন এই কাজটিই করে গেলেন। একামতউল্লার এই বৈপ্লবিক ভূমিকা শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসে শোষিতের উত্থানের ইতিহাস। যে কারণে একামতউল্লা একা থাকেনি, যোগ হয় তাকিবুল, নছর, ফিরুর ক্ষোভ ও অধিকারের দাবি। যারা জোতদারের শোষণ নিঃশব্দে হজম করে যাওয়াকেই নিয়তি বলে বরণ করে আসছিল, তারাই এখন জোতদারের প্রবল প্রতিপক্ষ হতে পারে শুধুমাত্র একটি মন্ত্রদীক্ষার বলে। আসন্ন বিপ্লব প্রতিরোধে জোতদার কি পরিমাণ নির্বল ও অসহায় তার ভুঁড়িভোজের দৃষ্টান্তই প্রমাণ। জবাই করা মুরগির পেটের ডিম, পাকস্থলী, মুরগির মাথা, গলা, পোলাও, গরুর কষা মাংস, মাগুর মাছের কালিয়া, বোয়াল মাছের পেটি—এই রকম দামি খাদ্য গ্রহণ জোতদারের জমি উদরস্থ করার অখিল ক্ষুধার প্রতীক। কিন্তু খাদ্যগ্রহণের তীব্রতা ও অস্থিরতার মধ্যে স্পষ্ট হয় জোতদার তার আধিপত্য হরণের ভয়ে আতঙ্কিত এবং আশু বিচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। এই আতঙ্কের কারণেই বিপুল পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে। মলত্যাগের প্রস্তুতির মুহূর্তে একামতউল্লার উপস্থিতি ঘটে। একামতউল্লার মতো মাহিন্দার অধিকারের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র কিন্তু মলত্যাগের দায়মুক্তি তার চেয়েও বেশি জরুরি।

অসহ্য চাপে বেসামাল জোতদার পরনের লুঙি খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে যখন মলত্যাগে প্রস্তুত, ঠিক তখনি দেখা গেল মাটি ফুঁড়ে একামতউল্লার উপস্থিতি। এবার আর তার কিছুই করার নেই। একামতউল্লার সামনেই মলত্যাগের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে বসে প্রাণপাত চেষ্টা চালায়। কিন্তু শক্ত পিণ্ডটি মলদ্বারে আটকে গিয়ে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরমধ্যেই পুকুর পাড়ের জমি, পুকুর, মূল্যবান গাছপালা জরিপ করে। তৃতীয়বারের মতো মলত্যাগের প্রস্তুতির মুহূর্তে জামগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে তাকিবুল। মাত্র চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিমান তাকিবুলকে বহুদিন গাঁয়ে দেখেনি। এভাবে টানা দশদিন মলত্যাগে অপারগ জোতদারের পরিপাকতন্ত্র শিলাখণ্ডে পরিণত হয়। হস্তিকায় শরীর ক্রমশ স্ফীত হতে হতে পরিস্থিতির বাইরে চলে যায়, পঞ্চাশ বিঘা জমি ঢেকে ফেলতে পারে শরীর দিয়ে।

সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ আদিম। সম্পদ অর্জনের প্রক্রিয়াটি যদি শোষণমূলক ও জবরদস্তিমূলক হয় তাহলে সেই সম্পদই একদিন বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একইগ্রন্থের ''বিলি ব্যবস্থা'' গল্পের জোতদার ঠাণ্ডা মাথায় নিঃসংকোচে সম্পন্ন করে শ্রমশোষণের কাজ। আল্লার আইনের বা ধর্মগ্রন্থের উপরে ইমাম সাহেবের যেমন একাধিপত্য, তেমনি জোতদারের আধিপত্য আল্লার সম্পদের উপরে। আল্লার খাসজমি দেখভালের অজুহাতে জোতদার যেমন নিঃসংকোচে মাহিন্দা নেক বখশের শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগে উৎপাদিত শস্য নিজের খামারে তোলে, ঠিক সেই সূত্রেই জোতদারের ল্যাঙড়া, হাত নুলো প্রতিবন্ধী ছেলের লিপ্সার শিকার হয় নেক বখশের মূকবধির যুবতী বোন নেকী। নেকী পোয়াতি হয়। মালিকের কাছে প্রতিকার চাইতে গিয়ে বরং উল্টো মালিকের চটির আঘাতে রক্তাক্ত হতে হয় নেক বখশকেই। ছেলের অপকর্ম তো স্বীকার করেই নি, বরং নেকীর উপরে নেমে আসে ধর্মের দণ্ড।

যে খাসজমির শষ্যের হলুদগালিচায় ষোল বছরের নেকীকে ব্যবহার করেছিল জোতদারের ছেলে; যে খাসজমিতে নেক বখশ শস্য বুনেছিল সুদিনের স্বপ্নে, যে স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন করে শস্য তুলে নিয়েছিল মালিক তার খামারে, বিচারের রায়ে সেই খাসজমিতেই গর্ত খোঁড়া হয় নেকীকে পাথর ছোঁড়ার জন্যে। তিনজন বিবেকবান ছেলে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে ইমাম সাহেব নিজ হাতে কোদাল নিয়ে গর্ত খুঁড়ে। শালিকের বাচ্চার মাথা বিড়াল যে নৃশংসতার সাথে ছিঁড়ে নেয়, সেভাবে নেকীর মাথার চুলের মুষ্টি ধরে গর্তে ফেলে ইমাম সাহেব। তারপর উন্মাদের মতো চিৎকার করে, "পাথর তোলো, ইট তোলো, পাথর ছোঁড়ো, ইট ছোঁড়ো বাহে, মারো হারামজাদী খানকিকে—ইমাম সাহেব জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে।"(পৃ. ৩৮)

ইমাম-জোতদারের ভণ্ডামি ও পৈশাচিকতা এবং ধর্মের বিধানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে নেকী রচখে দাঁড়ায়। গর্তে ফেলার সময় ইমাম সাহেবের হাত কামড়ে ধরেছিলো। পাথর নিক্ষেপে মাথা ফেটে রক্ত বেরোয়, কিন্তু নেকী মাথা নোয়ায় না। রাতের অন্ধকার নেমে আসায় ইমাম সাহেব আতঙ্কিত। তিনি জানেন, লাল শোণিত শুকিয়ে কালো হয়ে গেলে অশুভ বা ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। কারণ ডাইনির রক্ত কালো। নেকীর রক্ত দ্রুত কালো হয়ে যায়। এতে ইমাম সাহেব ও তার ধর্মের বিধান কেঁপে ওঠে। দুই হাত ও মুখ আকাশমুখী

করে অবোধ্য ভাষায় পরপর তিনবার ভয়ানক চিৎকার করে ওঠে নেকী। এভাবেই অভিনব এক কৌশলে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ রচনা করে।

> কান পেতে শোনে নেক বখশ। একবার, দুবার, তিনবার। তারপর দারুণ আতঙ্কে সে চেঁচিয়ে ওঠে, কি কহিছে বাহে? কি কহে সে? কে কাঁন্দে? বোবা চিৎকার শোনা যায়। কে কাঁন্দে কহিস? পয়গম্বর নবীজী কাঁন্দে কহিছে আমার বুন। চোখের আঁসুতে সোনার দাড়ি ভিজাইয়া আমার পয়গম্বর নবীজী কাঁদে। জারে জার হইয়া কাঁদে। (পৃ. ৩৯)

ইমাম সাহেব ও প্রতিবাদী নেকী চরিত্র সৃষ্টিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের ভণ্ড পীর মজিদ ও জমিলার চরিত্র স্মরণে থাকতে পারে গল্পকারের। মাজারকে ঘিরে মজিদের ভণ্ডামি, অন্যায়-অবিচার অর্থাৎ মজিদের সামগ্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে জমিলার প্রতিবাদের নীরব ভাষাকেই মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এখানে হাসান আজিজুল হকের চরিত্রই মূক-বধির। নেকীর মুখে ভাষা নেই, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে জন্তুর মতো দুর্বোধ্য আওয়াজ করে ভয়ানক আক্রোশ প্রকাশ করে। নাটকীয় ভঙ্গিতে পিঠের চুল সামনে এনে আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়, যা জমিলার নীরব ভাষার চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো ধর্মের দণ্ডের বিরুদ্ধে নেকী ধর্মকেই ব্যবহার করে লড়েছে। নেকীর আক্রমণের কাছে মজিদের চেয়েও পাষণ্ড ধর্মান্ধ ইমাম সাহেব বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আল্লার আইনের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ করে অন্যায়ভাবে নেকীকে গর্তে ফেলে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এই আইন প্রযোজ্য ছিল জোতদারের ছেলের উপরে। ইমাম সাহেব নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে ধর্মের পবিত্র বিধানকে কলুষিত করেছে। এই অন্যায় দৃশ্য দেখে নবীজী সোনার দাড়ি ভিজিয়ে জারে জারে হয়ে কাঁদেন। শিল্পিত প্রতিবাদের এই এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

'মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত' ও 'বিলি ব্যবস্থা' গল্পে জোতদারের জমি দখলের যে কৌশল ও জবরদস্তি, একইগ্রন্থের 'ঘের' গল্পে সেই কৌশল ও জবরদস্তি আরো নৃশংস ও ভয়াবহ প্রকৃতির। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় অসংখ্য চিংড়ি চাষে ঘের তৈরি হয়। বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর আয়ের সুবাদে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি চাষ গুরুত্ববহ ও সম্ভাবনাময়। দেশের অর্থনীতির বিরাট আশীর্বাদ হিসেবে হয়ে উঠা চিংড়ি চাষের আদ্যন্ত দেখার কৌতূহল নিয়ে শিপসা নদীর পূর্বদিকে এক বিশাল ঘেরে উপস্থিত হন এক খ্যাতিমান লেখক। উপস্থিত হয়ে এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হন তিনি, যা তাকে বিস্মিত ও বিমূঢ় করে। সাদা সোনা বা ডলার বলে পরিচিতি পাওয়া চিংড়ি চাষের আড়ালে আছে ভিন্ন এক বাস্তবতা। অকথ্য নির্যাতন, লাম্পট্য, ত্রাস, দস্যুতা ও বলৎকারের এক আদিম জনপদের প্রতিচ্ছবি ঘেরাঞ্চল, যার কোনো চিত্রই লেখকের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় না। অধিকন্তু, ত্রাসবাহিনীর নেতা ছোটনের সরল উক্তি : "এই সব কিতেবাদী কাণ্ডের মধ্যে আপনারে কে আসতি কইছে, আপনার লাশ পড়লি আমারে যেন কেউ কিছু না কয়, এখানে আসলিই লাশ পড়তে পারে, লাশ ফেলতে হয়।" (পৃ. ৪১) অর্থাৎ ঘেরে খুনোখুনি স্বাভাবিক ও নিয়মিত একটি কাজ। ঘেরের মালিকের রাইফেল, কাটা রাইফেল, বন্দুক, হেঁসো, রাম দা, ককটেল প্রভৃতি অস্ত্রের অস্ত্রালয় এবং পেশাদার ডাকাত ও

অস্ত্রবাহিনী আছে। এই অস্ত্র ও অস্ত্রবাহিনী আবাদি জমি দখল, সংখ্যালঘুদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া, তাদের নারীদের নিরাপদে ধর্ষণ করা, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। মালিকদের বাণিজ্যের বলি বাস্তুহারা ও জীবিকাচ্যুত ছিন্নমূল মানুষেরা বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেখানেও তারা নিরাপদ নয়, ছোটনবাহিনী যখন ইচ্ছা নির্বিচারে হত্যা ও অবিচার চালায়। লেখকের মানবিক চোখ দিয়ে হাসান আজিজুল হক ঘেরাঞ্চলের ভেতর-বাহিরের মুখোশ উন্মোচন করেন।

নাগরিক বিবেক ও গ্রামীণ দারিদ্র্যের চালচিত্র

হাসান আজিজুল হক তাঁর *চালচিত্রের খুঁটিনাটি* গ্রন্থের 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি' ও 'শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে' গল্পধর্মী লেখায় আশির দশকের উত্তরাঞ্চলের গ্রামের যে চালচিত্র তুলে আনেন, সেখানে মানুষের যে অস্তিত্বের লড়াই, তা যেমন ভয়ানক তেমনি আতঙ্কের। পরজীবী ভদ্রলোকেরা, যারা জনগণকে উৎপাদন ও শ্রম বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়ে থাকেন, সেই উপদেশ যে কত বড়ো প্রহসন সেটি উত্তরাঞ্চলের খোলা বিবর্ণ প্রান্তরে গিয়ে পাঁচ মিনিট দাঁড়ালেই টের পাবেন। জোতদার-জমিদারের শোষণ নিপীড়ন তো আছেই, সাথে দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক নির্মমতা ও রোগে-শোকে মৃত্যুপরাকীর্ণ একটি জনপদ গ্রাম। স্রেফ পেটের ভাতের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যে ক্ষেতমজুর, সে পেট তার কখনো ভরে না। তবে, উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটে। ক্ষুধার কাছে সমস্ত জীবনের পরাজয়ের এই গ্লানি মৃত্যুর সময় সন্তানের কাছে হস্তান্তর করে যায়। এদের কাছে গণতন্ত্র, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আধুনিক জীবন, শিক্ষা, চিকিৎসা সবই অর্থহীন বিষয়। ওদের শ্রম, অস্থি-মজ্জা-পেশীসহ শরীর, শরীরের শীর্ণ পোশাক, ক্ষত-বিক্ষত চামড়া, ভাতের শানকিটির প্রতিই নজর দিয়েছে প্রত্যেক শাসক। দেহ-মনে সর্বস্বান্ত হতে হতে ওরা এখন মানুষ নয়, মানুষের ছায়া হয়ে বেঁচে আছে। উত্তরাঞ্চলের একজন ক্ষেতমজুরকে খুব কাছ থেকে দেখে 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি'-তে লেখক বর্ণনা করেন এভাবে:

> সে আমার সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শিরদাঁড়া বাঁকা, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, তাঁর গায়ের চামড়া কাঠকয়লার মতো কালো, তাঁর পাঁজর ধনুকের মতো বেঁকে উঠে ঠেলে তুলেছে তার বুক।...আমি সহজেই ধরে নিতে পারতাম একটা পুরনো বাসি মড়া আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা ভাবার কোন উপায় ছিলো না কারণ তাঁর চোখ দুটি জেগে ছিলো।[১২]

সাম্প্রতিক বাস্তবতার কাছাকাছি গেলে ছবির, সাহিত্যের বা শিল্পকলার সবুজ শ্যামল পরিচ্ছন্ন গ্রামের কথা রূপকথা বলে মনে হবে। *সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য* গ্রন্থের 'বিমর্ষ রাত্রি, প্রথম প্রহর' ও *সীমানা, রোদে যাবো* গ্রন্থের 'বাইরে', *আমরা অপেক্ষা করছি* গ্রন্থের 'হাওয়া নেই' এবং *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'অতিথি সৎকার' গল্পে লেখক

---

[১২] হাসান আজিজুল হক, *চালচিত্রের খুঁটিনাটি* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ১৫-১৬।

গ্রামের দারিদ্র্যের চালচিত্র তুলে ধরেন সম্পূর্ণ অভিনব একটি কৌশলে। পাঁচ গল্পের প্রধান চরিত্ররা শহরের অধিবাসী এবং নাগরিক সুখ-সুবিধাভোগী বিশেষ শ্রেণি।

দেশের নব্বইভাগ ভূখণ্ড ও মানুষের সম্পদের প্রধান অংশ নগরায়ণ ও মুষ্টিমেয় মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি জন্য ব্যবহৃত হয়। বিপরীতে, গ্রাম নিঃশেষ হতে হতে এখন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, রোগ-জরাজীর্ণতার একটি অন্ধকার জনপদ। শহরবাসীর অনেকের মধ্যেই গ্রামের প্রতি এক ধরনের মেকি আবেগ ও ভালোবাসা আছে। কিন্তু নগরগণ্ডির বাইরে পা ফেললেই বাস্তবতা চিহ্নিত হয়।

শহর-গ্রামের জনজীবন, জনপদ ও জীবন-বিন্যাসের পার্থক্যকে হাসান আজিজুল হক 'বিমর্ষ রাত্রি, প্রথম প্রহর' গল্পের বিষয় করেন। নিজের বোনের সাথে বিয়ে দেবার একটি স্বার্থসংকল্প নিয়ে শহরের বন্ধুকে গ্রামে নিয়ে যাবার পথে গ্রামের বন্ধুর মধ্যে যে বিরোধ-প্রতিবিরোধ, জিজ্ঞাসা, জিঘাংসা ও প্রতিশোধপরায়ণতার আগুন জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তা নিছকই ব্যক্তিস্বার্থ বা সামান্য বিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই বিরোধ শ্রেণিদ্বন্দ্বে রূপ নেয়। এর সাথে যোগ হয় স্বল্পবেতনের সরকারি চাকরির গ্লানি, বিধবা মা, ম্যাট্রিক পাশ বোন নিয়ে নিজের পরিবারের টানাপোড়ন। শহরের বন্ধুকে ফাঁদে ফেলে গ্রামের বন্ধু এক ধরনের প্রতিশোধের খেলায় মেতে ওঠে। শহরের বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলে, "তোমাকে নরকে নিয়ে যাচ্ছি জামান–নরকে, নরকে–আমি তোমাকে অতি যত্নের সঙ্গে, আদরের সঙ্গে নরকে নিয়ে যাব। নরকেও আমার যে দায় সে দায়, বন্ধু, তোমার ওপর দিতে চাই।" (পৃ.৭৬-৭৭)

এই বাস্তবতায়, গ্রামের বন্ধুর কাছে শহরের বন্ধু স্রেফ বন্ধু থাকে না, হয়ে যায় নাগরিক সুবিধাভোগী, অন্ধ সুখভোগী, লোভী ও শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। এক অকল্পিত অস্থিরতা ও বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে জামান এই সত্য উপলব্ধি করে যে, গ্রামের মেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা তার একটি বিলাসী কল্পনা। বাস্তবতা তার বিপরীত।

গ্রামীণ জীবন ও জনপদকে ঘিরে শহুরে কল্পনার বৈপরীত্যকে দেখাতে দুটি জনপদ, জনজীবন, পরিবেশ-প্রতিবেশের দুজন প্রতিনিধিকে পাশাপাশি স্থাপন করেন লেখক। গল্পের কথক গ্রামের বন্ধু হওয়ায় শহরের বন্ধুর মনোবিশ্লেষণ সম্ভব ছিল না। তারপরেও জামানের ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি, গ্রামে প্রবেশমুখে অন্ধকারকে ভয়, আকস্মিকভাবে কৃষি বিভাগের চাকুরে বন্ধু মুফতির সাক্ষাৎ এবং তার গাড়িতে লাফিয়ে উঠে আত্মরক্ষা—এসবের ভেতর দিয়ে শহরের মানুষদের কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা ও ক্লীবত্বকে চিহ্নিত করা যায়।

মধ্যবিত্তের সংকট, অস্থিরতা ও কল্পনাবিলাসিতার ফাঁক-ফাঁকি ও অসাড়তা 'সীমানা' গল্পের বিষয়। গ্রামের পরিবেশ ও জীবনচিত্র দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মধ্যবিত্ত যুবক রাহুল বিনা প্রস্তুতিতে একাই বেরিয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন কোনো এক গ্রামে। অজ্ঞাত এক স্টেশনে নেমে গ্রামে প্রবেশের মুহূর্তে আকস্মিক জ্বরে আক্রান্ত হবার সুবাদে স্টেশন মাস্টার ও তার যুবতী বোন ইভার সঙ্গে মৃদু প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিকারের সূত্রে

জনশূন্য বিস্তৃত বিলের একটা উঁচু খালের পাদদেশে পরস্পরকে কাছে টানার দুর্লভ সুযোগ তৈরি হয়। প্রবল বাসনাও ছিল দুজনের। কিন্তু কেউ-ই নাগরিক কৃত্রিমতার সীমানা অতিক্রম করতে পারে না। কারণ, "শহরের ভিড় এসেছে, খোলস এসেছে। নানাজনের আনাগোনা সেখানে। মুখোশ ফেলে আসতে পারেনি। সে ধাওয়া করেছে এখানে। সেখানকার জীবনে সড়ক নেই—আছে শুধু কানাগলি।" (পৃ. ১০৯) মধ্যবিত্ত মানসিকতার এই শহরের যুবক-যুবতী নিজেদের সঙ্কোচ, দ্বিধা, ভীরচতা ও পলায়ণপর মানসিকতার কারণে পারস্পরিক সান্নিধ্য ঘটার অবারিত সুযোগও কাজে লাগাতে পারে না। অথচ, অদূরেই সাঁওতাল যুবতী নিশ্চিন্তে ও নিঃসংকোচে সাঁওতাল যুবকের বুকে মাথা ফেলে সমর্পিতা। বস্তুত, নগর জীবনের আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কেউ কারো দায়িত্ব নিতে চায় না। ফলে, গ্রামের অবারিত প্রকৃতি ও মানুষের বিরাটত্ব ও মহত্ত্বকে তারা ছুঁতে পারে না। আলো জ্বালানোর মতো উদ্দীপনা তাদের মধ্যে নেই।

হাসান আজিজুল হকের *রোদে যাবো* গল্পগ্রন্থের 'বাইরে' গল্পটি ১৯৬৮ সালে লেখা অর্থাৎ পাকিস্তান শাসনামলের শেষার্ধে লেখা। পাকিস্তানি শাসনের প্রয়োজনেই বা সমাজের সহজাত বিকাশের কারণেই হোক, শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল; যারা সরকারি চাকরি অথবা ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। একটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন গড়ে নিয়েছিল। বিপরীতে, গ্রামবাংলার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রাম ছিল পাকিস্তান শোষণের প্রধান ক্ষেত্র। পাট, খাদ্যশস্য সবই পশ্চিম পাকিস্তানে বা শহরের কিছু সুবিধাভোগী মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। এই সুবিধাভোগীদের কয়েকজন নাগরিক সুখ-প্রাচুর্যের একঘেঁয়েমী থেকে সাময়িক মুক্তির জন্যে ক্যামেরা, রাইফেল, জলখাবার ইত্যাদি নিয়ে আনন্দ ভ্রমণে আসে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি। কবিগুরুর প্রতি তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা বা কৌতূহল নেই, উদ্দেশ্য স্রেফ আনন্দ-উপভোগ।

প্রবল খাদ্যাভাব ও ক্ষুধার প্রকোপে ভুখা মানুষের আত্মহত্যার ঘটনা গ্রামবাংলার ভয়ানক পরিস্থিতিকেই চিহ্নিত করে। কুঠিবাড়ির অনতিদূরে বকুলতলা গ্রামে বনভোজন আমেজে দুপুরের খাদ্যগ্রহণের সময় ভুখা মানুষেরা মিছিল করে আসে, ঘেরাও করে দাঁড়ায় আহারভোজীদের। কোনো বাধাই তাদেরকে পিছু হঠাতে পারে না। খাদ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাসকারী এইসব নাগরিক অভিজাত মানুষদের কাছে কালোক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত হাড়হাড্ডিসার ভূতের মতো চেহারার মানুষদের খাদ্যের দাবি শুধু উৎপাতই নয়, ঘৃণ্য ব্যাপার। একজন বমি করে সেই ঘৃণা প্রকাশ করে। একমাত্র কথক তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কুঠিবাড়ির যেই জায়গায় বসে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য বর্ণময় স্বপ্ন জন্ম দিতেন, সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আর একবার দেখেন বকুলতলা গ্রামকে, নিকটবর্তী পদ্মাকে। যে স্রোতস্বিনী পদ্মা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিজড়িত, অমর সৃষ্টির প্রেরণা, সেই পদ্মায় এখন বিস্তৃত মরচভূমি, ধূধূ বালুচর, শূন্যতার হাহাকার। এখানে দাঁড়িয়ে তিনি শোনেন, বকুলতলার ক্ষুধার্ত মানুষের চিৎকার, দেখেন, দশ এগারো বছরের ক্ষুধার্ত মেয়ে এক বুড়ির চুল ধরে টানছে আর চেঁচাচ্ছে। মানুষের মংসের লোভ নিয়ে পাশেই অপেক্ষা করছে কয়েকটা কুকুর। এসবের

মধ্যেই দেখা যায়, রাষ্ট্রের পুলিশ গ্রামে ঢুকছে। বোঝা যায়, খাদ্যের দায়িত্ব নিতে না পারলেও রাষ্ট্রের হুকুম চলে এই গ্রামে কঠোরভাবেই।

গ্রামীণ জনপদে ফি বছর খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ চলে। প্রবল খাদ্যাভাবে ক্ষুধার প্রকোপে টিকতে না পেরে ভুখা মানুষেরা নিয়মিত আত্মহত্যা করে। এ খবর জানে না বলেই শহরের অভিজাত মানুষেরা এভাবে আনন্দ ভ্রমণে আসতে পারে। খুব সাদামাটা দৈনন্দিন ঘটমান একটি বিষয়কে উপজীব্য করে হাসান আজিজুল হক পাকিস্তানি আমলের গ্রামবাংলার বাস্তব পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করেন ভদ্রমানুষদের সামনে। এই পরিস্থিতিকে আরো ট্রাজিক পরিণতি দিয়েছেন 'অতিথি সৎকার' গল্পটিতে। গল্পটি শেষ গল্পগ্রন্থ 'বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প'-এর অন্তর্ভুক্ত হলেও বিষয়-বিন্যাস পাকিস্তানি আমলের দুর্দশাপীড়িত গ্রামীণ জীবনব্যবস্থা।

বামপন্থি এক নেতা তার তিনবন্ধুকে নিয়ে সম্পূর্ণ বিনা নোটিশে ভরদুপুরে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় বোনজামাইয়ের বাড়িতে। গৃহস্বামীটি তাৎক্ষণিক আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে নিজেদের খাদ্য দিয়ে। প্রত্যেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে গভীর মনোযোগের সাথে খাদ্যগ্রহণ করে। যে ধনী বন্ধুটি চিরকাল খাবারে অরুচি, হুইস্কি-টুইস্কিতে সামান্য রুচি, সেও খাদ্য গ্রহণ করে গোগ্রাসে। পেটের শান্তি ফেরার পরে বাংলাদেশের দারিদ্র্য, বৈষম্য ও আসন্ন বিপ্লব নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব করে ধনী বন্ধুটি। কিন্তু এই আলোচনা রূপান্তরিত হয় গৃহকর্তার কাণ্ডজ্ঞান ও আতিথেয়তার দীনতার দিকে, "ডাল ভাত বলে বটে, তার মানে এই? তাহলে ঐ গোবরের মতো পুঁইশাকটা আনার দরকার কি ছিল? গেরস্থবাড়ি তো বটে, কিছুই আর জুটল না?"[১৩]

স্বার্থপর, কপট, সুবিধাভোগী নাগরিক এই মানুষগুলোকে গ্রামে টেনে এনে লেখক এভাবেই চরিত্র হননের চেষ্টায় লিপ্ত হন। সমস্ত গ্রামের মানুষ মিলে হৈ-হুল্লোড় করে পুকুর চষে মাছ ধরে, দুটি ছাগল জবাই করে গভীর রাত পর্যন্ত রান্না শেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন অতিথিদের সামনে যে জৌলুসপূর্ণ খাদ্য পরিবেশন করে তা এক ধরনের সৎকারেরই নামান্তর। পোলাও, খাসির কোর্মা, মুরগির রান, মাছের কালিয়া প্রত্যেকটি খাবারই শাসনের ভঙ্গিতে তাকায় অতিথিদের দিকে। বাইরের আভিজাত্য, সমৃদ্ধি ও জৌলুসের আড়ালে চরম অকৃতজ্ঞ, ভণ্ড ও স্বার্থপর একটি চরিত্রকে ধারণকারী এই বিশেষ শ্রেণির বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও বিপ্লবের কথা বলার অধিকার নেই। কারণ, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর নব্বই শতাংশ মানুষের জীবনপ্রবাহ ও বাস্তবতার সাথে তাদের কোনো প্রকার সংযোগ নেই। তাদের বিপ্লবের সংজ্ঞা দাঁড়ায় ভণ্ডামি ও স্বার্থ হাসিলের কৌশল।

---

[১৩] হাসান আজিজুল হক, *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* (ঢাকা : সময়, ২০০৭), পৃ. ৪৭। এই গ্রন্থের গল্প সংখ্যা ৭টি : 'দূরবীনের নিকট-দূর', 'ফুলি, বাঘ ও শিয়াল', 'দুন্দভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে', 'একটি নির্জল কথা', 'অতিথি সৎকার', 'ভূতের ভবিষ্যৎ' এবং 'বিধবাদের কথা'। অতঃপর আলোচনায় গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত।

স্বাধীনতার পরে দেশ ক্রমশ বেকার সমস্যার জঠরে ঘুরপাক খেতে থাকে। কর্মহীন শিক্ষিত তরুণসমাজ অনেকটা অনিচ্ছাতেই জড়িয়ে পড়ে নানারকম অন্যায় ও অনৈতিক কাজে। সামরিক সরকারের চোখ রাঙানির মধ্যেও প্রকৃত দেশপ্রেমী বিপ্লবী মানসিকতার কিছু তরুণ স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার সৎচিন্তা নিয়ে বামঘরানার রাজনীতিতে নাম লেখিয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্বের কোন্দল, অদূরদর্শিতা, ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রতি গোপন লোভ, আত্মস্বার্থপরায়ণতা, সর্বোপরি তরঙ্গসমাজকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবার অভাবে ব্যর্থ হয় বাম রাজনৈতিক আন্দোলন। এই ব্যর্থতার কারণেও তরুণ প্রজন্মের ভিতরে হতাশা ও ক্ষোভ জন্মে। নাগরিক সংকীর্ণতা, আত্মস্বার্থপরায়ণতা, গ্রামজীবন বিচ্ছিন্ন বুর্জোয়া রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ও সুবিধাবাদী শ্রেণির হঠকারিতা, তরুণ প্রজন্মের হতাশা ইত্যাদি *আমরা অপেক্ষা করছি* গ্রন্থের 'হাওয়া নেই' গল্পের বিষয়।

জনগণের জন্য রাজনীতি, কিন্তু রাজনীতি বা রাষ্ট্রের কোনো পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্তি নেই, জনগণের স্বার্থ নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূলবাণী নেতাদের ঠোঁটে সর্বদাই খই হয়ে ফুটে—"শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মনে করবে তুমি জনগণের পক্ষে, তারপর জনগণের কাছে যাও। জনগণ তোমার শিক্ষক, বন্দুকের নল নয়, জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।"[১৪] নেতাদের এই হিপোক্রেসি (ভণ্ডামি), জনসেবার নামে প্রতারণা, জনবিচ্ছিন্নতার ফাঁকি ধরা পড়ায় ভীষণ হতাশ তরঙ্গ বিকাশ রাজনীতি ত্যাগ করে। বর্তমান বাস্তবতায় সেই হাতাশা আরো বেড়েছে। রুচশীল শিক্ষিত বিবেকবান, সুস্থচিন্তার, দেশপ্রেমী কোনো যুবক আর রাজনীতিতে জড়াতে চায় না। প্রবল রকমের অনিহা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে রাজনীতিকে। সন্ত্রাসী, অস্ত্রবাজ, ক্ষমতালোলুপ বেনিয়াশ্রেণির হাতে জিম্মি এখন রাজনীতি। তারা জনগণের সাথে মৌসুমি সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে, সেই সম্পর্ক আবার চাতুর্যপূর্ণ, প্রতারণামূলক ও শোষণমূলক। সংসদমুখি ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতরা শেয়ালের শিকার ধরার মতো ওৎ পেতে থাকেন নির্বাচনের অপেক্ষায়। তারা তখন প্রতিশ্রুতি ও ভালবাসার বিশাল ডালা সাজিয়ে নিয়ে আসেন। জনগণের সামনে নিজেকে পরম বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করে। আড়ালের আরূঢ় ভণ্ডামি, শঠতা, প্রতারণা জনগণের কাছে অবিদিত থাকে না। কিন্তু তারা নিরুপায়। বিকাশ ও লেখক কামাল প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সেই প্রতারকশ্রেণির অংশ বা সুবিধাভোগী। তাদের খাদ্য, নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অট্টালিকা, শরীরের কোলেস্টরল, হাইপ্রেসার সবই গ্রামের মানুষদের সম্পদে ও শ্রমে। গ্রামের জনপদ ও জীবনে নেমে আসা অবর্ণনীয় মানবিক বিপর্যয়ের জন্য তারা দায়ী, শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের বর্বরতার ক্ষমাহীন অপরাধের সাথে তারাও জড়িত। যে কারণে, গ্রামের দরজা তাদের জন্য বন্ধ। তাই সন্ধ্যায় গ্রামের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত লেখক, কারণ প্রবেশের পরে যে উৎকট বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াবেন, সেই বাস্তবতাকে ধারণ করার ক্ষমতা তার নেই। নিজের সুবিধাবাদী চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণ করে এই সত্য উপলব্ধি ঘটে যে, গ্রামের নিরন্ন অসহায়

---

[১৪] হাসান আজিজুল হক, *আমরা অপেক্ষা করছি* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৯), পৃ. ৪৬।

মানুষের কাছে আতিথেয়তা পাওয়ার নৈতিক ও যৌক্তিক কোনো অধিকার নেই তার। এমনকি গ্রামে প্রবেশের মতো সামান্য অধিকারও নেই। আর গ্রামে এক রাত্রিযাপনের দুর্দণ্ড ইচ্ছা ও গ্রামের মানুষদের কষ্টকে ধরবার দুর্মদ আকাঙ্ক্ষা, দুটোই প্রহসন বা উপহাস বা বিলাসিতার নামান্তর। তীব্র আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি লেখক গ্রামের প্রবেশমুখে দাঁড়ায় অপরাধীর ভঙ্গিতে। রাতের অন্ধকার নেমে আসায় শহরে ফিরে যাবার উপায় নেই। অগত্যা, গ্রামের প্রবেশ মুখে ভাঙা পরিত্যক্ত একটি কুঁড়েঘরে, যা শেয়ালের আস্তানা, কোনোরকমে রাত পার করে সকালে পালানোর কথা ভাবে।

হাসান আজিজুল হক শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমণ্ডলের কিছু মানুষকে গ্রামে ডেকে এনে পরিস্থিতির নির্মমতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আপোসহীন নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ক্যামেরা, রাইফেল, রেকর্ড প্লেয়ার, জলখাবার ইত্যাদি আয়োজন করে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে আমোদ করতে সদলবলে যে গ্রামে এসেছে, সেখানে খাদ্যাভাবে মানুষ আত্মহত্যা করে। আবার, যারা সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে জীবন দিতে প্রস্তুত, তাদের বিপ্লব যে আপাদমস্তক স্বার্থ ও সুবিধার বিপ্লব, গ্রামের ক্ষুধার্ত মানুষেরা তা জানিয়ে দিয়েছে বিপুল খাদ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এভাবেই নাগরিক বিবেককে আক্রমণ করেন হাসান আজিজুল হক। সামান্য পরিমাণ সৌজন্য বা সম্ভ্রম রক্ষার প্রয়োজন মনে করেননি।

আদিবাসীদের জীবন-সংঘাত

আধুনিক রাষ্ট্রের শিক্ষিত সভ্য নাগরিকরা ক্রমশ জাতীয়তাবাদী ও জাতিসত্তায় বলীয়ান হচ্ছে, আর সেইসাথে সংকুচিত হচ্ছে বা হরণ করে নিচ্ছে আদিবাসীর ভূমি ও বেঁচে থাকার অধিকার। এই শোষণ প্রক্রিয়ার সাথে কম-বেশি সকলেই জড়িত। রাষ্ট্রের সংবিধান থেকে শুরচ করে কোথাও তাদের ভূমির অধিকারের রক্ষাকবচ নেই। এমনকি সাধারণ নাগরিকের মর্যাদাও পায় না। রাষ্ট্র ও সরকার তাদের উপরে কখনোই সুবিচার করেনি। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে বাঁচার মর্যাদা তারা কখনোই পায়নি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মানুষটি থেকে শুরচ করে গ্রামের সাধারণ বাঙালিটি পর্যন্ত আদিবাসীদের জীবন, ঐতিহ্য, সম্পদ, শ্রম ও নারীকে মর্যাদার চোখে দেখে না। প্রায় বিনা বাধায় আদিবাসীদের জমিদখল করে উচ্ছেদের উল্লাস এখনো থেমে নেই। ফলে, ভূমিচ্যুত আদিবাসী উপজাতিরা ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হতে হতে এখন উদ্বাস্তু শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। চারদিক থেকে তাদের বেঁচে থাকার মৌলিক দাবিগুলো উপেক্ষিত হতে হতে বর্তমানে এমন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, তারা আর মানুষের পর্যায়েই পড়ে না। তারা এখন নরকপুরীর বাসিন্দা। হাসান আজিজুল হকের ভাষায় "ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমন জায়গা থাকতে মানুষের শাস্তির জন্য আবার নরকের কি দরকার!"[১৫]

হাসান আজিজুল হক তাঁর *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের দুটি গল্প, 'দূরবীনের নিকট-দূর' ও 'দুন্দভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে' উপজাতীয় জনপদ ও

---

[১৫] হাসান আজিজুল হক, "জোড়খোলা সেলাই-রেখায়," *ছড়ানো ছিটানো*, পৃ. ৪৬।

জনজীবনের বাস্তব পরিণতি নিয়ে লিখেছেন। তিনি কিছু শিক্ষিত মানুষকে অতিথি হিসেবে নিয়ে যান আদিবাসী গ্রামে, যারা আদিবাসীদের ভূমি, সম্পদ ও শ্রম হরণের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। 'দূরবীনের নিকট-দূর' গল্পের সূচনা বাক্যেই কথক বলেন 'আজকাল দেশের ভিতরে ঢুকতে আমার ভয় করে।' (পৃ. ৯) অর্থাৎ গ্রামের বর্তমান বাস্তবতার সাথে কথকের মানসিক ও শারীরিক কোনো সংযোগ নেই। আবার, গ্রামের দীনতা ও পশ্চাৎপদতার জন্যে তার দায় এবং এ থেকে পালিয়ে বেড়াবার অপরাধ বা অস্বীকৃতি জানাবার অপরাধজনিত ভয় থেকেই ওঁরাও যুবক দূরবীনকে তার শর্ত, "খবরদার দূরবীন, গল্প বলবি না, কোনো গল্প নয়।" (পৃ. ১০) আদিবাসী নিপীড়নের ইতিহাস ও এই ইতিহাসের হোতাদের একজন হিসেবে কথক ভালো করেই জানেন, দূরবীনদের গল্প আছে। শত শত বছর ধরে একটি গল্পের মুখোমুখি তারা, শিক্ষিত-সভ্য মানুষদের দ্বারা নিপীড়ন, উচ্ছেদ ও বিনাশের গল্প। অতিথি আদরের নামে গল্পের ফাঁদে ফেলে নির্মম প্রতিশোধের খেলায় মেতে উঠতে পারে এই ওঁরাও যুবক। শেষে অতিথি আদর অতিথি সৎকারে পরিণত হবে।

দূরবীন তার পূর্বপুরুষ থেকে শুরচ করে নিজের উপরে চলে আসা নির্যাতনের শোধ নেবার এই দুর্লভ সুযোগ ছাড়ে কি করে। বাস্তবে দেখা যায়, সে ছাড়েও নি। গল্পের ফাঁদ পাতে কৌশলে। দূরবীনে দূরের জিনিস কাছে দেখায়, লেখক আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ও জনপদের প্রকৃত চিত্র দেখিয়েছেন ওঁরাও যুবক দূরবীনের চোখে। দূরবীনের গল্পের শুরচ গ্রামের একটি বিয়ে, সেইসূত্রে নৃত্য ও ভোজের আয়োজনের সুংসবাদ ও সুব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে। টানা চারদিন ধরে চলছে বিয়ের অনুষ্ঠান। বর-কনের দুই গ্রামের মোট তিনশো মানুষের খাবারের আয়োজন শুধুই খিঁচুড়ি ঘাটা। গ্রামের প্রতি ঘর থেকে মুষ্ঠি তোলা চালে সামান্য ডাল ও দুকেজি সিলভার কার্প মাছ মিশিয়ে রান্না চলে তিনশো মানুষের খাবার। কথক একটা শুয়োর মারার কথা প্রসঙ্গ তুললে দূরবীন সবিস্ময়ে জানায়, সাঁওতালদের শুয়োর কাটার সামর্থ্য নেই। এভাবেই দূরবীন কৌশলে গল্পের ফাঁদ পাতে।

বাস্তবে দূরবীন গল্প বলে না। এই গল্প তার দৈনন্দিন জীবনচিত্র। কিন্তু এই গল্প শুনতে অনাগ্রহী কথক, কিংবা গল্প শোনার মতো মনোবল তার নেই। কারণ, গল্পের ছলে দূরবীন নিষ্ঠুর আক্রমণের দিকেই যাচ্ছে। তাই, নিকট দূরবীনকে মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে দূরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ছোট হচ্ছে না, বড় হচ্ছে। একদিন পৃথিবীটাই যাদের দখলে ছিল, পৃথিবীর সকল খাদ্য যাদের অধিকারে ছিল, তাদের আবাসন সংকট এখন এতটাই প্রকট যে, নিজেদের কোনো ভিটে নেই, সমতল মাটিতে মৃত্যুগুহার মতো সারিবদ্ধ ঘরে তাদের বসবাস। আর খাদ্য সংকট আরো ভয়াবহ। কুকুরের চেয়েও ইতর জীবন। সাঁওতাল গ্রামে আলাদা করে কোনো কুকুরের বসবাস নেই। কথকের কৌতূহলের জবাবে দূরবীন যা বলে, তাতে মানবসভ্যতার পতিততম একটি জনপদের চিত্র উঠে আসে।

> কুকুর ছাড়া মানুষ আছে ছার? তেবে বড় হবার আগেই কুকুর মঁরে যেছে ছার। ইদিকে কুকুরেরা একটু কাজও করতে পারে না এমন কুকুর হয়ে যেছে মানুষগুলি। এমন সব নেড়ি কুকুর সাঁওতালরা লিবে না। আপনি কি কুকুর দেখতে পেছেন?

দূরবীন, গরম বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে কুকুর হয়ে যাচ্ছে যেন। কুকুর নয়, কুকুরদের লাল চোখ। কুকুরের হাজার হাজার লাল চোখ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছেন? তীব্র উত্তেজনায় দূরবীন চিৎকার করে উঠল, আপনার বন্ধুরা কেউ দেখতে পাবে নাই, পাবে নাই। শুদু আপনি পাবেন। (পৃ. ১৪-১৫)

দূরবীনের ক্রোধ ও আক্রমণের শিকার অতিথিদের মধ্যে একমাত্র কথক ছাড়া বাকিরা নির্বিকার ও নীরব। এমনকি, তারা দূরবীনের সাথে কথা বলার সৌজন্য পর্যন্ত দেখায়নি বা প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ, তারা জানে, দূরবীনের এই গল্প তার নিয়তি, তাকে শিরোধার্য বলে মেনে নিয়ে একদিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। যেতে হবে তাদেরই সুখিভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থাকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্য। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া চলছে কী ভয়াবহভাবে, দূরবীনের গল্পে তা আছে :

সাঁওতালদের এখুন আর কুচ্ছু মনে নাই, সাঁওতাল আর ওঁরাও শালারা মরে গেঁইছে। ওরা আর জন্মায় না ছার। ওদের বউরা আর বিয়োয় না, ওরা আর ওদের বউদের সাথে শোয় না, শুলেও আর বাচ্চা হয় না, বাচ্চা হলেও মরে যায়, বাচ্চা যদি বা বাঁচে ছার, বাচ্চার মায়ের জম্মদ্বার দিয়ে সুতোর মতুন রক্ত পড়া আর বন্ধ হয় না। (পৃ. ১৬)

প্রায় পৃথিবীর বয়সী আদিবাসী সভ্যতা, তার সংস্কৃতি ও তার ধারক-বাহকদের অস্তিত্ব বিপন্নকারীদের ভিতরে যদি সামান্য বিবেক ও বিচারবোধ জাগ্রত করা যায়, এই ইচ্ছা থেকেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ও ভোজের আয়োজনের সাথে অতিথিদের সম্পৃক্ত করার জন্য দূরবীন ভীষণ তৎপর হয়ে ওঠে। খাবারের আয়োজনের মুহূর্তে দূরবীন তার গল্পের চরম একটি পর্যায়ে উপনীত হয়। সরিষার তেল মাখিয়ে পা ধুয়ে দিয়ে অতিথিবরণের ঐতিহ্যের ফাঁদে ফেলে অতিথিদের নির্মম লজ্জায় ফেলে দেয় দূরবীন। অসহায় কথক ভয়ানক পীড়নে আক্রান্ত হয়ে ছটফট করেন, কিন্তু নিষ্কৃতির পথ নেই।

পা দুটি শির শির করে, এত অসহায় লাগে, এত অসহায় লাগে! নেড়ি কুকুরের মতো বেঁধে মারবে, মাথায় ঘাড়ে পিঠে ঠ্যাঙা দিয়ে পিটোবে! নেড়ি কুকুরের মতোই কেঁউ কেঁউ গলার আওয়াজ বের করি। তাতেও বাতাস পাই না। দূরবীন, কিছুতেই কথা শুনবি না তুই? গল্প করতে বারণ করলাম না! তবু, তবু আমাদের লিয়ম বলে দিলি! এই কাজটা করিস না, করিস না দূরবীন। ওদের করতে দিস না। দূরবীন আকাশের দিকে চেয়ে বলল, মশাই ছার ই যি লিয়মের বার হয়্যা যাবে। সাঁওতালদের রূপমান হবে যি! ঈ ধুঁয়ে দেওয়াই হোবে। (পৃ. ১৯)

দূরবীন অতিথি আপ্যায়নের নামে চমৎকার কৌশলে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করে। সমস্ত সভ্য মানুষের পক্ষে, যারা পৃথিবীর আদিমানুষের উপরে নির্যাতন ও তাদের উচ্ছেদের অপরাধে অপরাধী, তাদের পক্ষে কথক একাই সহ্য করে যাচ্ছেন। দূরবীনের ভয়ানক বীভৎস আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম, নৈতিক মনোবল বিনষ্ট এই সভ্য মানুষটিও আত্মরক্ষার্থে একের পর এক গ্লাস হাঁড়িয়া পেটে ঢুকিয়ে কলস উজাড় করে ফেলেন। তারপরেও মুক্তি নেই। প্রবীণ এক আদিবাসী আরো হাঁড়িয়া আনার হুকুম করে জানিয়ে দেয়, এই জনপদের নারীরা আর গর্ভধারণ করে না, বাঁজা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হাঁড়িয়ার

অভাব নেই। পচা ভাতের তৈরি হাঁড়িয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে তারা ভুলে থাকে তাদের সোনালি অতীত ও বর্তমানের অসহ্য নির্যাতনের যন্ত্রণা।

বর-কনের আসরে অনাহারী যুবতীদের শক্ত শরীর, হাত, চুল, স্তন নাচিয়ে, শক্ত কোমর দুলিয়ে নৃত্য-গান চলে, কথকের চোখে যা ভয়ানক, বীভৎস ও অসহ্য। মাথা হেঁট করে বসে নৃত্য দেখতে দেখতে কথকের উপলব্ধি হয়, এই ভয়ানক উৎসব তাদের কোনোদিনই শেষ হবে না। যতদিন বেঁচে আছে, এই ভয়ানক বীভৎস উৎসবের মধ্যেই বেঁচে থাকতে হবে। অধিকন্তু 'দোষ কর‍্যাছি বড় ভাই, অপরাধ কর‍্যাছি বড় ভাই' গানের ভেতর দিয়ে অতিথির কাছে ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশেষ প্রহসন। (পৃ. ২১) এই আদি অধিবাসীরা সরল বিশ্বাসে অতিথিদের নিজেদের ভূখণ্ডে ঠাঁই করে দিয়েছিল, সেই তারাই এখন উচ্ছেদের শিকার। এই সরল অপরাধের জন্য বরং ক্ষমাই চেয়ে নিচ্ছে তাদের কাছে। শেষে, হাঁড়িয়ার নেশার ঝোঁকে কথক জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আদিবাসীরা কিভাবে ও কী খেয়ে বেঁচে আছে? এবার দূরবীন শেষ ও মোক্ষম আঘাত হেনে গল্পের শেষ টানে।

> আমরা সোমবছর কি খাই তাই জিগাছেন? আমরা শাকপাতা ছিঁড়্যা খাই, ঘাস কালাই সেদ্ধ করে খাই, খামচে খামচে মাটি তুলে খাই, খিদেয় প্যাটে মাটি লেপি, ইঁদুর ছুঁচো মেরে খাই, শামুক গুগলি খাই। আমাদের খাবারের কুন্নো অভাব নাই।
>
> দূরবীনের দিকে তাকানো কঠিন। সে দাউ দাউ করে জ্বলছে, তার শরীরের কোথাও ফেটে গেছে বোমাটা, আগুন এগিয়ে আসছে। (পৃ. ২১)

দূরবীনের গল্প যেখানে শেষ সেখান থেকেই 'দুন্দভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে' গল্পের শুরচ। বরেন্দ্রের আদিবাসী একটি গ্রামে অতিথি হয়ে আসেন মহানগরের কিছু অভিজাত মানুষ। তাদের মধ্যে আছেন নামকরা উকিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, রাজনৈতিক নেতা। উদ্দেশ্য, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের সাথে সংহতি ও ঐক্য পোষণের মধ্য একটি আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করা। বরেন্দ্রের বৈরি প্রকৃতিতে প্রচণ্ড তাপদাহের বাতাসে আগুনের উত্তাপ, মাঠ ফেটে চৌচির, চারদিকে জলশূন্য, বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই। পূজা চলছে। কালো-রোগা কঙ্কালসার অনাহারী অস্থিচর্মসার যুবতী, কিশোরী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ঢোল, দুন্দভি, শানাই বাজিয়ে, কোমর জড়িয়ে ধরে সামনে-পেছনে দুলে দুলে নৃত্য করে, রাস্তায় লাইন ধরে মিছিল করে অভ্যর্থনা জানায় অতিথিদের। জীবনের বঞ্চনা, অবহেলা, অবিচার ও অন্যায় উচ্ছেদের শিকার কালো আদি মানুষগুলো নৃত্য আর গানে গানে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে, মা যেন আসেন রক্ত ঝরাতে ঝরাতে। আদি মানুষগুলোর পক্ষে একমাত্র ষোড়শী স্বাস্থ্যবতী মায়ের কাছে প্রার্থনা করে "মা, আমাদের ঘর চাই, বাড়ি চাই, মাটি চাই, স্বামী চাই, ছেল্যাপিলা চাই, আমরা খিদায় লাথি দিব, আঁধারে লাথি দিব–।" (পৃ. ৩৫) দেবীকে সামনে রেখে এই প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু ওরা জানে, ওদের ঘর-বাড়ি-মাটি-স্বামী-সন্তানের অধিকার থেকে কারা বঞ্চিত করেছে। তবে, সম্প্রতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সচেতন কিছু তরচা বাঁচার দাবি নিয়ে কথা

বলে। গল্পের থিক্যা রিদম হেমব্রম ও মালতী মেঝেনরা যে ভাষণ দেয় সেখানে বৈষম্য ও পীড়নের চিত্রটি উত্থাপন করে অধিকার ফিরিয়ে দেবার দাবি করে।

দেবীর প্রার্থনা ও বক্তৃতা পর্ব শেষে দেবী ও অতিথির সেবায় পাকুড় গাছতলায় জমা হয় সবাই। বিশ কেজি মুষ্টিচালে একটি সাদা হাঁস শতখণ্ড করে মিশিয়ে খিঁচুড়ি রান্না করা হয়। আদিবাসীদের উৎসবের এই লোভনীয় খাদ্য সংহতিওয়ালাদের ভেতর থেকে বমি বের করে আনে। তারা সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করতে গিয়ে কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। লেখক আদিবাসী জীবন ও জনপদের অবর্ণনীয় দুর্গতি ও মানবিক বিপর্যয়ের দায় সংহতিওয়ালাদের কাঁধে নিতে বাধ্য করেন এবং তাদের অস্বস্তি ও আত্মপীড়নের নির্মম পরিস্থিতিতে নিষ্ঠুর উল্লাসে মেতে ওঠেন।

দুর্ভিক্ষ

১৯৭৪ সালে গ্রামবাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল। সামাজিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। গ্রামের সর্বহারা মানুষেরা বাঁচার প্রত্যয় নিয়ে শহরে এসে পড়ে নতুন এক ফাঁদে। আলোকোজ্জ্বল শহরের জৌলুস ও চাকচিক্যের মধ্যে ভাসমান মানুষের ঠাঁই জুটে রেলস্টেশনে অথবা ফুটপাতে। যেখানে খাদ্য নেই, বরং নিজেরাই খাদ্য, হয় কুকুরের, না হয় মানুষের। ডাস্টবিন, ড্রেন সর্বত্রই ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়, কিন্তু সেখানেও খাদ্য নেই। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা এবং ভাসমান মানুষের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যাপারে সরকারি কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। গ্রামে তো নয়ই, শহরের কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই। দুর্ভিক্ষের অভিঘাতের গ্রামের ফসলি জীবনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। শহরের আভিজাত্য ও জৌলুসে সেই অভিঘাত পৌঁছাতে পারেনি, কিংবা পৌঁছালেও তা নিতান্তই নিম্নস্তরের মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা বয়ে আনে যে, স্বাধীনতার সুফল প্রাপ্তিতে তাদের কোনো অধিকার নেই। বরং স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে বিপুল বিত্ত ও বৈভবের মালিক হয়েছে এক শ্রেণির মানুষ। তাদের সুখ-প্রাচুর্যের অভাব নেই, এমনকি দুর্ভিক্ষপীড়িত ভাসমান নারীদের শরীর কেনার মতো কাজেও তাদের কোনো ধরনের বিকার নেই। গ্রামে অন্তত অনাহারে মৃত্যুর ব্যবস্থা ছিল, শহরে সেই অনাহারী শরীর ছিবড়ে খাচ্ছে তারা। এই বাস্তবতাকেই হাসান আজিজুল হক পরাবাস্তবতার আবহে বিষয় করেন 'পাতালে হাসপাতালে' গ্রন্থের "মধ্যরাতের কাব্যি" ও "সরল হিংসে" গল্প দুটিতে। পরাবাস্তবতার আবহের কারণে 'বক্তব্যের অভিঘাত আরো তীব্রভাবে পাঠকের উপর গিয়ে পড়ে। পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত ভয়াবহতা গল্প থেকে আলাদা অবয়বে উঠে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে।'[১৬]

"মধ্যরাতের কাব্যি" গল্পে দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপে এক বৃদ্ধা ও নাতনি বেলতলী থেকে ঢাকা শহরে আসে বাঁচার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। নাতনি ভেবেছিল, দাদি ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, পথেই কোথাও মরবে। দুর্ভিক্ষে সুস্থ-সামর্থ্য মানুষরা যেখানে-সেখানে

---

[১৬] সনৎকুমার সাহা, "হাসান আজিজুল হক : ফিরে দেখা," পৃ. ১১০।

পড়ে মরছে, এমনকি বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান পর্যন্ত তিনদিনের পেটের ক্ষুধা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গাছতলায় মরে ছিল, কি এক আশ্চর্য শক্তি নিয়ে কয়েকদিনের উপোস শরীর নিয়েও বেঁচে থাকে বৃদ্ধা। বৃদ্ধা যেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশেরই মতো—এত ঝড় ঝাপটার মধ্যেও ধূকে ধূকে বেঁচে আছে। ঠাঁই নেয় প্লাটফর্মে। মাথার উপরে ছাদ আছে বটে কিন্তু চারিদিকের খোলা জায়গা দিয়ে নাগরিক আলোর ঝলকানি। নগরে খাদ্যের প্রাচুর্য যেমনি হোক আলোর প্রচুর্যে চোখ ঝলসে যায়। বুড়ি ও নাতনির ভয় এই আলোকে। প্লাটফর্মে নিয়মিত দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত কালো প্রেতের মতো মানুষের ঢল নামে। মাথা সংস্থানের একটু ফাঁকা জায়গার জন্যে প্লাটফর্ম চষে বেড়ায় তারা। জীবিত এই মানুষগুলোর শরীরে মৃত মানুষের গন্ধ। যারা এসেছে তাদের প্রত্যেকের কেউ না কেউ দুর্ভিক্ষে মরেছে। মধ্যরাতের বিবর্ণ নিষ্প্রাণ চাঁদের নিচে উদ্বাস্তু দাদি-নাতনির বেঁচে থাকার কোনো উপায় না থাকলেও একজোড়া বুটজুতোর ভয়ানক শব্দ কানে আসে। শব্দটি কাছে-দূরে করে। কিছুতেই দৃশ্যমান হয় না। আতঙ্কে ও ত্রাসে কাঁপে পনের বছরের নাতনির শরীর, কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ দাদির সাথে বিষয়টি শেয়ার করতে পারে না। দাদির ভুলভাল গল্পও নাতনিকে স্বস্তিতে ঘুমাতে দেয়নি। প্লাটফর্মের তীব্র আলোর ছটার মধ্যে দাদি-নাতনি বসে-শুয়ে যে গল্প বলে-শুনে, সেই গল্প মূলত গ্রামবাংলার সুখ-দুঃখের জীবনকাব্য। ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ, হালের বলদ, গোয়ালের গাইগরচ এসব দেখতে না দেখতেই নাই হয়ে কিভাবে জীবনের এই দুর্গতি নেমে এলো, এই গল্প দাদি ঠিকঠাক বললেও নাতনির ধমকে বারবার গল্পের ছন্দপতন ঘটে। আবার নতুন করে গল্প শুরচ করতে হয়। দাদির গল্পে নাতনির বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ যে সুখ-সমৃদ্ধির প্রাচুর্যের কথা বলছে দাদি তা কোনোদিনই তার জীবনে আসেনি। দাদির গল্প শোনার ফাঁকে ফাঁকে বুটজুতোর শব্দ এসে সবকিছু এলোমেলো করে দেয় নাতনির। দাদির গল্প ভিতরের ভয়কে আটকে রাখতে পারে না। গলা শুকিয়ে এলে খোলা প্লাটফর্মে দিয়ে টিউকলে যাবার সময় বুটজুতার শব্দটি তার পেছনে হাঁটে।

বিভীষিকাময় এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে যাচ্ছে নাতনি। নাছোড় বুটজুতোর নিরন্তর শব্দ ক্রমশ চারিদিক থেকে তাকে জালের মতো জড়িয়ে ধরে। জীবনের এই ভয়ানক দুর্বিপাকে এই কিশোরী মেয়ে পরিপূর্ণ এক নারীর মতো পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। ভয়কে দূর করার চেষ্টা হিসেবে অপ্রকৃতিস্থ দাদির ভুলভাল গল্পে মনোযোগ দেয়। কিন্তু বুটজুতোর শব্দ তার জীবনের নিয়তি। এই শব্দের গ্রাস থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। গল্পের শেষে নাটকীয় কিছু সংলাপের মধ্য দিয়ে দাদি-নাতনির জীবন-ইতিহাসের ট্রাজেডির ব্যাপ্তি দেখিয়েছেন গল্পকার। নাতনি মরে যাবার আবদার করে, বিপরীতে দাদি একগোছা চুল ছিঁড়ে মাথার চুলের সমান পরমায়ুর আশীর্বাদ করে। নাতনির নিয়তি রিরংসাতাড়িত বুটজুতোওয়ালার হাতে যেতেই হয়। এই বুটজুতো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ইঙ্গিত করে।

নাতনির এই আত্মসমর্পণ স্বেচ্ছায়, না জোরপূর্বক এটি স্পষ্ট করেননি গল্পকার। দুটিই হতে পারে। নগর জীবনের জটিল আবর্তে পতিত দুর্ভিক্ষতাড়িত এই কিশোরীর বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর দাবির কাছে পরাজিত হয়ে নারীত্বকে বিকিয়ে দেওয়াটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

আবার, নারীভোগী আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর কোনো সদস্যের ধর্ষণের শিকারও হতে পারে। ''মধ্যরাতের কাব্যি'' পটভূমিই ''সরল হিংসা'' গল্পের বিষয়-বিন্যাসে, কিন্তু এই গল্পে নীরব আত্মহুতি নেই, বরং ক্ষুধার্ত নারীর নিজের শরীরকে পণ্য করার অধিকারের লড়াই আছে, আর শেষে আছে প্রতিশোধের উন্মত্ততা।

বিকৃত চেহারা ও রুচির টাকাওয়ালা বামন রাতে পকেটে টাকা নিয়ে বের হয় নারীর সন্ধানে। আর এজন্যে খুব বেশি সময় অপেক্ষাও করতে হয়নি। কারণ, গ্রাম থেকে আসা হাজার হাজার যুবতী নারী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে শহরের সর্বত্র। টাকা ছিটালে যত সংখ্যায় ইচ্ছা গ্রহণ করা যায়। বামন প্রথম যে মেয়েমানুষটির সাথে দফারফা করে সেই মেয়েমানুষটির শেষ বাচ্চাটি মারা গেছে সাতদিন আগে। বুকের টাটানি অসহ্য হলে দুধ বাইরে ফেলে দিতে হয়, শরীরের এই ক্ষতিতে সে বিমর্ষ ও আতঙ্কিত। তিন ডাস্টবিন ও এক ড্রেন খোঁজে খাদ্য না পেয়ে মৃত্যু আসন্ন ভেবে যখন বিলাপরত, ঠিক তখনি বামনের উপস্থিতি ঘটে। এই বাস্তবতায়, মেয়েটির বেঁচে থাকার আশীর্বাদ হিসেবেই টাকা হাতে বামন হাজির হয়। বামনের একটু আড়াল চাই, কিন্তু আড়াল কোথাও নেই। ফুটপাতের ধারে ঘন আগাছা ও লতাপাতাকে আড়াল ভেবে যেই না উপস্থিত হয়, তখনি মেয়েটির প্রতিদ্বন্দ্বি সাত-আটজন ক্ষুধার্ত মেয়েমানুষ, জয়তুন, তসিরচন, টেঁপি, গোলাপি, পুষ্প ইত্যাদি মেয়েরা শরীর নিয়ে বামনের সামনে উপস্থিত হয়। দেহের আঁটুনি ও আকর্ষণের জায়গাগুলো দেখিয়ে বামনকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা করে প্রত্যেকেই বিবস্ত্র হয় এবং শরীর প্রদর্শনের মর্মান্তিক খেলায় মেতে ওঠে।

> সাহেব এত কই, মোরে (তসিরচন) বুজি মনে লয় না আপনের? তবে দ্যাহেন মোর শরীলটা, এই যে দ্যাহেন—বলে একটানে সে কাপড় যা ছিলো ফেলে দিয়ে ন্যাংটো হয়ে যায়। খুব বড়ো শরীর তার, ভালো দুধেল গাইয়ের মতো, নিচের দিকটা ভারি, বিশাল বুক, শক্ত জাঁহাবাজ ঘাড়।
>
> তবে আমারেও দ্যাখেন—জয়তুন তসিরুনের পাশে দাঁড়ায়। সেও সময় নেয় না।
>
> এই মেয়ে শুকিয়ে রসহীন, পেট সেঁটে গেছে পিঠের সঙ্গে, দ্যাখেন, বয়েসকালে ভালই ছেলাম। এখন আমার শেষ বাচ্চাডা মরতেছে।
>
> মোর পোলাডা রাইখ্যা আই। মুইও দ্যাখামু—টেঁপি ফুটপাতে কাছে গিয়ে একটা কালো নোংরা মানুষের ছানা রেখে ফিরে এলে ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাকের মতো একটা ইঁ ইঁ শব্দ হতে থাকে। কান পেতে শুনলে মা শব্দটি হয়তো ধরা যেতে পারে তা থেকে। এইবার বামনকে ঘিরে উলঙ্গ মেয়ে মানুষেরা দাঁড়িয়ে যায়।[১৭]

অর্থের বিনিময়ে বামন তার দেহপিপাসা নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল আড়ালে। কিন্তু আড়াল আর আড়াল থাকে না। প্রকাশ্যেই ক্ষুধার্ত নারীরা তাদের দেহ পানির দামে

---

[১৭] হাসান আজিজুল হক, *পাতালে হাসপাতালে* (ঢাকা : মুক্তধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৫), পৃ. ২৪-২৫। এই গ্রন্থের গল্পসংখ্যা ৫টি : 'মধ্যরাতের কাব্যি', 'সরল হিংসে', 'সাক্ষাৎকার', 'পাতালে হাসপাতালে' এবং 'খনন'। অতঃপর আলোচনায় গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত।

বিকাতে প্রস্তুত। তারা কোনো প্রকার দয়াদাক্ষিণ্য চায় না। তাই টাকা দিয়েও ওদের শান্ত করা যায় না। বরং টাকা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে। তাদের একটাই দাবি "আপনের দয়া চাইনে আমরা, ভিক্ষে না, জিনিশ নেন দাম দ্যান।" (পৃ. ২৫) এবং বামনকে ওদের মধ্যে হতে একজন বাছাই করতেই হবে। উলঙ্গ ক্ষুধার্ত যুবতীরা ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বামুনের নীরব আত্মসমর্পণে তারা আরো ক্ষিপ্ত। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বামনের উপরে। হাত, পা, চুল, কোমর যে যার মতো ধরে জামা ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলে। পকেট হতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ফেলে। বামন নিজেকে রক্ষার সব চেষ্টাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। চিৎ করে শুয়ে দিয়ে বামনের উপরে নির্যাতন চালায় ক্ষুধার্তরা। পুরো নাগরিক হিংস্রতার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ। নগরের দিকে তাকিয়ে নগরের এক নাগরিকের মুখের উপরে দুই পা তুলে দিয়ে খলখল করে হেসে ওঠে এক যুবতী।

দুর্ভিক্ষে মানবিক বিপর্যয় ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। যুবতীদের তীব্র নোংরা প্রতিযোগিতা এবং অর্থের বিনিময়ে মজা লুটে নিতে আসা বামনের নির্বিকার অসহায়ত্বই তার প্রমাণ। ''মধ্যরাতের কাব্যি'' গল্পের মেয়েটিকে যেভাবে ছিবড়ে খেল, ''সরল হিংসা'' গল্পের যুবতীরা যেন তারই শোধ নিল। এভাবেই, তারা দেহভাষায় রচনা করে এক ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ। প্রত্যেকে নিজ নিজ দেহ প্রদর্শনের করচ্চা প্রতিযোগিতায় নেমে শেষে সন্ধান পায় ঐক্যের ভাষা, সেই নিষিদ্ধ ভাষাই হয়ে ওঠে তাদের ক্রোধ প্রকাশ ও প্রতিরোধের অস্ত্র।

উপসংহার

হাসান আজিজুল হক মার্কসবাদের মানবিক নৈতিকতার ধারণার প্রতি আস্থাশীল। সমাজের বৈষম্য অবসান ও উৎপাদনের উপরে প্রতিটি মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাঁর লেখালেখির প্রধান উদ্দেশ্য। পাকিস্তানি দুঃশাসনের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিবৈষম্য ও দারিদ্র্য আর স্বাধীন বাংলাদেশের শ্রেণিবৈষম্য ও দারিদ্র্য ভিন্নমাত্রার। পৃথিবীর সকল দেশে পুঁজিবাদের একটাই নিয়ম— অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্য তৈরি করা। পুঁজিবাদী শোষকচক্রের ফাঁদে পড়ে শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর সর্বহারা শ্রেণির দুর্গতি ক্রমশ বাড়ে বৈ কমে না। মুষ্টিমেয় মানুষ তাদের শ্রম ও অর্জনকে কৌশলে নিজেদের করে নেয়। ফলে সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীনের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দুর্ভিক্ষে চরম মানবিক বিপর্যয়ের জন্য হাসান আজিজুল হক দায়ী করেন নগরের এক শ্রেণির অর্থলোভী মানুষদের। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা মানিকের গল্পগুলোতে দেখা যায়, চরিত্রদের চেতিয়ে দিয়েছেন যেন ধানের গোলা লুট করে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। হাসান আজিজুল হক তার চেয়েও কঠিন কাজটি করলেন। নগরের হিংস্রতার শেকড় পর্যন্ত উপড়ে ফেলার জন্যে হয়তো বামনের এমন পরিণতি।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

শওকত ওসমানের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

মোঃ মোরশেদুল আলম*

Abstract : Liberation war of 1971 is a remarkable phenomenon in the history of Bangladesh. Many novelists have written novels about the liberation war of Bangladesh. Shawkat Osman is one of them. His novels *Jahannam Haite Biday* (1971), *Dui Sainik* (1973), *Nekre Aranya* (1973), and *Jalangi* (1986) are examples of the novels which directly deal with liberation war as their subject matter. This paper examines how the liberation war of Bangladesh is reflected in Shawkat Osman's novels.

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ যুদ্ধের পটভূমি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহত্যা শুরু করে। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙ্গালির অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য তারা এ গণহত্যা চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ পাকিস্তানি হায়েনাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে যা ইতিহাসে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে পরিচিত।[১] দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। আর এ মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় চেতনা ঔপন্যাসিকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধকালীন ঘটনাবলি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকগণ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এ সকল উপন্যাস রচনা করেছেন। শওকত ওসমানও (১৯১৭-১৯৯৮খ্রি.) তাঁর রচিত চারটি উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন।

---

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬), পৃ. ৪১৯।

শওকত ওসমান বাংলাদেশের একজন কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এবং ঔপন্যাসিক। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার খসাকুল থানার সবলসিংহপুর গ্রামে তাঁর জন্ম।[২] তাঁর সাহিত্যিক নাম শওকত ওসমান এবং প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। তিনি কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৩৩ সালে প্রবেশিকা, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৩৬ সালে আই.এ. এবং ১৯৩৯ সালে বি.এ পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ সালে বাংলায় এম.এ পাস করেন। ১৯৪১ সালে তিনি গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজ অব কমার্সে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯৭২ সালে স্বেচ্ছায় অবসরে যান। উপন্যাস ও গল্প রচয়িতা হিসেবে তাঁর মুখ্য পরিচয় হলেও প্রবন্ধ, নাটক, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা ও শিশুতোষ গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস হচ্ছে: *জননী* (১৯৫৮), *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *সমাগম* (১৯৬৭), *চৌরসন্ধি* (১৯৬৮), *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭১), *জাহান্নাম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *পতঙ্গ পিঞ্জর* (১৯৮৩), *আর্তনাদ* (১৯৮৫), *জলাংগী* (১৯৮৬), *পিতৃপুরুষের পাপ* (১৯৮৬), *রাজপুরুষ* (১৯৯২) ইত্যাদি।[৩] তবে তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো হল: *জাহান্নাম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩) এবং *জলাংগী* (১৯৮৬)। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর পটভূমি এবং পরিবেশে বাংলা উপন্যাসের যে নতুন ধারা সূচিত হয়েছিল, সে ধারার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনে শওকত ওসমানের অবদান নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়। শওকত ওসমানের ভাষায়, ''যেখানে নব নব চেতনার সন্ধান, অনুভূতির রূপায়ণে পাঠকের অনুভূতি আরও ব্যাপকতা ও গভীরে নিয়ে যাওয়াই ঔপন্যাসিকের সাধনা।" তিনি ছিলেন বাঙালি সংস্কৃতির সমর্থক এবং স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চারকণ্ঠ। রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে তিনি স্পষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর বন্ধু কথাশিল্পী আবু রুশদ বলেছেন, ''র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক লীগ এর সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিলো আর বেশ কয়েকজন হিন্দু বন্ধু থাকায় রাজনৈতিক মতবাদে তিনি উদারপন্থী ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর চিন্তাধারায় মার্কসীয় প্রভাব পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।"[৪] তিনি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৬ সালে আদমজী

---

[২] শওকত ওসমান, *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ৩১৯।

[৩] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৯ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২৪৫।

[৪] আবু রুশদ, *শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস* (ঢাকা: সৃজন প্রকাশনা লি. ১৯৮৮), পৃ.১৫।

সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, ১৯৮৩ সালে একুশে পদক ও মাহবুবউল্লাহ ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ১৯৯১ সালে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ইত্যাদিতে ভূষিত হন।[৫] তিনি ১৯৯৮ সালের ১৪ মে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শওকত ওসমান বাংলাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী ঔপন্যাসিক। বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর অবস্থান অগ্রবর্তী। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও কাহিনি নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত।[৬] *জাহান্নাম হইতে বিদায়*(১৯৭১) শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। এটি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে লেখা।

শওকত ওসমানের *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র* সংকলনের ভূমিকায় লেখকপুত্র বুলবন ওসমান লিখেছেন, *জাহান্নাম হইতে বিদায়* ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরের দিকে কলাকাতায় লেখা-বিশেষ করে *দেশ* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্যে সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ তাড়া দিয়ে এটি লেখান।[৭] মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাঙ্গালিদের উপর নির্মম নির্যাতনের বীভৎস কাহিনি এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যার মুখে ১৯৭১ সালে জাহান্নাম সদৃশ স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করতে গিয়ে শওকত ওসমান যেসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই অনেকটা আত্মজৈবনিক উপন্যাসের রূপ নিয়েছে এই গ্রন্থে।[৮]

এ উপন্যাসের মূল চরিত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক গাজী রহমান। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় গাজী রহমানের স্কুল নানা কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়ায় পাক বাহিনীর শত্রুর তালিকায় তাঁর নামও ছিল। এতে তাঁর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। হিতাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে অনুরোধ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে গাজী রহমান ঢাকা শহর ত্যাগ করে নরসিংদীতে তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র ইউসুপের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর প্রথম দেড় মাসে বাংলাদেশের উপর যে নিষ্ঠুরতার ঝড় বয়ে যায়, গাজী রহমানের জীবনে তা দুঃস্বপ্নের মত বিরাজ করে। লেখকের ভাষায়,

---

[৫] এ.এস.এম. বোরহান উদ্দীন,''স্মৃতিকথায় বাংলার মুসলিম সমাজ (১৯১১-১৯৪০)", অপ্রকাশিত পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ২৬৫।

[৬] মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের উপন্যাস* (ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪),

[৭] শওকত ওসমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫।

[৮] শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ.১৬০।

> গত দেড় মাস তার চিন্তার পদ্ধতি যে-কোন ন্যায়িক গণ্ডীর মধ্যে অচল ছিল। নানা স্মৃতি এবং ঘটনার ছায়ার অরণ্যে বিচরণই গাজী রহমানকে উপলব্ধির সিঁড়ি যুগিয়ে যেত। দুঃস্বপ্নের পর তবু অর্ধজাগ্রত অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় যুক্তির রেশ কিছু থাকে। গাজীর মগজের কোষে তার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া দুষ্কর ছিল। নিঃসাড়, অদ্ভুত এক অবস্থা।[৯]

ইউসুফের বাড়িতে এসেও গাজী রহমান স্বস্তিতে ছিলেন না। কারণ, এ বাড়িটিও ছিল মৃত্যুর পটভূমিতে ঘেড়া। ইউসুফের স্ত্রী সখিনার ভাই খালেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। দেড়মাস তার কোন খোঁজ খবর নেই। হানাদার বাহিনীর আক্রমণে সে মারা যায়। কিন্তু, এ বাড়ি ছেড়ে গেলেও মৃত্যুকে ডিঙানো যাবে না। কারণ, মৃত্যুর কাফনের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে। লেখকের ভাষায়, ''কিন্তু এই বাড়ি ছেড়ে গেলেই কি মৃত্যুর ছায়া সে ডিঙিয়ে যাবে? কোথায় মৃত্যু নেই?"

পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের দোকান লুটের বিষয়টিও উপন্যাসে উঠে আসে। তারা কয়েকজন লোককে দিয়ে জোরপূর্বক নরসিংদীর বাজার লুট করায়। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ কৃষকও ছিল। তার ভাষায়, ''একের পর এক দোকান আমরা লুড করলাম। হিস্যা-হেই এক রকম। হেরা টাকাকড়ি সোনাচাঁদি লয়, আমরা মাল। দুটা কাপড়, একটা থালা- হেইজাতী লোয়াজিমা। আমাগো মুজিবর রহমান যে কইছে, পশ্চিম পাকিস্তান গোস্ত খায় আর আমরা তার হাড় চুষি।" মুক্তিযুদ্ধ এ বৃদ্ধের চোখ খুলে দিয়েছে। তরুণ বয়সে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য খেটেছেন, রিফিউজিদেরকে সহায়তা করেছেন। অথচ আজ তারাই পাঞ্জাবি সৈন্যদের সহযোগী হয়ে এদেশের মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ লুটের মাল মেঘনা নদীতে ফেলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। বৃদ্ধের ভাষায়,

> মনে মনে আল্লারে ডাকি, হে আল্লা, ইমান খুয়াইয়া এমন বেইমান হওনের লাইগ্যা তুমি বানাইছিলে; জোয়ান কালে কতো খোওয়াব দ্যাখছি, পাকিস্তান হইব, মানুষ হইতা পারব হগ্‌গলে। কতো খাড়্‌ছি, ভোট দিছি। পাকিস্তান হইল। কতো রিফিউজী আইল। তাগোর জায়গা দিছি, খাওয়াইছি... হেরাও শুনি অহন মিলিটারীগো লগে। আল্লা... বেইমান হইয়া এই বয়েসে মরণের লাই পাকিস্তান বানাইছিলাম?... আর কী কইমু বা- জানরা। বহুৎ টাহাপয়সা পাইছে। তাল তাল সোনা। মিলিটারীগো দ্যাখলাম বেজায় খুশ্। আমাদের আর লগে নিল না। কইল- ভাগো... আপনা দেহাৎ যাও...। তয় রক্ষা। লুডের মাল দরিয়ার মদ্দি হব ফেইলা দিছি। লুড করছি হে ত আল্লা দ্যাখছেন। গুনা মেঘনার পানিতে ধোয়া যায় না...।[১০]

---

[৯] শওকত ওসমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০।

[১০] *ঐ*, পৃ. ১০৮।

মানুষের অস্তিত্বের সংকট যখন দেখা দেয়, পার্থিব সম্পদের প্রতি মমতা তখন উড়ে যায়। লেখকের ভাষায়,

> পঁচিশে মার্চের পর সাতাশের সকালে গাজী রহমান লাখ লাখ মানুষকে শহর ছেড়ে যেতে দেখেছে। কেউ কেউ মাত্র এক বস্ত্রে। কত ধনীনন্দিনীকে সে দেখেছে খালি পায়ে দ্রুত হাঁটতে। হাতে চিরাভ্যস্ত ব্যাগটা পর্যন্ত নেই। আসবাব-সঞ্চিত সুরম্য ইমারৎ এক মুহূর্তে রাস্তার মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, পলকে মূল্যহীন। কত বাড়িতে তালা দেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন মনে করে নি মালিকেরা। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে, সব সামগ্রীর যাচায়ের পদ্ধতি এমন বদলে যেতে পারে![১১]

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসে উঠে এসেছে,

> ... পায়ের দুটো নলির উপর কয়েকটা কাটামুণ্ড, খোলা এবং তাজা চোখসহ ক্রমশ সরে সরে যেতে লাগল আরো কয়েকটা লাশের স্তূপের দিকে, যেখানে পাঁচটি জ্যান্ত কচি শিশু বুকে হাত রেখে একদম ভ্যাবাচাকা চেয়ে আছে বেড়া দেয়া একটা বিরাট খাদের ধারে। প্রথমে তা-ই মনে হয়। বুঝি বেড়ার খুঁটি। চোখ কচ্লানোর পর সংযত দৃষ্টি জানান দেয় ওগুলো মানুষের হাত, সারি সারি অনেক দূর বিস্তৃত। ধড়হীন হাত। ক্ষোভ, প্রতিবাদ, ঘৃণা, অসহায়তা আঙুলের অবস্থানভঙ্গী থেকে উদ্ধার করা কঠিন। মানবগোষ্ঠী অথবা আকাশের মুখে লাথি-মারার প্রচেষ্টারত উলঙ্গ রমণীর দুই ঊর্ধ্বমুখী পায়ের মাঝখানে বেয়নটের খোঁচা থেকে টাটকা রক্ত ঝরছে, আর মাটি থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে - একদল কুকুর। চাপ-চাপ কালো সীসার ভাস্কর্য কয়েক ফুট জুড়ে, এবড়ো-থেবড়ো জমিন, যার উচ্চতা কম'চে কম দশ ইঞ্চি। ভাস্কর্য নয়। আসন্ন মৃত্যুর মুখে পাঁচসাত জন, গোটা পরিবার জড়জাড়ি এক আলিঙ্গনে পার্থিব জীবনের সব স্বাদ মিটিয়ে নিতে চেয়েছিল, যখন আগুন এবং গুলির আঘাত তাদের নিমেষে স্তব্ধ এবং পরে দাহকার্য সমাপ্ত করেছে। মুসলমান পরিবার। কিন্তু হিন্দুদের মত শেষকৃত্য পেয়ে গেছে ইসলামী রাষ্ট্রে। কারণ, সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ তারা চিরদিনের জন্য উৎপাটিত করতে চেয়েছিল। তাই শাস্তি, এই চরম শাস্তি।[১২]

ছাত্র ইউসুফের বাড়িতে কিছুদিন আশ্রয় লাভের পর গ্রামে নেজামে ইসলামী ও মুসলিম লীগের সহায়তায় হানাদার বাহিনীর হামলার আশঙ্কা দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, গাজী রহমান রাতের অন্ধকারে মফঃস্বল শহরের উকিল বন্ধু রেজা আলীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। রেজা আলী একাত্তরের গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী। পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য তাকে সর্বদা তাড়া করে–

> এত মৃত্যু- দীন এবং অসহায়- আর এক সঙ্গে তিনি কোনদিন দেখার সুযোগ পান নি। তাজা প্রাণ-মুকুল থইথই করছে পথঘাট জুড়ে, ঘরের আঙিনায়, জলা-জাঙালে, নদীর

---

[১১] ঐ, পৃ. ১১২।
[১২] ঐ, পৃ. ১১৫।

উপর- কত না সুগম- দুর্গম এলাকায়। হঠাৎ কয়েক লহমা। সব শুকিয়ে গেল অথবা কালো ছাই হয়ে গোটা দেশে লেপে দিলে। দিনের পর দিন এই সব ছবি তাকে রেহাই দিত না, চোখ বুজলেই দেখতে পেতেন, মানুষ নিজের ভগ্নাংশ হয়ে কীভাবে আবর্জনার সামিল পড়ে আছে অথবা মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। পরিতৃপ্ত শেয়াল এবং শকুন তাদের স্মৃতিস্তম্ভরূপে জানান দিচ্ছে: এখানে একদা মানুষ ছিল।[১৩]

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কিরণ রায় আজীবন বিপ্লবী। গাজী রহমানের মত তিনিও রেজা আলীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। একসময়ের সন্ত্রাসবাদী ও পরবর্তীকালে প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠক ছিলেন। তিনি বলেন,

এই আমাদের সৌভাগ্য। এমন দেশে জন্মেছিলাম, যার কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেশের দুঃখে শরিক, মানবিকতা অর্জন করে বসে...। লাথির বদলে পাল্টা লাথির আয়োজনে আমরা সফল হব না তো কে হবে? এই দেশকে দেখেছি, ধর্মান্ধতার বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। আজ সেখানেই ধর্মান্ধতা ঘৃণ্য। এই অন্ধকারও তেমনি একদিন কাহিনী হয়ে থাকবে মাত্র...।[১৪]

পরবর্তীতে রেজা আলীর ব্যবস্থাপনায় সৈয়দ আলী নামে একজন তরুণের সহায়তায় গাজী রহমান পাক হানাদার বাহিনীর সতর্ক চক্ষু এড়িয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। বাসে করে পথ চলতে চলতে গাজী রহমানের ক্ষত-বিক্ষত মনের নানা প্রশ্ন উপন্যাসে ফুটে উঠেছে–

... উঠানের একটা ফুলগাছ তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিছু বলার উদ্দেশ্যে। গাছ নয় একদম মানুষ। পাঁপড়ির উপর সন্তানেরা বসে আছে, যখন প্রতিবেশী কণ্ঠ তাদের ডাক দিচ্ছে এক পার্টির আয়োজন সম্পন্ন করতে। লন্, গান, ভাঙা দেওয়াল, কয়েকটা বেওয়ারিশ কুকুর, স্টার্ট-বিমুখ মটোরের কুন্থন- আওয়াজ, পুলিশের হুঁইসেল, বিদেশী রেকর্ডে 'আভামারিয়ার' একটানা সুরেলা ধ্বনি, পিণ্ডিশাহী ধ্বংস হোক, স্লোগানে স্লোগ.ানে বিধ্বস্ত মানচিত্র। এই নরক থেকে আমি মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি... মাঁই বেকসুর হুঁ... আমি নিরপরাধ, শুনে রাখো বেজন্মা বজ্জাতের দল... একদল হিজ্‌ড়ে সঙ্গিনের সামনে করজোড় প্রার্থনারত... খামোকা বিবেকের লড়াই...।[১৫]

উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষণিক বাস্তব ঘটনা ও লেখকের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন যেমন রয়েছে, ব্যক্তি গাজী রহমানের নিজস্ব আত্মধিক্কার ও মধ্যবিত্ত মানসের পলায়নরত মনোবৃত্তির স্বরূপটিও তেমন উন্মোচিত হয়েছে। ''মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের নাগরিক মধ্যবিত্তের সংশয়াকীর্ণ, দোলাচল মনোবৃত্তির স্বরূপটি গাজী রহমানের মানস ভাবনার মধ্য

---

[১৩] ঐ, পৃ. ১২২।
[১৪] ঐ, পৃ. ১৩২।
[১৫] ঐ, পৃ. ১৪১।

দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্নে যেমন দ্বিধান্বিত ছিল, তেমনি যুদ্ধ পরবর্তী ফলাফল বা পরিণতি নিয়েও ছিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।"[১৬] পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার প্রতিরোধ করতে না পেরে অসহায় আর্তনাদ ও আত্মধিক্কার তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

> সুতরাং তার যন্ত্রণার অবসান ঘটতে পারে, কিন্তু যাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছে তাদের যন্ত্রণার জের মিটবে না। এমন পক্ষপাত-বিশিষ্ট মানসিক গঠনই কি তার সারা জীবনের সাধনার ফল! নিজেকে সে প্রতারণা করেছে অথবা যথা-দীক্ষায় দীক্ষিত হয়নি। ভণ্ডামির মুখোশ খুলে পড়ে ক্রান্তিকালে। আসলে ছা-পোষা মধ্যবিত্ত প্রবীণ শিক্ষক মাত্র সে।[১৭]

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মজিদ দর্জি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আজিমগঞ্জবাসী। তাঁর কথায় দৃপ্ত দেশপ্রেম ও নিজের দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ছোঁড়া গুলিতে তিনি আহত হন। মারা যাবেন বুঝতে পেরেও সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আমাকে ওই উঁচু ঢিবির উপর গাছের গুঁড়ির লগে বসাইয়া দ্যান, আমি লড়াই দেখমু। দেখমু আমার দ্যাশের মানুষে কেমন লড়ে। তয় মরণেও সুখ।" হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার কারণে বাংলাদেশের অবস্থা সত্যিকার অর্থেই জাহান্নাম সদৃশ ছিল। লেখকের ভাষায়, ''...আজব বিপণি। শুধু নরনারী, শিশু, কিশোরদের দেহ-টুকরো ঝুলছে আংটা থেকে। গোটা কোথাও কিছু নেই। উরু, স্তন, দেহকাণ্ড- এমন নিছক অংশ পর্যন্ত আছে। কসাইগুলো কাটছে আর ঝুলিয়ে রাখছে। রক্তের এতটুকু অপচয় নেই। সব শিশিভর্তি গুদামজাত হচ্ছে।" মুক্তিযুদ্ধকালীন এমন অনেক নৃশংস বাস্তব ঘটনার বর্ণনা উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। লেখকের বর্ণনায়,

> মেশিনগানের গুলি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে। কোলাহল, আর্তনাদ।...সঙ্গিনের আগায় গাঁথা শিশু চীৎকার-রত, যখন অগ্নিবোমা তাকে নিমেষে কাবাব বানিয়ে দিলে। জল্লাদ অট্টহাসি পৈশাচিক উল্লাসের শিকার হওয়ার পর পাঞ্জাবী সেনানীর ধর্ষণেচ্ছু লালাসিক্ত ঠোঁটে ফিরে গেল... প্রলয়ের প্রকম্পন মর্টারের আওয়াজে, রণতরীর শেল-বর্ষণে, কামানের হুঙ্কারে... অসহায় দীর্ঘশ্বাসের গতিক্ষুব্ধ বাতাস যেখানে নিরর্থক।[১৮]

পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা ও নির্মমতার বাস্তবচিত্র প্রতীকীরূপে এ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। জাহান্নামের প্রতীকে ঔপন্যাসিক হানাদার বাহিনী কবলিত বাংলাদেশকে দেখেছেন। তাঁর এ উপন্যাসের সমালোচনায় কেউ কেউ বলেছেন, ''শওকত ওসমানের উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের চলতি মুহূর্তের বিবরণ '*জাহান্নাম হইতে বিদায়*' লেখা

---

[১৬] মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১-৪২।

[১৭] *ঐ*, পৃ. ১৪৩।

[১৮] *ঐ*, পৃ. ১৬৬।

হচ্ছে একটা অস্বস্তিকর ভীতিকর পরিবেশে... যে আত্মকথনের আবেগে স্বদেশকে চিহ্নিত করছেন, হানাদার বাহিনীর নৃশংসতাকে তুলে ধরেছেন তা প্রশসংনীয়।"[১৯] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, ''এ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা উপন্যাসের আসল কাহিনী নয়, প্রেক্ষাপট মাত্র।"[২০] উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে কেউ

কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। ''জাহান্নামের প্রতীকে তিনি হানাদার বাহিনী কবলিত বাংলাদেশকে দেখেছেন। কিন্তু প্রতিরোধ ও সংগ্রামের যে দৃষ্টান্ত ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই স্থাপিত হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে যমালয় হিসেবে আখ্যায়িত করা শুদ্ধ চিন্তার পরিচয় বহন করে না।"[২১] হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতাকে ঔপন্যাসিক সামান্য আয়োজনে নির্বাচিত দৃশ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ''তবে শওকত ওসমানের 'কৃতিত্ব এখানে যে তিনি সামান্য আয়োজনে সেই নিঠুর বর্বরতা, মানুষের অসহায়তা ও প্রতিরোধের ছবি আঁকতে পেরেছেন। নির্বাচিত দৃশ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন বর্বরতাকে।"[২২] কিন্তু তবু এ উপন্যাসের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শওকত ওসমানের *'জাহান্নাম হইতে বিদায়'* বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমসাময়িকতার দলিল।[২৩]

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে *'দুই সৈনিক'* (১৯৭৩) অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক বাঙালি নারী ধর্ষণ, পাশবিক নির্যাতন ও ঘরবাড়ি লুটপাট এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। আলোচ্য উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি এ দেশীয় দালালদের চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে।[২৪] যারা রাজাকার, আলবদর, আল-শামস নামে পরিচিত।[২৫] বাঙালিরা যতই মুসলিম লীগ কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থক

---

[১৯] শহীদ ইকবাল, *রাজনৈতিক চেতনা: বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০০৩), পৃ. ১২৫।

[২০] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিসিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১), পৃ. ৩০৯।

৩০৯।

[২১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ৩১৩।

[২২] *ঐ*।

[২৩] শিরীণ আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০।

[২৪] মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২।

[২৫] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৫।

হোক না কেন, হানাদার বাহিনীর পাশবিক নির্যাতন হতে তারাও রক্ষা পায় নি।[২৬]
আইয়ুব খানের শাসনামলে মখ্দুম মৃধা ছিলেন তার এলাকার মৌলিক গণতন্ত্রী চেয়ারম্যান। তিনি আইয়ুবখানের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন। আবার আওয়ামী লীগের জোয়ার দেখে ভেতরে ভেতরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের সমর্থন দিতেন। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় মৌলিক গণতন্ত্রের মহিমায় তার জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম ছিল। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর প্রকাশ্যে শেখ মুজিবের প্রশংসা করলেও অন্তরে তিনি পাকিস্তান প্রীতি পোষণ করতেন। তিনি বলেন, ''হ্যাঁ , মুজিব একজন বাপের ব্যাটা, এবার মিলিটারীদের দেখিয়ে দিলে বটে!" তিনি সুযোগ সন্ধানী ছিলেন এবং পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তার ভাষায়, ''বসো মিয়া। দ্যাহো কোথাকার পানী কোথা যায়। অহন চুপচাপ থাকন থাকান বা'লা। উপরে আল্লা আলেমুল গায়েব। তিনিই সব কাঠি নাড়েন, তোমার আমার বুঝবার সাধ্যি নাই।"[২৭]
মজলিসে উপস্থিত থাকত তার মোসাহেব গ্রামের সয়ীদ মাতব্বর। তিনি মুসলিম লীগের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি মখ্দুম মৃধার কথার সাথে তাল মিলিয়ে বলতেন, ''কিন্তু মৃধাসাব, দ্যাশে ইস্লামী আর কিছু থাইকব না, এই আওয়ামী লীগ যদি শাসন চালায়। হিঁদু রবি ঠাকুররে নিয়া কী মাতামাতি! তওবা, নাউজোবিল্লাহ্। তৌবা।"
মখদুম মৃধা যেদিকে বাতাস বয়, সেদিকেই পাল তুলে দেয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান চলে গেলেন। আল্লাহ পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য ইয়াহিয়া খানকে পাঠালেন। কিন্তু শেখ মুজিব জেলখানা থেকে ফিরে এলেন অনেকটা উড়ে এসে জুড়ে বসার মত। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর মখ্ধুম মৃধার আসল রূপ উন্মোচিত হলো।
তার ভাষায়,

> খোদা সব দিকই রক্ষা করেন। তাঁর রাজত্বে বেঈমানেরা খুব বেশীদিন লাফালাফি করতে পারে না। এই আওয়ামী লীগার-গুলো কী কুদোকুদি না শুরু করেছিল।" আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" এখন দ্যাখো, ভালবাসা মার্গে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঠ্যালার নাম কয় বাবাজী। আর যে-সে গুঁতো নয়, একদম পাঞ্জাবী মিলিটারী। এখন দ্যাখ মজা। পথে ঘাটে চলা দায় হোত। বয়স আর দাড়ী দেখে হারামজাদারা স্লামালেক দিত বটে, তবে ভেতরে ভেতরে হিংসের ছুরি। এহন দ্যাহো, হালার পুৎ হালারা। তোগোর বাবা মুজিব আছে কি নাই। পশ্চিম পাকিস্তানে জেলের মদ্দি বাপ-বাপ

---

[২৬] পূরবী দাশগুপ্তা, ''শওকত ওসমানের উপন্যাসে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১) ", অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, পৃ. ২৯।
[২৭] শওকত ওসমান, *দুই সৈনিক* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৬), পৃ.১১।

ডাক ছাইড়েছে। অহন তোরা কারে বাপ ডাকবি? পঁচিশে মার্চ। ও আল্লারে আল্লা। তুমিই ঠিগ কইরা দিছলে, মাবুদ। অহন আর" জয় বাংলা... জয়বাংলা" কোন খান্‌কীর পুতের মুখে হুনি না। হব গুয়ার মদ্দি ঢুকছে। আরো ঢুকাইয়া দিবো, সবুর করো। তিন হপ্তা অইল মাত্র। আজ এপ্রিলের বিশ। শোকর তোমার দর্গায় পরওয়ারদেগার। আলহামদোলিল্লাহ... এক মাসের মদ্দি তুমি কী না দ্যাহা-ইলে? কাফেরদের হাত থেকে যুগে যুগে তুমি এই ভাবে এন্নি ধারায় কতোবার ইসলামকে বাঁচিয়েছ। এহিয়া খান, আগা মোহাম্মদ এহিয়া খানকে তুমি লম্বা দরাজ হায়াৎ দাও, প্রভু।[২৮]

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ মৃধা গ্রামবাসীদের ডেকে বলেছিল,

ভাইসব, আপনারা কেউ ঘাবড়ে যাবেন না। আল্লা যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। মঙ্গলের জন্য করেন। দেশ রাষ্ট্র বজায় রাখতে গেলে বদ্‌মাসদের শায়েস্তা করা লাগে। পাকিস্তান-রক্ষা সব মুসলমানদের জন্য ফরজ। আল্লার ইচ্ছা তিনি পাকিস্তান রক্ষা করবেন। তাই তিনি ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। এই মিলিটারীরা সাধারণ সিপাই নয়। ওরা আল্লার ফেরেশতা।[২৯]

মৃধার দুই মেয়ে চামেলী ও সাহেলী কলেজে পড়ার সুবাদে শহরে চাচার বাসায় থাকত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তারা গ্রামে ফিরে আসে। প্রতিদিন রাতে তারা ট্র্যানজিষ্টারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনত, আর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করত। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে একদিন মখ্‌দুম মৃধার বাড়িতে কিছু সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্যের আগমন ঘটে। এদের মধ্যে একজন মেজর হাকিম ও অন্যজন ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ। তারা দুজন বন্ধু। তাদের সাথে ছয় সাতজন সাধারণ জওয়ান ছিল। মৃধা তাদের যথোপযুক্ত আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। তাদের তদারকির দায়িত্ব দেন মোসাহেব সায়ীদ মাতব্বরকে। মখ্‌দুম মৃধা ইসলামী রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান রক্ষাকারী এসব সৈন্যদের ফেরেশতার সাথে তুলনা করে বলেন, "কিন্তু আল্লাতালা ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্যে সৈন্যবেশে যে ফেরেশ্‌তাদের পাঠিয়েছেন, মর্ত্যবাসীর সঙ্গে হঠাৎ তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়া ত এক পরম নসীবের ব্যাপার।"

পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রথমে চা-নাস্তা দেওয়া হলেও পরে তাদেরকে রাতের খাবারের আমন্ত্রণ জানানো হয়। মখ্‌দুম মৃধার কন্যা সাহেলী ও চামেলীকে রান্না বান্নার কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়োগ করা হয়। মখ্‌দুম মৃধার সাথে মেজরের কথোপকথনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে মৃধার অস্তিত্ব জড়িত এ বিষয়টি উপন্যাসে উঠে আসে। "হুজুর,

---

[২৮] ঐ, পৃ. ১৩-১৪।

[২৯] ঐ, পৃ. ১৫।

যাব খুশি আইয়ে। আপ হররোজ মেরে মেহমান। পাকিস্তান হ্যায় ত হাম হ্যায়। আগার পাকিস্তান না রাহে হাম কৈসে রাহ্ সাক্তে?" চা-নাস্তা খেয়ে সামরিক অফিসাররা মখ্দুম মৃধার দুই কন্যার সাথে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। মৃধা তার মেয়েদের অফিসারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। দুই পাকিস্তানি অফিসার চা পান শেষে মদ্যপান শুরু করে। হুইস্কির গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে ফৈয়াজ আকবর এলাহাবাদীর কালাম সুর-সহ আবৃত্তি করে।

বাংগাল কা বাৎ শোন্
বাংগাল্নী কা বাল দেখ।
(বাঙালী পুরুষের কথা
করহ শ্রবণ
বাঙালী রমণীর কেশ
করহ দর্শন)।[৩০]

এর মধ্যে নৈশ ভোজের সময় হয়। যথারীতি নৈশভোজ শেষ করে পাকিস্তানি অফিসাররা ব্রান্ডি খাওয়া আরম্ভ করে। মদ্যপানের একপর্যায়ে অফিসাররা মৃধার কন্যাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মৃধা মাতাল অফিসারদের সাথে তার মেয়েদের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমনিতেই মদ্যপানের কারণে অফিসারদের মেজাজ চরমে ছিল। তার উপর মৃধা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। তারা মৃধাকে আটকে রাখার নির্দেশ দেয়। অন্যান্য জওয়ানদের সারা বাড়ি সার্চ করার হুকুম দেয়। জওয়ানরা আলমারি ভেঙে লুটপাট শুরু করে। ফৈয়াজ ও হাকিম মৃধার অন্দর মহলে প্রবেশ করে। সাহেলী, চামেলী ও তাদের মা অসহায় প্রাণীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। মেজর হাকিম চামেলীকে ঘাড়ে তুলে নেয়। ফৈয়াজ সাহেলীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়। পাক হানাদার বাহিনীর প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও মৃধা তার দুই কন্যাকে ধর্ষণের শিকার হতে রক্ষা করতে পারেনি। বোবার মত চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া মৃধার অন্য কোন উপায় ছিল না। মৃধার চোখের সামনে ফেরেশ্তার মত পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি লুটপাট করে তার দুই কন্যাকে তুলে নিয়ে যায়। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর মখ্দুম মৃধার মা চিৎকার করে বলেন, ''কথা কস না ক্যান? মুখে রাও নাই ক্যান? পাকিস্তান বানাইছিলি না? তহন হিন্দু মাইয়াদের উপর জুলুম অইলে কইতিস অমন দু'একডা অয়। অহন দ্যাখ্ আল্লার ইনসাফ আছে কি না।"[৩১]পাকিস্তানের সমর্থক ইসলামের ধ্বজাধারী মুখ্দুম মৃধা ক্ষোভে দুঃখে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

---

[৩০] ঐ, পৃ. ৬৩।
[৩১] ঐ, পৃ. ৯০-৯১।

'দুই সৈনিক' মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কাহিনি হলেও এ উপন্যাসের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের লালসাবৃত্তির দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। *'দুই সৈনিক'* উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ''*দুই সৈনিক* হচ্ছে হানাদার বাহিনীর দুই মদ মত্ত অফিসার। ৭১ সালের ২৫শে মার্চ হানাদার বাহিনী যে হামলা চালায় তার দুই মূর্তিমন্ত প্রতীক। তাদের পাশবিক ক্রিয়াকলাপ উপন্যাসটির ঘটনাতরঙ্গ সৃষ্টি করে। এ জন্যই সম্ভবত উপন্যাসের নাম *'দুই সৈনিক'*।" এই উপন্যাসের সমালোচনায় বলা হয়েছে,

''*দুই সৈনিক* এ নারী নির্যাতনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হলেও কাহিনির ক্রমঅগ্রসরতা ও চরিত্রগুলোর বিকাশ না থাকায় একে পুরোপুরি উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না।[৩২]

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি অন্যতম উপন্যাস *'নেক্‌ড়ে অরণ্য'(১৯৭৩)*। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নারীদের উপর যে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল এ উপন্যাসে তারই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে বাঙালি নারী ধর্ষণ ও পাশবিক নির্যাতনের বীভৎস ও মর্মান্তিক কাহিনি এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। নেক্‌ড়েরূপ পাকিস্তানি সৈন্যরা বিভিন্ন সময়ে প্রায় একশত নারীকে ধরে এনে শ্বাপদ সংকুল অরণ্য সদৃশ গুদাম ঘরে বন্দী করে ধর্ষণ ও নির্যাতন চালাত। এক সময় এটি সিভিল সাপ্লাইজের গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হত। লেখকের বর্ণনায়,

> গুদামের পোস্তার উপর শত শত বস্তা সারি সারি থাকে থাকে সাজানো থাকত ক'দিন পূর্বে। আজ সারি সারি মানুষ শুয়ে আছে। অবিশ্যি স্তর অনুপস্থিত। কারণ, কারো উপরে কেউ শুয়ে নেই। একদম সিমেন্টের উপর, যাদের মানুষ বললাম, তারা শুয়ে আছে, মানুষের মধ্যে যাদের মানবী বলা হয়। কেউ সটান। কেউ কুকড়ে গেছে শীতের রাত্রের কুকুরের মত। নিজের পেটের মধ্যে মুখ। চারজন শুধু উপবিষ্ট। তারা প্রায় ওই ভঙ্গী অনুযায়ী বসে থাকে। ঘুমের প্রয়োজন হয়ত এই ভাবে মেটে না। কিন্তু বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদি শব্দ এই জগতে অবান্তর। এখানে অস্তিত্ব আছে- এই কথাটাই বড়।[৩৩]

তানিমা, জায়েদা, চাষী বউ, সখিনা, আমোদিনী রায় প্রমুখ পাক হায়েনাদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও হৃদয়হীন বীভৎস লালসার শিকার হয়েছিল গুদাম ঘরে। বন্দিনী চাষী বউ এর কথায় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ''মুক্তিবাহিনী চারিদিকে প্রতিরোধ শুরু করেছে। তাদেরও মেশিনগান আছে, অন্য অস্ত্রশস্ত্র আছে। ...

---

[৩২] মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।

[৩৩] শওকত ওসমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৮।

ঐ শোনো...।" জায়েদা বাবার পরিবর্তে স্বামীকে ডাকতে বললে তানিমা বলল, "কোন স্বামী? আর ত একজন নেই। অনেক অনেক। মেজর, ক্যাপ্টেন, কর্ণেল, সুবেদার, অনেক কুকুরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা কুকুরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা-।"[৩৪] প্রৌঢ়া রশীদা বিবি সখিনাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "আর মুঠাইয়েন না, বু-জান। ঠিগ কইছেন। এই বুড়া বয়সে... আমার জোওয়ান জোওয়ান পোলা ... এই বেইজ্জতির লাইগ্যা বাঁইচ্যা ছিলাম...।" আমোদিনী রায়ের নাম সার্থক। এই পরিবেশেও সে মুখে হাসি ফুটাতে পারে। পাকিস্তানি মিলিটারী বাহিনীর অপারেশনে গ্রাম ছাড়ার সময় আমোদিনী পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার স্বামী ডাক্তার এবং সন্তানের বয়স পাঁচ বছর। কিন্তু কারো কোন খোঁজ খবর নেই। গুদামে চব্বিশ ঘণ্টা আলো জ্বলে। এখানে দিন রাত্রির পার্থক্য বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে বন্দিনীরা পরিখার ভেতর শুয়ে থাকে। কেউ এখানে নিয়মিত আহারের কথা চিন্তা করে না। কিছু ডাল-রুটি আর সাধারণ ব্যঞ্জন থাকে। তার উপর কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। এখানে অধিবাসীরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছে। উঁচু নিচুর প্রশ্ন এখানে অবান্তর। লেখক তাঁর উপন্যাসে বন্দিনীদের আহাজারি তুলে ধরেছেন। "কী হবে আর বেঁচে থেকে। স্বামীর কাছে মুখ তুলে তাকানোর সাহস ত সব সৈন্যরা কেড়ে নিয়েছে। ভাই, মা, বাপ, আত্মীয়স্বজন সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। সে কেমন ধরনের বাঁচা?" লেখক এ সকল বন্দিনীদের উপর পাশবিক নির্যাতনের চিত্রও তুলে ধরেছেন।

> ফেনী অঞ্চল থেকে এক কৃষক তরুণীর উপর পাঁচ ছ'জন খান সেনা উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করছিল। শক্ত বাঁধন বা দৈহিক পরিশ্রমের সঙ্গে আবাল্য পরিচয়ের ফলে হয়ত মেয়েটা মরে যায়নি। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে এখানে তবু আনা হয়েছিল। যারা এনেছিল, হয়ত তাদের ভোগের নেশা মেটেনি। সুস্থ হলে, আবার যদি বিনা পয়সায় ভাড়া খাটানো যায়, মন্দ কি।[৩৫]

এখানে কোরবানির ছাগলের মত বিবস্ত্র রমণী হেঁটে চলে যায়। সকলের তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কিছু করার থাকে না। যেদিন পরিখার মধ্যে মাতাল সিপাহীরা বাসরশয্যা বানায়, সেদিনও স্তব্ধতা এই রাজ্যে ভর করে।

সখিনা তার প্রেমিক কে স্মরণ করে স্বগতোক্তি করতে থাকে।

> তুমি এখন কোথায়? মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছ নিশ্চয়। ...আর কখনও যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় এবং আমি জানতে পারি, তুমি তোমার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে রাইফেল ধরনি, মর্টার ছোঁড়নি,... আমি তোমাকে তখন খারিজ করে দেব আমার বুক থেকে। ... অনাঘ্রাতা

---

[৩৪] ঐ, পৃ. ২৪০।

[৩৫] ঐ, পৃ. ২৪৫।

> কুসুমের মত আমি তোমাকে নিজের হাতে তুলে দেব ভেবেছিলাম... শূয়োরের পাল গোলাপ বাগান তছনছ করে দিয়ে গেল... জননী বাংলাদেশ কোথায়? কোথায়? তার বীর সন্তানেরা আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে...।[৩৬]

তানিমার স্বামী নূর আহসান চিরন্তন বাঙ্গালি। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে হানাদার বাহিনী বাংলার পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালায়। তানিমারাও পালানোর সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ছোঁড়া গুলিতে রাতের অন্ধকারে সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তানিমা বেঁচে গেলেও সময়ের আবর্তে তার ঠাঁই হয় এ বন্দী শিবিরে। পাকিস্তানি সৈন্যদের বিকৃত রুচির পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন,

> ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্ণেল ইত্যাদি সকলের রুচি আলাদা। রেজা খান একটু বেশী বয়সী মেয়ে পেলে খুশী হয়। মেজর বুখারী কালো ধ্যাবড়া নাক মঙ্গোল মঙ্গোর রমণীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাঝে মাঝে আসে কর্ণেল ইস্তিয়াক। সে সুগঠিত নিতম্বের প্রতি এমনই মোহাবিষ্ট যে সম্মুখের দিকে ফিরেও তাকায় না।[৩৭]

স্বামী হারা চাষী বউ রশীদা বিবি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য পাট ক্ষেতে লুকিয়ে ছিল। তার ভাষায়, ''পাট ক্ষেতে সান্ধাইয়া গোটা গেরাম পুড়তা দেখছি... তহন সকলে 'জানে বাঁচছি, তাই দুঃখ করি নাই। যহন পাট ক্ষেতে গুলি করতা লাগল, তখন যে যেদিগ পারলাম দৌড় দিলাম...।" পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে সে
ধরা পড়ে। তার ভাষায়, ''...জীবনে কহনও গাড়ী চড়ি নাই। বড় সাধ ছিল। অহন গাড়ী চড়া হৈল... রাস্তার মদ্যি ধইরা আঁধারে নিয়া আইল... গাড়ী ঝক্ ঝক্ ঝক্... গুলির শব্দ গুলি... গুলি।..."[৩৮]

পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন রেজা খাঁন চাষী বউকে নির্যাতন করতে উদ্ধত হলে তার কণ্ঠস্বর গোটা গুদামে ঝন্ ঝন্ বাজতে থাকে।''তুমি আমার পোলার লাহান- আমার তুমি বা-জান।" তানিমা এর প্রতিবাদ করলে রেজা খান তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এভাবে প্রতিবাদী তানিমার মৃত্যু হয়। নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে সে তার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে স্মরণ করেছিল এবং বলেছিল, ''আহ্ নূর আহসান...।" জায়েদা আমোদিনীকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল,''এমন দেখাও হয় জীবনে। হিন্দু, মুসলমান। হতভাগারা হিন্দু, মুসলমান করে করে গোটা দেশটাকে এখানে এনেছে। এবার যদি শিক্ষা হয়।"[৩৯] পাকিস্তানি নেক্‌ড়েদের

---

[৩৬] ঐ, পৃ. ২৪৭-২৪৮।
[৩৭] ঐ, পৃ. ২৫৫।
[৩৮] ঐ, পৃ. ২৫৮।
[৩৯] ঐ, পৃ. ২৭৭।

প্রতিনিয়ত ভোগের বস্তু হওয়ার পরিবর্তে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে ও অপমানে আমোদিনী, সখিনা ও জায়েদা আত্মহত্যা করেছিল। চাষী বউ সখিনাকে কোলে তুলে নিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, ''হায় মা, পোলাগো কথা মনে পড়ল না? হায়, মা। এ্যাতো বেইজ্জতি নিয়ে বাঁইচ্যা আছি ক্যান... খালি পোলাদের মুখ চাইয়া...।"

পরদিন গুদামে অনেক মিলিটারী জড়ো হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল কর্ণেল রমিজ, ক্যাপ্টেন রেজা খান, আলি বখ্শ এবং আরো তিন-চারজন অফিসার। ক্যাপ্টেন রেজা ঝুলন্ত লাশের সামনে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছিল, ''কর্ণেল সাব, মাফ কিজিয়েগো। আপকা বাৎ পর হাম উয়ো চারকো সায়া রাখনে দিয়া। লেকিন ইয়ে বাঙ্গালী আওরত কো হাম জানতে। দেখিয়ে আব কিয়া হুয়া?"[৪০] *'নেক্‌ড়ে অরণ্য'* উপন্যাসে এ পাঁচজন নারীর বর্ণনা, সাংসারিক চালচিত্র, স্বামী-সংসার, পুত্র-কন্যার স্মৃতি সর্বোপরি বন্দিনী জীবনের দুঃসহ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সমালোচকদের মতে, ''*নেকড়ে অরণ্য*- তে পাক বাহিনীর রিরংসা ও লালসায় বিপন্ন বাঙ্গালি নারীর বিনষ্ট জীবনরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন শওকত ওসমান।"[৪১] এ উপন্যাসের প্রশংসায় বলা হয়েছে, ''মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের সংবাদের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক বাঙ্গালি নারীর প্রতিবাদী চরিত্র ও প্রতিরোধের সংগ্রামী চিত্রও তুলে ধরছেন *'নেকড়ে অরণ্য'*তে। এখানেই উপন্যাসটির বিশিষ্টতা।"[৪২]

'জলাংগী'(১৯৮৬) শওকত ওসমানের অন্যতম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেঘনা নদীর তীরবর্তী বাঁকাজোল গ্রামের সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামের নানাদিক উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ''পঁচিশে মার্চ এর অব্যবহিত ঘটনাক্রম, জাতীয় জীবনের কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা, পাকিস্তান অপশক্তির পাশবিক বর্বরতা, গ্রামাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি প্রভৃতি প্রসঙ্গের বস্তুনিষ্ঠ বিন্যাস এ- উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।"[৪৩] এ উপন্যাসের নায়ক জামিরালি ঢাকা শহরের একটি কলেজে লেখাপড়া করত। তার বাবা মৃধা ফয়েজ মহাম্মদ একজন কৃষক। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ডাকে দেশের সর্বত্র অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। স্কুল, কলেজ, কল-কারখানা, অফিস-আদালত সব বন্ধ ছিল। জামিরালি ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসে। ঢাকা শহরের উত্তাপ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁকাজোল গ্রামও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কাজেম মৃধা সম্পর্কে জামিরালির চাচা। জামিরালি তার মা-বাবার সাথে দেখা শেষ করে চাচা কাজেমের বাড়িতে গিয়ে উঠে। উভয়ের মধ্যে কথোপকথনের এক পর্যায়ে কাজেম মৃধা বলেন, ''পাকিস্তান হৈল।

---

[৪০] *ঐ*, পৃ. ২৭৯।

[৪১] রফিক উল্লাহ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৬৪।

[৪২] মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

[৪৩] রফিক উল্লাহ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৪।

খুব ত সুখ পাইলাম। আগে ইংরেজ লুটত। অহন পাঞ্জাবী লোটে! তা আর অইতে দিমু না। এই আগুন ছুঁইয়া কইছি, চাচা।"[৪৪] কাজেম মৃধার মেয়ের নাম হাজেরা। জামিরালি হাজেরাকে ভালবাসত। ইতোমধ্যে হাজেরা ও তার মায়ের সাথে জামিরালির কুশল বিনিময় হয়। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। ঢাকা শহরে ছেলেরা প্রতিদিন রাইফেল বন্দুক নিয়ে অনুশীলন করে। মেয়েরাও রাইফেল ট্রেনিং নিচ্ছে- মক্তবে পড়ুয়া হাজেরার পক্ষে জামিরালির এই অবাক করা কথা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য ছিল।

সাধারণ জনগণের মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বাঁকাজোল গ্রামেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সাধারণ মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। এখন তারা নিয়মিত খবর শুনে।

> তিন চার খানা ট্রান্‌জিষ্টার থাকার ফলে খবর ভূকম্পনের মত অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা শহরে খবর শোনার জন্য গাঁয়ের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে মানুষ ছুটে যায়। বয়স এখানে বড় কথা নয়। দু'চারজন বুড়ো ছাড়া ছোট ছেলেরা পর্যন্ত বেতার-যন্ত্রটি ঘিরে বসে যায়। আগে গান শোনার জন্য কেউ কেউ অমন হন্যেমি দেখাত। এখন সেই জায়গায় খবর। আর 'জয় বাংলা' শ্লোগান ত ডালভাত। যেন স্লামালেকুম কি নমস্কারের জায়গা নিয়েছে। মজুর কোদাল যোগে মাটি কাটবে। 'জয় বাংলা' মুখে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর পয়লা কোপ। ছোটখাট দৈননন্দিনতার মধ্যে মন্ত্রের মত ওই দুই শব্দ ঢুকে গিয়েছিল।[৪৫]

গ্রামের যুবকেরা নানা কল্পনায় মত্ত। অনেকে লাঠি তৈরি করছে। গণ্ডগোল লাগলে পিটিয়ে সব শায়েস্তা করে ফেলবে। গ্রামের নিকট অবসর প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মিলিটারী ট্রেনিং দিচ্ছে। জামিরালি, অতুল এবং আরো কয়েকজন যুবক তা তদারক করে আসে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে দেশবাসী নতুন করে জেগে উঠে। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

ছাব্বিশে মার্চের বেতার সকাল থেকে স্তব্ধ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের খবরের চ্যানেল থেকে গ্রামবাসী জানতে পারে পঁচিশে মার্চ পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের কথা।

> খবর নয় মানবেতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়ের পাতা থেকে পাঠ। সভ্যতা নির্মর্জিত। যুগযুগান্তরের সংস্কৃতির সকল অবদান ঢাকা শহরে পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তানী শাসকেরা ডুবিয়ে দিয়েছে। অরণ্যের যূথচারী জন্তুবৃন্দ খাকী উর্দি-পরিহিত, মারণাস্ত্রে নখর- সজ্জিত- বেরিয়ে এসেছে তাদের ইসলাম-মার্কা মধ্যযুগীয়তার গুহা থেকে। হত্যা,

---

[৪৪] শওকত ওসমান, *জলাংগী* (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৬), পৃ. ২১।

[৪৫] *ঐ*, পৃ. ৩০।

> লুণ্ঠন, জুলুম এই তিন শব্দের চরমতম রূপ ঢাকা-নগরীর পথে ঘাটে পল্লীতে পল্লীতে বাস্তব আকার নিয়েছিল। আর্তনাদ আর আর্তনাদ নয়, রক্ত আর রক্ত নয়।[৪৬]

দেশের সর্বত্র যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জামিরালির মন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অস্থির হয়ে উঠে। একদিন জামিরালি মা-বাবার কাছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে। বিষয়টি তার প্রেমিকা হাজেরাকেও অবহিত করে। মা-বাবা এবং প্রেমিকার অনুরোধ উপেক্ষা করে জামিরালি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে একদিন ভোররাতে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তার প্রেমিকা হাজেরা মা-বাবার সাথে বাকাঁজোল গ্রাম ছেড়ে দশ মাইল দূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

চারমাস অতিবাহিত হলেও জামিরের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও ফয়েজ মৃধার পক্ষে সেটি সম্ভব ছিল না। কারণ নিজ ভিটা ছেড়ে যেতে তিনি রাজি ছিলেন না। বর্ষা শুরু হওয়ায় পাকিস্তানি গানবোটের আনাগোনা বাংলাদেশের বিভিন্ন জলপ্রান্তরে শুরু হয়। বাকাঁজোল গ্রামও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পাকিস্তানের জঙ্গী শয়তানেরা নির্বিচারে গ্রাম পোড়াতে শুরু করেছিল। ঔপন্যাসিক সেই বীভৎস ঘটনার বর্ণনায় বলেছেন,

> হঠাৎ বজ্রঘাতের মত গুলি নিক্ষেপ এবং আগুন লাগানো শুরু হয়। গান্‌বোট থেকেই এসব করছিল হানাদার বাহিনী। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তেমন ছিল না। তবু অনেকে বেঁচে গিয়েছিল অন্ধকারে এদিক-ওদিক সরে গিয়ে। কিন্তু ফয়েজ মৃধার বাড়ির উপর তারা যেন তাক্ করে আগুন লাগিয়েছিল, গুলি ছুঁড়েছিল। স্বামী-স্ত্রীকে আর উঠতে হয়নি।[৪৭]

মুক্তিবাহিনীর সদস্য জামিরালি ছয়জন সঙ্গীসহ পাঁচ মাস পড়ে একদিন মা-বাবার খবর নিতে গ্রামে হাজির হয়। মুনশী পাড়ার নাসির মুনশী জামিরালিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে। ''বা-জান বুড়া বয়সে এসব দ্যাহনের লাইগ্যা পাকিস্তান হৈছিল? তোমার বা-জান-" জামিরালির বাড়ি বলতে আর কিছুই ছিল না। একসময় সে বাবার কবর কোথায় জানতে চাইলে নাসির মুনশী উত্তরে বলল, ''ইসলামী রাষ্ট্র হৈছিল, বা-জান। নসীবে কবরও লেখা নাই।"

পিতা-মাতার নির্মম মৃত্যু সংবাদ অবগত হওয়ার পর প্রবল প্রতিশোধ স্পৃহায় সে নিজ এলাকায় কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর জামিরালি তার চাচাতবোন প্রেমিকা হাজেরার খোঁজ খবর নিতে কাজির চর রওনা হয়। কাজির চর গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে চারজন রাজাকারের হাতে জামিরালি ধরা পড়ে। রাজাকাররা তার সর্বাঙ্গ তল্লাশি করে হাফ শার্টের ভিতরের পকেটে একটি চিরকুট পায়। যেখানে হাজেরার নাম লেখা ছিল।

---

[৪৬] ঐ, পৃ. ৩৩।

[৪৭] ঐ, পৃ. ৪১।

'' আমি তোমাকে- ।
তুমি কী আমাকে-?
- হাজেরা ।" এ চিরকুট পেয়ে রাজাকার দলপতি যেন পৃথিবী জয় করে ফেলে। সে জামিরালিকে মেজর হাশেমের জিম্মায় দিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মেজর হাশেমের অত্যাচার ও নির্যাতনের খবর গ্রামবাসী জানত। গ্রামের লোকজন তার নাম শুনলে শিউরে উঠত। বাঙালিদের কি করে বুটের তলায় রাখতে হয়, তা সে ভাল করে জানে। মেজর হাশেম সেই চিরকুটের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। কারণ মুক্তিফৌজের কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ত সেখানে থাকতে পারে। পাকিস্তানি সিপাহিরা জামিরালিকে এলোপাতাড়ি চড়-কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে। তার সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে যায়। অনেক আগে থেকেই অন্যান্য মেয়েদের মত প্রেমিকা হাজেরাও মেজর হাশেমের ক্যাম্পে বন্দী ছিল। সিপাহিরা তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাত। বন্দী নারীদের মধ্য থেকে হাজেরাকে খুঁজে নেওয়ার জন্য জামিরালিকে একটি কামরায় নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে জামিরালি বন্দী নারীদের মধ্যে হাজেরাকে খুঁজে পায়। মেজর নিজের সামনেই জামিরালিকে হাজেরার সাথে দৈহিক মিলন ঘটাতে বাধ্য করে। জামিরালির পিটে থাপড় দিয়ে রসিকতার সুরে মেজর হাশেম বলল, ''দেখো, নওজোয়ান। তোম মজা করো। হাম কো ভী থোড়া মজা উঠানে দে। হাম তো স্রেফ দেখ্‌নেওয়ালা।"[৪৮] নির্যাতিতা হাজেরা সর্বস্ব দিয়ে হলেও প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা জামিরালির নির্যাতন কমাতে চেয়েছিল। মেজর হাশেমের রুচিবিহীন বিকৃত নির্দেশ পালন করতে সে জামিরালিকে অনুরোধ করেছিল। হাজেরা তার কাছে বলেছিল, ''আমার ইজ্জতের আর কী আছে। যা কয়, রাজী হন।" জামিরালি অনেকটা বাধ্য হয়ে সম্মতি দেয়। ঔপন্যাসিক এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> যে দেহের জন্য জামির স্বপ্ন দেখেছিল, বাসর-শয্যায় চরম দাবীর আনন্দ ও সম্মানের প্রত্যাশায়, যেখানে চিবুক স্পর্শ ছাড়া আর কোন দুর্বলতা দেখায় নি কোনদিন, সেই অঙ্গ-প্রস্তর আজ তার বুকের তলায় এই ভাবে পড়ে রইল কংক্রিটের শক্ত মেঝের উপর- যখন বন্য উল্লাসে নিকটেই হাততালি-রত মেজর হাশেম এবং তারই ধমকে শরীক অন্যান্য জওয়ানেরা।[৪৯]

গ্রামের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মোসাহেব আলীর মাধ্যমে গ্রামবাসীর সামনে জামিরালি ও হাজেরাকে ব্যভিচারের অপরাধে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। মেজর হাশেম বলল, ''ব্যভিচার চলতে দিলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর ভবিষ্যতে কেউ যেন এমন 'জেনা'-র

---

[৪৮] ঐ, পৃ. ৬৪।
[৪৯] ঐ, পৃ. ৬৬।

কাজ না করে, তার জন্যই এই শাস্তি।...পাকিস্তান জিন্দাবাদ।" মেজর হাশেম তাদের মেঘনা নদীতে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ঔপন্যাসিক এ প্রসঙ্গে বলেন,

> চারজন জওয়ান আসামীদের গলায় যথারীতি পাথর দু'টো ঝুলিয়ে দিলে। হাজেরা, জামিরালি দুই জনে নীরব। হাত চোখ বাঁধা। পাথরের প্রতিমা উভয়ে।
>
> পাটাতনের কিনারায় তাদের দাঁড় করানো হোলো।
>
> মাথার উপর গোধূলির আকাশ ।
>
> জলকল্লোল অব্যাহত রয়েছে দিকে দিকে।
>
> মেজর হাশেম ইঙ্গিত দিলে, শেষ ইঙ্গিত।
>
> এক ধাক্কায় দুই আসামী পাটাতনের কিনারায় চ্যুত হলো। তখনই সমস্বরে হাজেরা, জামিরালি চীৎকার দিয়ে উঠলঃ জয় বাংলা। জয়...।
>
> অসম্পূর্ণ কথা। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র।

তারপর প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল রাক্ষুসী মেঘনার গর্জন-ক্ষুব্ধ অতলে।[৫০]

'*জলাংগী*' উপন্যাসে লেখক মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি, যুবক ও ছাত্রদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, শারীরিক ও পাশবিক নির্যাতনের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসে বাঁকাজোল গ্রামের প্রতীকে যুদ্ধকালীন জীবন বাস্তবতার একটি সামগ্রিক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।[৫১] এ উপন্যাসের

সমালোচনায় বলা হয়েছে, ''লেখক বারবার পাকিস্তান প্রসঙ্গ, হানাদারের অত্যাচার মুক্তিযুদ্ধের শৌর্যবীর্য ইত্যাদি বিষয়কে অহেতুক আরোপিত করেছেন। একটি উদ্দেশ্য হাসিল করার প্রবণতা নিয়েই তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্য উন্মোচন করেছেন।"[৫২] এ উপন্যাসের প্রশংসায় রফিকউল্লাহ খান বলেছেন, ''*জলাংগী* উপন্যাসে শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধের রক্তিম আবেগ রূপায়ণের প্রশ্নে আন্তরিক এবং অনেকাংশে সাফল্যস্পর্শী।"[৫৩]

মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মুক্তিযুদ্ধের উপাদানের উপর ভিত্তি করে ঔপন্যাসিকগণ বিভিন্ন উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের রচিত উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত হয়েছে। এ উপন্যাসগুলো একদিকে যেমন ধারণ করেছে মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ ও বিষয়, অন্যদিকে তেমন প্রতিফলিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের জীবনচেতনা ও সমাজভাবনা। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে শওকত ওসমান অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধের সমকালীন পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা ও লুণ্ঠনের বাস্তব চিত্র তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর

---

[৫০] *ঐ*, পৃ. ৭২।

[৫১] আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৩১৪।

[৫২] শহীদ ইকবাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫।

[৫৩] রফিকউল্লাহ খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৪।

মূল উপজীব্য। *'জাহান্নাম হইতে বিদায়'*, *'নেকড়ে অরণ্য'*, *'দুই সৈনিক'* ও *'জলাংগী'* উপন্যাসে যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃসংশতার বাস্তব চিত্রের পাশাপাশি বাঙালি জাতির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িক কালে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত তাঁর এ উপন্যাসগুলো ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত ও প্রতিবাদী নারী

নূরে এলিস আকতার জাহান•

Abstract: During the Bangladesh liberation war of 1971, murder of the intellectuals and violation of women by Pakistani army and their loyalist paramilitary forces, called the Razakars, Al-Badrs, Al-quds, Al-Sams etc. were a part of their planned everyday activities. In this article the author tries to explore the sacrifies and suffering of the women during the liberation war as depicted in Bengali novel with a view to drawing sympathy of the international communities for the women war veterans (Biranganas) and develop a hatred in them for those who committed this violence against humanity.

১.১ ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে নারীর জীবন ছিল একেবারে সাদা-মাটা আটপৌরে। রান্না-খাওয়া, স্বামী সেবা, সন্তান লালন পালন ছিল নারীর নিত্যদিনের বাঁধানো কর্ম। তার নিজস্ব চাওয়া-পাওয়া ছিল না। স্বামী সন্তানের সন্তুষ্টির উপর সব সময় নির্ভর করত নারীর সুখ। কিন্তু নারীও মানুষ, তাদের নিজস্ব একটা জীবন আছে, তাদের স্বকীয়তা আছে, আছে একান্ত নিজস্ব ভুবন। এসবই উপলব্ধি করা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শাসকদের শাসনামলে আমাদের দেশের মানুষ শোষিত হয়েছে, হয়েছে বঞ্চিত। শোষকরা তাদের স্বৈরশাসনকে টিকিয়ে রাখতে বাঙালি জনগণের প্রতি অবহেলা আর নির্যাতন করেছে। যে নির্যাতনের চরম রূপ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সহজ সরল বাঙালিদের উপর চলে অমানুষিক নির্যাতন ও ষ্টিম রোলার। ধর্মের অপব্যবহার আর অস্ত্রের জোরে বাঙালি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিপীড়িত হয়েছে। নির্যাতনের যাতাকলে পৃষ্ট হয়েছে এদেশের নারী, পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ সকলেই। লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে পাকিস্তানি পশু প্রবৃত্তির মানুষের দ্বারা। সহজ সরল বাঙালিদের উপর পাকসেনারা হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। তাদের বসত বাড়ি

• ড. নূরে এলিস আকতার জাহান, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

হতে উচ্ছেদ করেছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীর আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত সনাতন ও পশ্চাৎপদ। ফলে এদেশে সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণের নানা কৌশল বিস্তার করে নারী নিগ্রহের মহরত চলে। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের নারী সমাজের উপরে পশ্চিমা নরঘাতকদের পাশবিকতা সকল অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।[১] এসব নারীদের মুক্তিযোদ্ধাগণের সহযাত্রী এবং নারীদের ত্যাগের স্বীকৃতিতে তাদেরকে সরকারিভাবে বীরাঙ্গনা উপাধি দেয়া হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে তাদের অধিকাংশই বীরাঙ্গনা উপাধি গ্রহণ করেনি বা নিজেদের ধর্ষিতা হিসেবে ঘোষণা করেনি। ধর্ষিতা মহিলাদের গর্ভে জন্ম নেয়া শিশুদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আশ্রয় দেয়ার ঘোষণা হলেও, অধিকাংশ ধর্ষিতা মাতাই নানা বিবেচনায় ঐসব শিশুদের বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়েছে দত্তক শিশু হিসেবে। ১৯৭১ এর পুরো ৯ মাস পাকিস্তানি সৈন্যরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বাঙালি নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন আটক রেখে ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটিয়েছে। অধিকাংশের মতেই তা গণধর্ষণ। পাকসেনারা নিজেদের উন্মত্ত বিকৃতিকে বারবার চরিতার্থ করতে গিয়ে অনেক তরুণীকে নিজেদের বাঙ্কারে নিয়ে গেছে। এরা অন্তঃসত্তা হলে বা রোগাক্রান্ত হলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বা খুন করেছে। বেশিরভাগ কৃষকের বাড়িতে পুরুষ সদস্যদের হত্যা করার পর নারীদের উপর ধর্ষণ, নির্যাতন চালাতো পাকিস্তানি সৈন্যরা। নয় থেকে শুরু করে ৭৫ বছর বয়সের বৃদ্ধাকেও পাকিস্তানি সৈন্যরা বা তাদের দোসররা নির্যাতন করেছে, ধর্ষণ করেছে। কোন কোন মেয়েকে পাকসেনারা একরাতে ৮০বারও ধর্ষণ করেছে।[২] যুদ্ধের ঠিক পর পর বাংলাদেশে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার শল্য চিকিৎসক ড. জিওফ্রে ডেভিস। লন্ডনে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ৯ মাসে যে নারীরা ধর্ষিত হয়েছেন পাকবাহিনী দ্বারা, তাদের অনেকেরই সম্ভাবনা আছে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার, অনেকে ভুগতে পারেন জীবনভর।[৩]

১.২ যুদ্ধে নারী নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিচ্ছবি

দখলদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতন কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির নাৎসি বাহিনী, ইতালির ফ্যাসিস্ট বাহিনী কিংবা জাপানী সৈন্যদের নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বহু ঘটনা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু একাত্তরে পাকিস্তানির দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তার দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বহু নারী আত্মহত্যা করেছেন। পাকিস্তানিরা তাদের ধর্ষকামী প্রবৃত্তির কারণে বহু

---

[১] অনীক মাহমুদ, *সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৭৪।

[২] War Crime Fact Finding Committee এর তথ্য থেকে জানা যায়, এক একটা গণধর্ষণ ৮/১০ থেকে শুরু করে ১০০ জন পাকসেনা অংশ নিয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষিত হয়েছে দুই লাখ নারী। সুসান ব্রাউন মিলার রচিত Men, Women and Rape বইয়ে তথ্য রয়েছে: 'হিসাব অনুযায়ী ২,০০,০০০ (দুই লাখ) বাঙালি নারী নয়মাসব্যাপী সংঘর্ষে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল।' মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ ২০০৪), পৃ. ১১৯।

[৩] মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ১১৯।

নারীকে ভয়ঙ্কর সব নির্যাতনের পর হত্যা করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গণহত্যার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও নারী নির্যাতনের বিবরণ সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ সমাজে একজন ধর্ষিতা নারী এ বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে চান না সংস্কার এবং সামাজিক ও পারিবারিক বৈরিতার কারণে। সেই সময়ে নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত সমাজকর্মী মালেকা বেগম বলেছেন, তখন কোনো তালিকা তৈরি করা হয়নি, কারণ তারা চেয়েছিলেন এই সব নারীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত না করে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ঢাকায় মালেকা বেগম পাঁচ হাজারের বেশি নির্যাতিত নারীর জবানবন্দি নিজে পাঠ করেছেন। এসব কাগজপত্র বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর ধ্বংস করে ফেলা হয়।[৪] বাংলার বাণী'র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে বাংলার বাণীতে ডা. ডেভিস বলেন,

> চট্রগ্রামে আমি একজন মহিলাকে দেখেছি, তিনি বিধবা। যুদ্ধে তাঁর ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর সন্তান দু'টি এবং তিনি ছ'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভপাত ঘটানোর পর এই মহিলার থাকার মত স্থান নেই। ছেলে মেয়েদের আহার যোগানোর কোন সংস্থান নেই। আরেকজন মহিলার স্বামী যখন যুদ্ধে গেছেন তখন তাকে হানাদাররা ধর্ষণ করে।স্বামী এসে স্ত্রীকে দেখেন গর্ভবতী। তিনি স্ত্রী এবং দু'টি সন্তানকে ফেলে চলে যান এবং বলে যান যে, আর তিনি তাদের গ্রহণ করবেন না। আরেকজন তরুণী বয়স ১৯। অশিক্ষিতা। সে ছিল ছয় মাসের গর্ভবতী। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। সে স্বল্প কালের জন্য সাহায্য কেন্দ্রে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু তারপর সে কোথায় যাবে কেউ জানে না।[৫]

বাহাত্তরে যে সব শিশুর জন্ম হয়েছে তাদের সম্পর্কে তথ্য খুব কমই রয়েছে। অধিকাংশ শিশুকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পরিবার দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছে। সরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম। নির্যাতিত নারীদের কয়েকজনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে যাদের উল্লেখ রয়েছে তাঁরা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের সন্তান, যাঁদের নয় মাস আটক রাখা হয়েছিল বাঙ্কারে বা বন্দী শিবিরে। এদের একজন বলেছেন:

> আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোন ক্যাম্পে নাকি কোন মেয়ে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা যাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠত।
>
> ... পরদিন হঠাৎ একটি মেয়ে মারা যায়। অন্তসত্ত্বা ছিল। সকাল থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ওরা বন্ধ দরজায় অনেক চেঁচামেচি করল। কেউ এল না। .. . মেয়েটার নাম

---

[৪] শাহরিয়ার কবির (সম্পা.),*একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি* (ঢাকা: একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ১৯৯৯), পৃ. ১৩।

[৫] *তদেব*, পৃ. ১৫।

ছিল ময়না। বছর পনের বয়স হবে। কাটা পাঁঠার মতো হাত পা ছুড়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল, মুখখানা নীল হয়ে গেল। বয়স্কা সুফিয়ার মা একটা ছোট কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল কারণ, ঘরে ওরা চাদর দেয় না। সন্ধ্যার পর ওরা লাশটা নিয়ে গেল।'[৬]

বীরাঙ্গনাদের তালিকা সম্পর্কে অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন, স্বয়ং বঙ্গবন্ধু এই তালিকা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের সমাজ এঁদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মতো উদার নয়। বঙ্গবন্ধু আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন একাত্তরের নির্যাতিতা নারীরা যেন স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন।

১৯৭১ সালে নারীকে সহ্য করতে হয়েছে শারীরিক নির্যাতন, হারিয়েছে তাদের সম্ভ্রম, স্বামী-সন্তান-সংসার। এসব নারীদের নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিচ্ছবি কিছুটা ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে। উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে নির্যাতিত নারীর রূপ; কিভাবে তারা পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছে, কিভাবে তারা প্রতিবাদী হয়েছে, পাকবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারী কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে তার প্রতিচ্ছবি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

১.৩ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে নির্যাতিত ও প্রতিবাদী নারী

মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে লেখা আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) 'রাইফেল, রোটি, আওরাত' (১৯৭৩) উপন্যাস এক অনবদ্য সৃষ্টি। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জান্তব নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত সময়ের অনুপুঙ্খ উপস্থাপন ঘটেছে এ উপন্যাসে। বিশেষ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে যে অমানবিক বর্বরতার ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আনোয়ার পাশা বাস্তাববাদী শিল্পীর নিরাসক্তিতে তাকে রূপায়িত করেছেন।[৭] বাস্তবতার আলোকে উপন্যাসটি রচিত হওয়ার কারণে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ঔপন্যাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজ চোখে যা কিছু দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তা তার অভিজ্ঞতার পরিধিতে সীমাবদ্ধ করে উপন্যাসে রূপ দান করেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী বাঙালির ঘরবাড়ি পোড়ানো, হত্যা, লুণ্ঠন ছাড়াও নারী ধর্ষণের মত জঘন্য কাজ করেছে। সহজ সরল বাঙালি রমণীদের উপর তারা পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে।[৮] 'রাইফেল, রোটি, আওরাত' উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাসের নামের অর্থপূর্ণ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। পাকিস্তানি সেনা বাহিনীদের যে জীবনবোধ সেটা 'রাইফেল, রোটি, আওরাত' নামের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। পাকিস্তানি সেনা বাহিনী রাইফেল ধরে বাঙালিদের খতম করেছে। রুটি খেয়ে তারা শরীরের শক্তি অর্জন করেছে। আর বন্দী শিবিরে নারীকে রেখে মনোরঞ্জন

---

[৬] *তদেব।*

[৭] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৩১২।

[৮] বেবী মওদুদ, *বাংলাদেশের নারী* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৪৮।

করেছে। বন্দী শিবিরে আটককৃত বাঙালি রমণীদের উপর নির্যাতনের একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

> শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সামরিক অফিসারদের জন্য একটি গণিকালয় স্থাপন করা হয়েছে। ... দিনের বেলা দাসী বৃত্তি এবং রাতে গণিকাবৃত্তি এই দুই কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে। সেখানে তাদেরকে শাড়ি পরতে দেয়া হয় না কেবল ছায়া পরে থাকতে হয়। পাছে কেউ গলায় ফাঁস পরে আত্মহত্যা করে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।[৯]

এই উপন্যাসে বন্দী শিবিরে আটককৃত রমণীদের প্রতিচ্ছবি বীরাঙ্গনা পলি, রোজী, রোশেনা। পলি চিত্রশিল্পী আমনের স্ত্রী। স্বামী সন্তান নিয়ে খুব সুখের সংসার ছিল পলির কিন্তু পাকিস্তানি সর্বগ্রাসী হায়ানার দল তার সে সুখকে গ্রাস করে নিয়েছে। পাকসেনারা পলিকে ধরে এনে গণিকালয়ে রেখেছিল। শারীরিক- মানসিক নির্যাতন পলিকে সর্বংসহা নারীতে পরিণত করেছিল। স্বামী-সন্তান- সংসার হারিয়ে পলির বেঁচে থাকার ইচ্ছাটুকু শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাঙালি রমণী পলি সবকিছু হারিয়েও ক্ষান্ত হয়নি। প্রতিশোধস্পৃহা তার মনে দানা বাঁধে। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকে পলি। চোখের সামনে তার তিন বছরের শিশুকে গুলি করে হত্যার দৃশ্য কিভাবে ভুলে যাবে পলি? প্রতিশোধ আর প্রতিরোধ তাকে নতুন উদ্যমে দাঁড় করিয়ে দেয় নতুন মাত্রায়। কলেজ জীবনের নাট্যমঞ্চের অভিনয় অভিজ্ঞতা নতুনভাবে শুরু করে বাস্তব জীবনের অভিনয়। তাই প্রতিজ্ঞা করে অন্তত একটি মাত্র পাকিস্তানি সেনাকে মারতে পারলে কিছুটা প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। সে ইচ্ছায় একজন পাঞ্জাবী অফিসারের সাথে শুরু করে প্রেম অভিনয়। ছলনার বেড়াজালে আটকে ফেলে পাঞ্জাবী অফিসারকে। পলির প্রেমের জালে আটকে পড়ে পাঞ্জাবী অফিসার তাকে ক্যান্টনমেন্টের গণিকালয় থেকে উদ্ধার করে এনে রাখে শহরের এক ধনী লোকের বাড়িতে। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস দেখে পলি অবাক হয়ে যায়। তারই প্রিয় বান্ধবী হালিমার বাড়িতে আশ্রয় পায় পলি। যে হালিমা সুন্দরী হওয়ার কারণে ধনী লোকের সাথে বিয়ে হয়েছিল। পাক হানাদার বাহিনী নিষ্ঠুরতার আঘাতে গ্রাস করে ফেলে হালিমার সুখের সুন্দর সাজানো গোছানো সংসারকে। হালিমার সংসারের এ দুর্দশা দেখে স্মৃতি আবারও নতুন করে জ্বালা ধরায় পলির মনে। হালিমার সন্তানের দোলনা, হালিমার সংসারের আসবাব দেখে পলির মনে হাহাকার শুরু হয়। পলি হিসেব মিলাতে পারেনা পাকিস্তানি শকুনের দল এরকম আর কত সংসারের সুখ কেড়ে নিয়েছে, আর দেরী করেনা পলি। ছলে, বলে, কৌশলে পাঞ্জাবি অফিসারকে অতিরিক্ত মদ পান করিয়ে মাতাল করে তোলে। তারপর মাতাল অফিসারকে বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পলি। কিন্তু এতে তার মনের জ্বালা মেটেনি। সাংবাদিক নাজিম হোসেনের কাছ থেকে একটি মাইন সংগ্রহ করে সুযোগ বুঝে বুকে বেঁধে মিলিটারী ভর্তি ট্রাকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ তিরিশ জন পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর জীবন নিয়েছিল পলি তার প্রাণের বিনিময়ে।

---

[৯] আনোয়ার পাশা, *রাইফেল, রোটি, আওরাত* (ঢাকা: *আওরাত* ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৭৩), পৃ. ৭৬।

পলির ছোটবোন রোজিকেও ক্যান্টনমেন্টের গণিকালয়ে ধরে এনেছিল পাকসেনারা। অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর- সে পরিণতিই হয়েছিল রোজির। নিজের জীবনের এই নিষ্ঠুর পরিণতি তার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। রোজি মেনে নিতে পারেনি জীবনের এই নির্মমতাকে। তাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারী ঠিক কতটা পাকসেনাদের মনোরঞ্জনের কাজে আসবে সেটা প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়। তাই পাকসেনারা তাকে রাস্তায় বের করে দেয়। ছোটবোন রোজির এ পরিণতিই পলিকে আরো বেশি উৎসাহিত করে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে। পলি জানতো পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে পাকিস্তানি সেনাদের কিছুই যায় আসে না। আরো কত নারীকে এনে রোজির স্থান তারা পূরণ করবে কিন্তু রোজিতো তার জীবনের হারানো অমূল্য সম্পদ ফিরে পাবে না। তাই এরকম এক দুঃসাহসিক কাজ করে পলি নিজের জীবনের ক্ষতিপূরণ না হোক তার জীবনের পরিণতির জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে অন্তত কিছুটা হলেও প্রতিশোধ নিয়েছে।

'রাইফেল, রোটি, আওরাত' উপন্যাসের আর একটি উজ্জ্বল চরিত্র রোশেনা, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> বাঙালি হত্যার শোধ নিতে শরীরে মাইন জড়িয়ে শত্রুসেনার ট্যাঙ্কের নীচে আত্মাহুতি দিয়েছিল সেই বীরদর্পিনী বঙ্গললনা। রোশেনা তাই বাঙালির ঘরে একটি রূপকথার নাম। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি নবাগত শিশুর কাছে রূপকথার মতোই সমাদৃত হবে রোশেনার কাহিনী।[১০]

বীর নারী রোশেনারা বেগম সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়ে শহীদ হন মুক্তিযুদ্ধে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী ছিলেন একাত্তরে। বুকে মাইন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পাক হানাদারদের ট্যাঙ্কের ওপর। ২৫ মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে যে রাতে মানুষ নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছিল বর্বর পাক হানাদাররা, সে রাতেই প্রতিশোধে নেমেছিলেন রোশেনারা। নিজের দেহকে ছিন্নভিন্নকরে তিনি ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছিলেন একপ্ল্যাটুন ট্যাঙ্ককে। *রাইফেল, রোটি, আওরাত* উপন্যাসের পলি বা রোশেনা এরা কেউ সম্মুখ যুদ্ধ করেনি কিন্তু নিজের জীবনের বিনিময়ে শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করতে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা সম্মুখ যোদ্ধাদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। ইতিহাসের পাতা থেকে এরকম অনেক নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা অকুতোভয় সৈনিক। নারী হয়েও পাকসেনাদের প্রতিহত করতে তারা এতটুকু পিছু হটেননি। তাদের মনের অভিপ্রায় ছিল 'মরতে যখন হবেই তখন শত্রুবাহিনীকে মেরেই মরা ভাল।[১১] বাঙালি নারীরা নির্যাতিতা, নিপীড়িতা হলেও তারা যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য

---

[১০] আনোয়ার পাশা, *তদেব*, পৃ. ৭৮।
[১১] মালেকা বেগম, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৩।

আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তা বীরাঙ্গনা পলি, বীরাঙ্গনা রোশেনা কিংবা অজ্ঞাতনামা ধর্ষিতা মেয়েটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে।[১২]

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাতে মহিলাদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মুক্তিযুদ্ধ সময়ে তাদের ভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়। অনেক মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের অস্ত্রচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। মুক্তিযুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঘটে নানাভাবে। এক দিকে যেমন তারামন বিবি (বীর প্রতীক), কাঁকন বিবি, রহিমা বেগমদের মত অনেকে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অপরদিকে সহযোদ্ধা হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করে ও মুক্তিযোদ্ধাদের আতিথ্য প্রদান ও তথ্য সরবরাহ করেও যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অগণিত মহিলা। অনেক মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ, বস্ত্র ও ওষুধপত্র সংগ্রহ করে তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে আর এক শ্রেণীর নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যে নারী এদেশীয় রাজাকার দ্বারা নির্যাতিত। এদেশীয় রাজাকারদের পাকসেনাদের সাথে হাত মেলানোর পিছনে যে কয়েকটি স্বার্থান্বেষী কারণ নিহিত তার মধ্যে বাঙালি নারীর প্রতি লোলুপ আচরণ একটি। রাজাকার বাহিনী জানতো পাকসেনাদের দালালী করলে তারা সব দিক থেকে যেমন লাভবান হবে তেমনি নারী ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজ করতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। এ কারণে তারা নিম্ন শ্রেণির নারীদের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করেছে। নানা রকমের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মনোবাসনা পূরণ করেছে। *রাইফেল, রোটি, আওরাত* উপন্যাসে সোবহান মৌলভি তার গরিব প্রতিবেশী করিমন বিবির প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছে। বিধবা নারীর একমাত্র পুত্র উনিশ শো পয়ষট্টি সালের যুদ্ধে যেয়ে আর ফিরে আসেনি। সন্তান হারা করিমন বিবি যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন সোবহান মৌলভি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, প্রলোভন দেখিয়ে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। "সেই রাতে যখন দুনিয়া ফানা হওয়ার যোগাড় তখনি মৌলভী সাব সেই কামটা করল। না, সে বাধা বড় একটা দেয়নি। সাদী করবে বলে কথা দিয়েছে যখন তখন আর বাধা দিয়ে লাভ কি?"[১৩] বাঙালি নারীদের মধ্যে এমন অনেক করিমন বিবি আছে যাদের হয়তো সংখ্যায় গণনা সম্ভব নয় কিন্তু এরা পাক হানাদার বাহিনী নয় এদেশীয় নরপিশাচ দ্বারা নিষ্পেষিত। নারীর জীবনের সাথে, নারীর দরিদ্রতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে যৌবন বঞ্চনার শিকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, নারীর দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে পুরুষ সমাজ নারীকে নানাভাবে নিপীড়ন করে। করিমন বিবি সোবহান মৌলভির কুদৃষ্টির শিকার হয়েছে। অভাবের তাড়নায় করিমন মৌলভির বাড়িতে গেলে মৌলভি তার কুপ্রবৃত্তি পূরণের আশায় নানা ধরনের প্রলোভন দেখায়। নারীর প্রতি নির্যাতন, নিপীড়নের অন্যতম কারণ তার

---

[১২] আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের উপন্যাস নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১৬৮।

[১৩] আনোয়ার পাশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

শরীর। শারীরিক সৌন্দর্য বা মোহনীয়তার কারণে বিভিন্ন সময়ে নারীকে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ যখন চলেছে তখন বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের ভয়াবহ পাশবিক ঘটনা ঘটেছে ব্যাপকভাবে। পাকবাহিনীর বাংকারে, বন্দী শিবিরে, রাজাকারের হাতে নারী নির্যাতনের চিত্র ছিল সর্বত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী জনগণের অর্ধাংশ হিসেবেই সমাজে, পরিবারে, দেশে এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন ছিল তেমনি ছিল শরণার্থী শিবিরে, বাংকারে, বন্দী শিবিরে। স্বদেশ প্রেম, আত্মপ্রেম, বাঁচার প্রয়াস, কর্মকুশলতা- এসব কিছুই একাত্তরের নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারূপে।[১৪] উপন্যাসে সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় অনুপস্থিত কিন্তু বন্দী শিবিরে আটককৃত বা বাইরে নারী নির্যাতন, অত্যাচারের যে রূপ তা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করে দেয় পাক হানাদার বাহিনীর পৈশাচিকতার। মানুষ হয়ে কিভাবে মানবিকতা শূন্য হতে পারে তা পাকিস্তানি সৈন্যরা দেখিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত হারানো আর নিপীড়নের ইতিহাস উপন্যাসের পাতায় ঔপন্যাসিকরা তুলে ধরেছেন যা কিনা পাঠ কালে পাঠকচিত্ত বাকরুদ্ধ হতে বাধ্য। বিশেষ করে নারী নির্যাতন আর বলাৎকারের মর্মস্পর্শী ও করুণ আহাজারিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পাতা ভারি হয়ে আছে।[১৫]

শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩) উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের একটি অনন্য দলিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী বাঙালি নারীদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল তারই সত্যময় চিত্র ধরা পড়েছে *নেকড়ে অরণ্য* উপন্যাসে।[১৬] টিনে ছাওয়া দালান ঘর, যে ঘরটি কয়দিন পূর্বেও ছিল সিভিল সাপ্লাইজের বিরাট গুদাম। সমস্ত ঘর জুড়ে একটি মাত্র ষাট পাওয়ারের লাইট জ্বলে। এই ঘরটিতে প্রায় একশো নারীর বাস। ঔপন্যাসিক এ গুদাম ঘরটির নাম দিয়েছেন অরণ্য। যে অরণ্যের নারীদের অবস্থা এরূপ:

> গুদামের পোস্তার উপর শতশত বস্তা সারি সারি থাকে সাজানো থাকতো কদিন পূর্বে। আজ সারি সারি মানুষ শুয়ে আছে। অবিশ্যি স্তর অনুপস্থিত। কারণ, কারো উপরে কেউ শুয়ে নেই। একদম সিমেন্টের উপর, যাদের মানুষ বললাম, তারা শুয়ে আছে, মানুষের মধ্যে যাদের মানবী বলা হয়। কেউ সটান। কেউ কুকড়ে গেছে শীতের রাত্রের কুকুরের মতো। নিজের পেটের মধ্যে মুখ। চার জন শুধু উপবিষ্ট। তারা প্রায় ঐ ভঙ্গি অনুযায়ী বসে থাকে। ঘুমের প্রয়োজন হয়ত এইভাবে মেটে না। কিন্তু বিশ্রাম ঘুম ইত্যাদি শব্দ এই জগতে অবান্তর। এখানে অস্তিত্ব আছে- এই কথাটাই বড়।[১৭]

এই একশো রমণীর মধ্যে মোটামুটি পাঁচ জন নারীর কথোপকথোন ও অবস্থান নিয়ে উপন্যাসটি আলোকপাত করা হয়েছে। তানিমা, জায়েদা, আমোদিনী, সখিনা ও চাষি বৌ

---

[১৪] মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[১৫] অনীক মাহমুদ, *সাহিত্যে সাম্যবাদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

[১৬] অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান* (রাজশাহী: ইউরেকা বুক এজেন্সী, ১৯৯৫), পৃ. ১৭৪।

[১৭] শওকত ওসমান, *উপন্যাস সমগ্র*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ১৮।

প্রৌঢ়া নারী রশীদা বিবি এই পাঁচ রমণীর অতীত স্মৃতি আর বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কথা উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে। এই নারীদের সবাই ছিল শোকে, দুঃখে, অত্যাচারে জর্জরিত। বন্দিনী নারীদের প্রত্যেকেই প্রায় উলঙ্গ। শত নারীর বিবস্ত্রের রাজ্যে চারজন মাত্র ছায়া পরা। 'আর যে দিকে তাকাও স্বর্গীয় উদ্যান এখানে আদম অনুপস্থিত। সবাই এখানে ঈভ।'[১৮] প্রত্যেকের উপরেই পাকিস্তানি নেক্‌ড়েরা পাশবিক নির্যাতন চালায় প্রতি রাতে। কয়েদী জীবনে হয়তো কয়েদীদের অভিযোগ থাকে কিন্তু এই নারীদের কোন অভিযোগ নেই। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়:

> কোনোদিন রাত্রে যখন আলী খান এবং তার সঙ্গীরা এখানে শিকার বাইরে নিয়ে যেতে আসে, কোনো শব্দ ওঠেনা। কোরবানির ছাগলের মতো বিবস্ত্র রমণী হেঁটে চলে যায়। সকলে ভ্যালভ্যাল তাকায় মাত্র। যেদিন পরিখার মধ্যে মাতাল সিপাইরা বাসর শয্যা বানায় সেদিন স্তব্ধতা এই রাজ্যে ভর করে বসে থাকে। শব্দ হয় বৈইকী, তা দাঁতে দাঁতে ঘষার শব্দ। ... সচেতন এখানে কেউ শব্দ করে না।[১৯]

এই নেক্‌ড়েদের অরণ্যে বাসকারী কোন নারীর আহার নিদ্রার তাড়া নেই। আহার নিদ্রা নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথাও নেই। 'কিছু ডাল রুটি বা সাধারণ ব্যঞ্জন আসে। তার উপর কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে না।'[২০] বিরাট গুদাম ঘরে শত বন্দিনীর আবাসস্থল হলেও পাঁচজন নারী পরস্পর দুঃখ দুর্দশায় একে অপরের সহমর্মীতা প্রকাশ করেছে। একমাত্র রশীদা বিবি ছাড়া বাকী চারজন ছিল শিক্ষিতা, ভদ্র ঘরের কন্যা, স্ত্রী। উপন্যাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, দুই সন্তানের জননী তানিমা সদাগরি ফার্মের অফিসার নূর আহসানের স্ত্রী। পাক হানাদার বাহিনী যখন হন্যে হয়ে শহর ছেড়ে গ্রাম গ্রামান্তরে ফিরছে তখন তানিমা স্বামী- সন্তান নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করে। পথের মাঝেই পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। পাঁচ-সাত বার হাতবদলের পর এই নেক্‌ড়ে অরণ্যে অবস্থান। আমোদিনী রায় পাঁচ বছরের এক সন্তানের জননী। কালো বর্ণের এই নারীর শরীরের গঠন হালকা পাতলা তার স্বামী একজন ডাক্তার। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গ্রামে অপারেশন চালালে আমোদিনী স্বামী সন্তান থেকে আলাদা হয়ে যায়। জায়েদা সবেমাত্র কৈশোর পার করেছে। সখিনা ছিল নব যৌবনা। সে ভাল বাসতো আজাদকে। সখিনা স্বভাবে ছিল সৌখিন প্রকৃতির। খাটো আকৃতির গ্রাম্য চাষি বৌ রশীদা। প্রৌঢ়া এই রমণীর বয়স পঞ্চাশের উপরে। অরণ্যবাসী এই রমণীদের সবাইকেই মানবেতর দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হয়েছে, দুঃসহ যন্ত্রণা তাদের বুকে। রশীদা বিবি এমন দুর্দিনে নামাজ পড়তে চাইলে বন্দিনীদের কাছে তা পরিহাস মনে হয়। বন্দিনীদের ধারনা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লা থাকলে এমন পরিণতি তাদের হতো না। রশীদা বিবি বুঝতে পেরে আপন মনে বলে যান:

---

[১৮] *তদেব*, পৃ. ২০।
[১৯] *তদেব*, পৃ. ২৫।
[২০] শওকত ওসমান, *তদেব*, পৃ. ২৩।

> নসিব দ্যাহেন বুজানরা। বুড়াকালে আল্লা আল্লা কইরা মত্ততের নজদিগ যামু। পোলাপানরা কাইন্দে তুইল্যা ও গোরস্তানে দিয়া যাইব। অহন ...'[২১] রশীদা বিবি স্মরণ করে তার সাংসারিক জীবনের কথা, তার স্বামীর মৃত্যুর স্মৃতি, ছেলে, ছেলে বউ নাতি-নাতনীদের কথা। এই রশীদা বিবির বয়সী নারীদের নাতি-নাতনী নিয়ে সুখে দিন কাটানোর কথা কিন্তু পাক হানাদার বাহিনীর পৈশাচিকতার কাছে সবকিছুকে নতজানু হয়ে থাকতে হয় তাই রশীদা বিবির মতো পঞ্চাশের উপরে নারীকে বন্দী শিবিরে আটক থেকে শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। পাকবাহিনীর কাছে মা-বোনের কোন পার্থক্য ছিল না, ছিলনা বয়সের কোন অজুহাত, তাদের কাছে একমাত্র পরিচয় ছিল রক্তমাংশে গড়া নারী। ক্যাপ্টেন রেজা খান টানা-হেচড়া করে জবরদস্তি করে লাঞ্ছনা করতে চাইলে প্রৌঢ়া রমণী রশীদা বিবি বলে, 'তুমি আমার পোলার লাহান- আমার তুমি বা-জান।[২২]

এত মিনতি করেও রেহাই পায়নি রশীদা বিবি। ক্যাপ্টেন রেজা খান তার পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। তানিমা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের প্রতি ঘৃণামূলক ক্ষেদোক্তি করে বিভিন্ন রকম বাক্য ছোড়ে। পরিণতিতে পাকবাহিনীর ক্যাপ্টেন তানিমাকে গুলি করে হত্যা করে। তানিমার এই পরিণতি প্রমাণ করে বাঙালি নারীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতটা প্রতিবাদী হতে পারে নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও ইজ্জত রক্ষায় তারা তৎপর।

এত অত্যাচার, নির্যাতনের কষাঘাত তবুও বাঙালি রমণীরা প্রত্যাশা করেছে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের। বন্দিনী অবস্থাতে আশা করেছে তাদের স্বামী বা প্রেমিক পুরুষকে যোদ্ধা হিসেবে দেখবে। সখিনা মনে মনে আশা করে তার প্রেমিক আজাদ যুদ্ধ করবে, বলিষ্ঠ বাহুতে রাইফেল ধরে শত্রুদের মোকাবেলা করবে। সখিনা নিজের মনে আজাদকে নিয়ে বলতে থাকে-

> তুমি এখন কোথায়? মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়েছো নিশ্চয়। ... আর কখনো যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় এবং আমি জানতে পারি, তুমি তোমার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে রাইফেল ধরনি, মর্টার ছোড়নি ... আমি তোমাকে তখন খারিজ করে দেব আমার বুক থেকে।[২৩]

গুদাম ঘরে বন্দিনী নারীরা বাইরের যুদ্ধের সংবাদ শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। বাংলার মানুষের যুদ্ধ জয়ের অপেক্ষায় থাকে। চাষি বৌ রশীদা বিবির কাছে যখন তারা জানতে পারে গ্রামে মুক্তি বাহিনী গড়ে উঠেছে তখন তারা যেন নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পায়। তারা যেন সুখের সঞ্জীবনী সুধা পান করে। আনন্দে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠেছে বন্দিনী সখিনা। বাইরে গুলি ছোড়ার শব্দ শোনে রশিদা বিবি সবাইকে ডেকে বলে, "হোনো। আমাগো পোলারা শুরু করেছে।"[২৪] কিন্তু তাদের সব স্বপ্ন কল্পনাকে নস্যাৎ করে দেয় ক্যাপ্টেন রেজা খান কর্তৃক তানিমাকে হত্যা। এই ঘটনা জায়েদা, আমোদিনী ও

---

[২১] *তদেব*, পৃ. ২৪।
[২২] শওকত ওসমান, তদেব, পৃ. ৫১।
[২৩] *তদেব*, পৃ. ২৭।
[২৪] *তদেব*, পৃ. ৩৪।

সখিনার মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে দুঃস্বপ্ন, মিথ্যে, অর্থহীন মনে হয়। তারা নিঃশব্দ, বাকরুদ্ধহীন দিন কাটাতে শুরু করে। বেঁচে থাকার শেষ ইচ্ছাটুকু তারা ত্যাগ করে। আমোদিনী জায়েদা আত্মহত্যা করে। পরিধানের ছায়ার ফিতা খুলে ঘরের থামের হুকের সাথে ফিতা বেঁধে তারা ফাঁস নেয়। সখিনা আমোদিনী আর জায়েদার ফাঁস দেখে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয় আত্মহত্যার। সখিনা তার সখ করে রাখা আঙ্গুলের নোখগুলো দিয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বন্দী জীবনে তিন মাসে নোখগুলো আরো অনেক বড় হয়েছে যার তীক্ষ্ণতা ছুরির চেয়ে কম নয়। সখিনা ছায়ার ফিতাটা একটানে খুলে ফেলে। উপন্যাসের বর্ণনায়:

> তল পেটে ধবধবে শাদা চামড়া। বড় আদরের সঙ্গে হাত বুলিয়ে দেখল সে। তারপর খোলা চোখেই নখটা এদিক ওদিক ছুরির ফলার মতো ঢুকিয়ে দিয়ে টান মারলে নিজের গোটা শক্তি দিয়ে। ফাঁক হয়ে গেছে পেট। এক হাতে চামড়া তুলে সে নখ শুদ্ধ ঢুকিয়ে দিলে সব কটা আঙ্গুল। ... নিজের পেটের মধ্যে সে সব কটা আঙ্গুল ঘোরাতে লাগল যেন বহু ক্লেদ গ্লানি বার করে তবে নিরস্ত হবে। ... জোর গঁ গঁ শব্দ উঠতে লাগল সখিনার মুখ থেকে। এক সময়ে সে পেটের মধ্যে ছায়া আর চেপে রাখতে পারছিল না। তখন রক্ত, আর্তনাদ একসঙ্গে ফিনকি দিয়ে বেরুতে লাগল।[২৫]

মানুষ কতটা জীবন থেকে বিমুখ হলে নিজেকে এতটা ক্ষত বিক্ষত করে মৃত্যুবরণ করে তা সখিনা প্রমাণ করে দেয়। ধনীর দুলালী সখিনার স্বপ্ন আশা সব ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে পাঞ্জাবী পশুদের দল। তানিমা, আমোদিনী, জায়েদা, সখিনার মত কত বাঙালি রমণীর জীবনকে যে তারা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তার হিসেব মেলা ভার। শওকত ওসমান নারীদের এ অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন নিবিড় চিত্তে তাই লেখনীর মাধ্যমে বাঙালি রমণীর অসহায়ত্বকে তুলে ধরতে পেরেছেন। শওকত ওসমান এটা জানতেন যে বাঙালি নারীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতটা প্রতিবাদ মুখর, সোচ্চার। বাঙালি নারী সম্পর্কে নেক্‌ড়ে অরণ্য উপন্যাসে পাকসেনার মন্তব্য "এসব বাঙ্গালি আত্তরত। একদম বাঙ্গাল কা শের কি তাহের (বাংলার বাঘের মত)।"[২৬] উপন্যাসের নাম *নেক্‌ড়ে অরণ্য।* যে বনে নেক্‌ড়ে বা হিংস্র বাঘের বসবাস, সেটাই নেক্‌ড়ে অরণ্য। এই অরণ্য ছিল একাত্তরের বাংলাদেশ। নেক্‌ড়েরা শিকার ধরে তাদের সঙ্গে প্রথমে খেলা করে। তারপর তাকে হত্যা করে রক্ত পান করে। গুদাম ঘরের বন্দিনী অসহায় নারীদের জীবন চিত্রণ লক্ষ্য করলেই নেক্‌ড়েরূপী পশ্চিমা নরখাদকদের পশুত্ব সম্যক উপলব্ধিতে আসে।[২৭] 'নেক্‌ড়ে অরণ্য' উপন্যাসটি পরিসরের দিক থেকে ছোট হলেও এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শওকত ওসমান ১৯৭১ সালে বাঙালি নারীদের দুঃখ, যন্ত্রণা, দুর্বিষহ জীবন ও তাদের পরিণতির বিষয় উপস্থাপন করেছেন। লক্ষ লক্ষ নারীর জীবনের ইতিহাসের কাছে *নেক্‌ড়ে অরণ্য* উপন্যাসের

---

[২৫] শওকত ওসমান, *তদেব*, পৃ. ৫৭।
[২৬] *তদেব*, পৃ. ১৬।
[২৭] অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭৭।

এ কয়জন নারীর জীবন যন্ত্রণা সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারী নিগ্রহ ও নারী নির্যাতন শওকত ওসমানকে হয়তো বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছে। তাই নারী নির্যাতনের চিত্রকে শওকত ওসমান প্রত্যেকটি উপন্যাসে ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। শওকত ওসমানের *দুই সৈনিক* (১৯৭৩) উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনের আর এক চিত্ররূপ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা যে বেঈমানের জাত তা এ উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। এদেশীয় বাঙালিরা (অল্প সংখ্যক) যে পাক বাহিনীর চাটুকাগিরি করেছে এবং তার প্রতিদানে পাকবাহিনী সেই শয়তানরূপী চাটুকারী রাজাকারকে কি প্রতিদান দিয়েছে তার সুন্দর উপস্থাপন 'দুই সৈনিক' উপন্যাস। একটি গ্রামীণ পরিবেশে উপন্যাসের কাহিনী উপস্থাপন করেছেন লেখক। হিজলতলী গ্রামের দুই মেয়ে চামেলী ও সাহেলীর বাবা হাজী মখদুম মৃধা গণতন্ত্রী চেয়ারম্যান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে শহর পড়ুয়া দুই মেয়েকে মখদুম মৃধা বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়ি এসে চামেলী ও সাহেলী পাকিস্তানি সেনা বাহিনী কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়। বাবা মুসলিম লীগার হওয়ার পরও রক্ষা করতে পারেনি চামেলী ও সাহেলীকে। মখদুম মৃধা পাকসেনার জন্য চাটুকারিতা করতে কোন দিক দিয়ে কম রাখেনি। পাক হানাদার বাহিনীর জীপ গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মৃধা তাদেরকে অনুরোধ করে চা খাওয়ার। এতে পাকসেনারা রাজী হয় এবং মৃধা তার দুই মেয়েকে নাস্তা তৈরীর কথা বলে। শহরের কলেজ পড়ুয়া চামেলী ও সাহেলী ছিল রন্ধনপটু ও নান্দনিক। অত্যন্ত সুন্দরভাবে পাকসেনাদের নাস্তা পরিবেশন করায় দুই বোন। পাকবাহিনীর দুই অফিসার চামেলী ও সাহেলীর অত্যন্ত যত্নে তৈরী করা নিমকি, ডিমের বড়া, আর ঘিয়ে ভাজা সিঙ্গাড়া খেয়ে প্রশংসা করে। প্রশংসা শুনে মখদুম মৃধা আনন্দে আপ্লুত হয়ে পাকসেনাদের রাতের দাওয়াত করে। পাকসেনা দুইজন চামেলী সাহেলীর খাবার তৈরীর নান্দনিকতা দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি। মেজর হাকিম ও ক্যাপ্টেন ফৈয়াজ রাজী হয়ে যায় রাতের দাওয়াতে। রাতে মোরগ পোলাও খেয়ে দুই অফিসার শুরু করে মদ্য পান করতে। এসময় তারা মৃধাকে তার দুই মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মৃধা তাতে রাজী না হলে করুণ পরিণতির সৃষ্টি হয়। পাকবাহিনী মৃধাকে আওয়ামী লীগার বলে বেঁধে ফেলে তার দুই মেয়েকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। এত আদর যত্ন করে খাওয়ানোর প্রতিদানে পাকসেনারা চামেলী, সাহেলীকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। সাহেলী পাকসেনাদের বলে "এহি ইস্‌সানিয়াৎ আপলোগ কা। এৎনা মেহনৎ করে খেলায়া পেলায়া।" [২৮]

চামেলী, সাহেলীর এরকম পরিণতির জন্য আমরা তাদের খুব একটা দায়ী করতে পারিনা। যদিও তারা পরম যত্নের সাথে পাকবাহিনীকে আপ্যায়ন করেছে। কিন্তু দুই বোনই মনে মনে ছিল আওয়ামীলীগের সমর্থক। তারা বাবার চোখের আড়ালে রেডিওর খবর শুনেছে, মুক্তিযুদ্ধের খবরে আতঙ্কিত হয়েছে। রেডিও শুনে উৎকণ্ঠাপ্রকাশ করে বলে, "রোজ

---

[২৮] শওকত ওসমান, *উপন্যাস সমগ্র*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ৩২৪।

অত্যাচারের যা কাহিনী শুনছি, আমার ঘুম হয় না।"[২৯] দাদীকে বলে দেশ যেন স্বাধীন হয় সেজন্য দোয়া করতে। মনে মনে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনায়:

> বাবা জোর করে তাদের গ্রামে এনেছিল পনরই মার্চ তারিখে। নচেৎ শহরময় উম্মাদনা ছেড়ে তাদের ঘরকুনো হওয়ার কোন বাসনা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছেলে মেয়েরা রাইফেল ছোঁড়া শিখছিল, কুচ্‌কাওয়াজ করছিল। সাহেলী সে-দৃশ্য নিজের চোখে দেখে ঢাকা নগর স্বেচ্ছায় পরিত্যাগের মত বান্দা নয়।[৩০]

চামেলী, সাহেলীর মতো অনেক নারীই ছিল যারা সুযোগের অভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেনি। বহু নারী ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের নেতা কর্মীদের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি।[৩১] তাই বহু নারী ছিল যারা ঘরে বসেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে, বিচলিত হয়েছে। শওকত ওসমান হয়তো সেই বোধ থেকেই দুই সৈনিক উপন্যাসের চামেলী, সাহেলীর চরিত্র উপস্থাপন করেছেন। বাবা মখ্‌দুম মৃধা রাজাকার হওয়ার কারণে তাদের স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপ লাভ করেনি বরং জীবনে নেমে এসেছে করুণ পরিণতি। দুধ কলা দিয়ে পুষলেও কাল সাপ যে সুযোগ পেলে ছোবল মারবে তারই উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় 'দুই সৈনিক' উপন্যাসে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শওকত ওসমানের *জলাংগী* (১৯৭৬) উপন্যাসের হাজেরা পাকসেনা কর্তৃক অত্যাচারিত। সে বাঁকাজোল গ্রামের সহজ সরল শ্যাম বর্ণের গ্রাম্য পরিবেশের মেয়ে। ভালবাসতো একই গ্রামের চাচাতো ভাই জামিরালিকে। এই ভালবাসাই তার জীবনের কাল হয়েছিল। ভালবাসার দাম দিতে তাকে পাকবাহিনী কর্তৃক নির্মম, নিষ্ঠুর হৃদয় বিদারক মৃত্যুর দিকে ধাবিত হতে হয়। *জলাংগী* উপন্যাসে পাক হানাদার বাহিনীর এক ঘৃণ্য অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মাত্র পনর বছরের মেয়ে হাজেরা যার দিন কাটতো দুষ্টুমির মধ্য দিয়ে। স্বপ্ন কল্পনার দোলায় দোলতো তার মন। দেশের দুর্দিনে কি করা উচিত একথা জামিরালি হাজেরার কাছে জানতে চাইলে হাজেরা একজন সত্যিকার দেশ প্রেমিকের মতোই জবাব দেয় "াশের মানষের মঙ্গল হয়, হেই কাজ করা।"হাজেরার প্রেমিক জামিরালি যুদ্ধে গেলে হাজেরাকে পাকসেনারা ক্যাম্পে তুলে আনে। পাকবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের পর জামিরালির সাথে হাজেরাকে শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করে। সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাক বাহিনীর নির্দেশে প্রেমিকের সাথে হাজেরার শারীরিক সম্পর্ক হয়। আর এ সম্পর্কের অপরাধে পাকিস্তানের ইসলামি আইনে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়। মেজর হাসেম এই বিচারের বিচারক হয়ে বিচার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে। ব্যভিচারের অপরাধে গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপন্যাসের বর্ণনায়:

---

[২৯] শওকত ওসমান, তদেব, পৃ. ২৭৬।
[৩০] *তদেব*, পৃ. ২৭৫।
[৩১] রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, পৃ. ৯৯।

> চারজন জওয়ান আসামীদের গলায় যথারীতি পাথর দুটো বুলিয়ে দিলে হাজেরা জামিরালি দুই জনে নীরব। হাত চোখ বাঁধা। পাথরের প্রতিমা উভয়ে। পাটাতনের কিনারায় তাদের দাঁড় করানো হলো।
>
> ... ...
>
> মেজর হাশেম ইঙ্গিত দিলে, শেষ ইঙ্গিত। এক ধাক্কায় দুই আসামি পাটাতনের কিনারায় চ্যুত হলো। তখনই সমস্বরে হাজেরা, জামিরালি চিৎকার দিয়ে উঠল ঃ জয় বাংলা। জয় ...।[৩২]

হাজেরা শত অত্যাচার সহ্য করে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছে কিন্তু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মূল মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। যে নদী ছিল শৈশবে খেলার সঙ্গিনী, যে ছিল যৌবনে মর্মের গৃহিনী, যার ঢেউ আবাল্য সখ্যতায় বহুকালের স্মৃতির উদগাথা সেই নদীর জলের মাঝে হাজেরার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৩৩] *জলাংগী* উপন্যাসের শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধের রক্তিম আবেগ রূপায়ণের প্রশ্নে আন্তরিক এবং অনেকাংশে সাফল্যস্পর্শী। বাঁকাজোল গ্রামের প্রতীকে তিনি যুদ্ধকালীন জীবন বাস্তবতার একটি সামগ্রিক চিত্র অঙ্কন করেছেন।[৩৪] *নেক্‌ড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক* এবং *জলাংগী* উপন্যাসে শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধের নারী নির্যাতনের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। তিনটি উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় চরিত্রের বিন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন। শওকত ওসমান তার এ বিশিষ্টতার কারণেই নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের অধিকারী।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পাক সেনা বাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধ, গণহত্যা, ধর্ষণ এসব অপরাধ শুরু করলে বাংলাদেশে কোন নাগরিকেরই নিরাপত্তা ছিল না। পাকসেনার গুলিতে প্রাণ হারানো নিত্যকার ঘটনা ছিল। নারীদের নিরাপত্তার অভাব শুধু প্রাণহানি নয়-সম্ভ্রমহানির জন্য ঘটে এই হচ্ছে চলতি ধ্যান-ধারণা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনাদের বর্বর নির্যাতন নারীর নিরাপত্তার অভাব ঘটিয়েছিল সর্বত্র।[৩৫]

রাবেয়া খাতুনের (জ. ১৯৩৫) *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৪) উপন্যাসের খালেদের স্ত্রী বকুলের স্বামী সন্তান নিয়ে সুখের কাব্যময় জীবন ছিল। স্বামীর অত্যন্ত আদরের স্ত্রী বকুল। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের পরে পাকসেনারা বাড়িতে এসে বকুলকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। দুই দিন শারীরিক নির্যাতনের পরে জীপে করে বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যায়। পাকসেনা কর্তৃক নির্যাতনের পর বকুলের অবস্থা ছিল এরকম:

> নখরাঘাতে ফালা ফালা, নিজেরই-রক্তে মাখামাখি এক টুকরো মাংস। নগ্ন, কিন্তু প্রাণের স্পন্দনে তখনো উষ্ণ। ওকে পাঁজাকোলে তুলে খালেদ অবাক হয়ে দেখলো যে বকুলের জন্য পরিবারে উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলোনা এই মুহূর্তে তার পাশে কেউ নেই।[৩৬]

---

[৩২] শওকত ওসমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
[৩৩] অনীক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।
[৩৪] রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা:অনন্যা, ২০০২), পৃ. ১১৫।
[৩৫] মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
[৩৬] রাবেয়া খাতুন, *মুক্তিযুদ্ধের সাতটি উপন্যাস* (ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৪), পৃ. ৩০৯।

বকুল তার স্বামীকে জানায় তাকে রেখে যাওয়ার সময় জীপের মধ্যেও পাকবাহিনীর পাশবিক অত্যাচারের কথা। *ফেরারী সূর্য* উপন্যাসের বকুলের মত অসংখ্য বাঙালি নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে যুদ্ধের সময়। যারা পরিবারে ফিরলে তাদের আর স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়নি। নারীদের সম্ভ্রম গেলে আর কি থাকে এরকম মনোভাব ছিল পরিবার সমাজের লোকদের। বাঙালি সমাজ পরিবেশে নারীর সতীত্বকে অমূল্য অলঙ্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান নারী প্রগতির যুগেও শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সতীত্ব সংস্কারের অর্গল একবিন্দু নড়েনি।[৩৭] তাই বাঙালি নিরীহ নারী যখন ধর্ষণের শিকার হয়েছে তখনই অনুভব করতে পেরেছে পরিবারে, সংসারে, সমাজে তার অবস্থান কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে। শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ নারী সেই কারণে আত্মহত্যাকে মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। *ফেরারী সূর্য* উপন্যাসের বকুলও বেছে নিয়েছে মুক্তির পথ হিসেবে মৃত্যুকে। যদিও বকুলের স্বামী খালেদ সাহেব পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বকুলের প্রতি নির্যাতনকে নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু বকুল ঠিক অনুভব করতে পেরেছে তার অবস্থান সম্পর্কে। শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর, ননদ হয়তো বাঁকা চোখে তাকাবে বকুলের দিকে, হয়তো সমাজের লোক চোখে আঙ্গুল দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিবে একে অপরের কাছে। বকুল জানতো সে বেঁচে থাকলে বাকী জীবনটা তার স্বামীর অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। যে জীবনে অন্যের অনুগ্রহের পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে হবে সে জীবন থাকাটাকে বকুলের কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। তাই বকুল করবী ঝোপের করবীর বিচি খেয়ে আত্মহত্যা করে। যে করবী চাঁদনী রাতে বকুলকে স্বর্গীয় সুখ দিয়েছে সে করবী বকুলকে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে সহায়তা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন বীরাঙ্গনা নারী পরিবারে, সমাজে ফিরে আসার পর পরিবার, সমাজ এই নারীদের গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে নারীর বেদনা আরো অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। দুর্ভাগ্যের জন্য তাদের দায়ী করার সামাজিক মনোবৃত্তির ফলে এসব নারীর দুঃখ বেদনা বহন করতে হয়েছে নীরবে, নিঃশব্দে। ১৯৭১ সালের পাকবাহিনীর পৈশাচিক আচরণ নারীর জীবনের ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছে তার প্রতিকৃতি হিসেবে রাবেয়া খাতুন তার 'ফেরারী সূর্য' উপন্যাসের বকুল চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ বকুলের জীবনের শিকড় নাড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ তার জীবনে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো এসে পিষে ফেলে গেছে তাকে। রাবেয়া খাতুন গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন নারীর লাঞ্ছনা, গঞ্জনার পরিণতি তাই বকুলকে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তে বাধ্য করেছে। শত শত নারীর এরকম মৃত্যু রাবেয়া খাতুন বকুলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন।

সৈয়দ শামসুল হকের (জ. ১৯৩৫) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১)। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বিলকিস। জলেশ্বরী গ্রামের আলেফ মাস্টারের মেয়ে। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় বিলকিস ঢাকা থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। স্বামী আলতাফ যুদ্ধে গেছে। সে মরে গেছে না বেঁচে আছে তা বিলকিসের অজানা। মা-বাবা-ভাই-বোনের খবর

[৩৭] অনীক মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

নিতে গ্রামে আসে বিলকিস। পথের মধ্যে সিরাজের সঙ্গে দেখা। উপন্যাসের শুরু থেকে প্রায় সিরাজের সাথে বিলকিসের সাহচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ সাহচার্য আবেগবর্জিত সাহচার্য। সিরাজের সাথে বিলকিসের সাহচার্যের মধ্যে ছিল না কোন কুপ্রবৃত্তিমূলক মনোভাব। মুক্তিযোদ্ধা মনসুরের নির্দেশে সিরাজ আসে বিলকিসের নিরাপত্তা রক্ষার্থে। সিরাজের সহায়তায় বিলকিস তার মা-বাবা, ভাই-বোনের খবর জানতে পারে। ছোট ভাই খোকাকে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করে হত্যা করে সে খবর জানে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে খোকার দাফনের জন্য। এ কাজে সহায়তা চায় সিরাজের। সিরাজ ও বিলকিস দিনে পাটের গোদামে থাকে আর রাতে মৃত লাশগুলোর দাফনের ব্যবস্থা করে। এক পর্যায়ে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে বিলকিস ও সিরাজ এবং অত্যাচার চলে তাদের উপর। পাকিস্তানি মেজর সবার সামনে বিবস্ত্র করে বিলকিসকে আর বিলকিসের চোখের সামনে হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধা সিরাজকে। এ ঘটনায় বিলকিসের প্রতিবাদী মন আরো বেশি বিষিয়ে উঠে। প্রতিশোধ নিতে কৌশলে সে সিরাজের লাশের সৎকার করতে চায় ও এ উদ্দেশ্যে মেজরকে নিয়ে নদীর পাড়ে যায়। বিলকিসের দেহের প্রতি আকৃষ্ট মেজরকে আস্তে আস্তে ধাবিত করে চিতার আগুনের দিকে। তারপর:

> মেজর এসে বিলকিসকে বলে, এরপর কি?
> বিলকিস সাড়া দেয় না।
> তার পেছনে নদীর জল হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।
> পোড়া মাংসের গন্ধে পেটের ভেতর থেকে সব উল্টে আসতে চায়, সে সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও। আগুনের প্রবল হলকা অনুভব করে।
>
> . . . .
>
> ঠিক তখন বিলকিস তাকে আলিঙ্গন করে। সে আলিঙ্গনে বিস্মিত হয়ে যায় মেজর। পর মুহূর্তেই বিস্ফারিত দুই চোখে সে আবিষ্কার করে, রমণী তাকে চিতার ওপর ঠেসে ধরেছে, রমণীর চুল ও পোশাকে আগুণ ধরে যাচ্ছে, তার নিজের পিঠ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রমণীকে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু রমণী কে আগুণ দিয়ে নির্মিত বলে এখন তার মনে হয়। তার স্মরণ হয়, মানুষ মাটি দিয়ে এবং শয়তান আগুন দিয়ে তৈরী। জাতিস্মর আতঙ্কে সে শেষবারে মতো শিউরে ওঠে। মশালের মতো প্রজ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ঠেসে ধরে রাখে বিলকিস।[৩৮]

নারীর জীবনের অমূল্য সম্পদ সম্ভ্রম, সে সম্ভ্রমহানি ঘটলে নারীর আর কোন মূল্য নেই এ কথা ভেবেই বিলকিস এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে পেরেছে। সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসের বিলকিস চরিত্রের সাথে আনোয়ার পাশার *রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসের পলি চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এরা দুজনেই নারী সুলভ মোহময়তা দিয়ে পাকসেনাদের হত্যা করে তাদের নির্যাতনের কিছুটা প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে এ শ্রেণীর নারীদের আমরা যোদ্ধা বলতে পারি নির্দ্বিধায়। বিলকিস বা পলিদের মতো নারীরা সম্মুখ যুদ্ধে অংশ না নিলেও পাকবাহিনী খতম করতে অনেকটা

---

[৩৮] সৈয়দ শামসুল হক, *উপন্যাস সমগ্র*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: অন্য প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ২৪১।

সহায়তা করেছে। সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও বিলকিসের মত মেয়েদের পারিপার্শ্বিকতার কারনে তা সম্ভব হয়নি।[৩৯] বিলকিস চেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মনসুরের সাথে থেকে যুদ্ধ করতে কিন্তু বিলকিসের শেষ পরিণতি তাকে সে পর্যন্ত এগুতে দেয়নি। বিলকিস জানতো না তার স্বামী বেঁচে আছে না মরে গেছে, পরিবার পরিজনের খবর জানে না, এই অবস্থায় বেঁচে থাকাটা তার কাছে মূল্যহীন তাই সে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসে নারী নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যায়। পাক সেনাদের লালসা বা রিরংসাবৃত্তির পরিচয়ও পাওয়া যায় এ উপন্যাসে।[৪০] জলেশ্বরীর প্রতীকে সমগ্র বাংলাদেশকেই যেন এ উপন্যাসে ধারণ করেছেন ঔপন্যাসিক। পঁচিশে মার্চ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ, ব্যক্তি ও সমষ্টির টেন্‌শান, অস্তিত্বময় জীবন অভীপ্সা রতির তীব্রতাকে শেষ পর্যন্ত ম্লান করে দেয়। 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসে বিলকিস ও আগুনের মধ্যে নির্দেশিত হয় গভীর প্রতীকী ব্যঞ্জনা।[৪১] দখলদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের ঘটনা নতুন বিষয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীতে, নারী নির্যাতনের বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তার দ্বিতীয় কোন নজির নেই।

১.৪ নারীর বাস্তবতা ও মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন পেশার নারীরা তাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে সেভাবে পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের বহু পূর্ব থেকে তথা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচিত হবার সময়কাল থেকেই বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকায় লিপ্ত ছিলেন এদেশের সচেতন নারী-পুরুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী সমাজকে, মাতৃহৃদয়কে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছিলেন বলে নারীরা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের নেত্রীবৃন্দ বেগম ফজিলাতুন্নেছা, বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমান, মমতাজ বেগম, রাফিয়া আখতার ডলি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। সাজেদা চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে একজন নেতার ভূমিকা পালন করেছিলেন, প্রীতিরাণী দাশপুরকাস্থ ৫ নম্বর সেক্টরের মহিলা মুক্তিফৌজের হাল ধরেছিলেন। তৎকালীন ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। বামপন্থি রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে ওঠা শিরিন বানু মিতিল যুদ্ধকালীন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অনার্সের ছাত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন সশস্ত্র ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। পাবনার পলিটেকনিক কলেজে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কন্ট্রোল রুম। নগরবাড়ীঘাটে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে, ওই কন্ট্রোল রুম থেকেই তা নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে ছিলেন শিরিন বানু মিতিল।

---

[৩৯] রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহেদী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০১।

[৪০] শহীদ ইকবাল, *রাজনৈতিক চেতনাঃ বাংলাদেশের উপন্যাস* (ঢাকাঃ সাহিত্যিকা, ২০০৩), পৃ. ১৫৪।

[৪১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩২৪।

এখান থেকে গ্রুপে গ্রুপে ছেলেদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পাঠানো হতো। শিরিন বানু মিতিলের সবসময় মনে হতো যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানেই থাকতে হবে এবং সবার সামনে থেকে যুদ্ধ করতে হবে। এ ভাবনাটি মাথায় কাজ করত বলে তিনি বলেন,[৪২]

> সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণের মানসিকতায় তাই তখন পুরুষবেশ ধারণ করেছিলাম। যুদ্ধ চলাকালে যখন শুনলাম পাবনার টেলিফোন ভবনটি পাকিস্তানি প্রায় ২৫ জন সেনা দখল করে নিয়েছে, তখন আমরা থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে পুরো টেলিফোন ভবন ঘিরে ফেললাম। আমার জানা মতে যার যা কিছু ছিল বঁটি, কাচি, দা– সব নিয়েই মোকাবেলার জন্য এগিয়ে এলো। টেলিফোন ভবনের ভেতরের সেনাদের সঙ্গে আমাদের সম্মুখযুদ্ধ পাকিস্তানি ২৫ সেনাকেই প্রাণ দিতে হয়েছিল।

ফেরদৌস আরা বেগম রুনু গেরিলা যুদ্ধের আরেক সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা। ২ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের বোন ফেরদৌস আরা ভাইয়ের গোপন নির্দেশে ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে টাইম বোমা স্থাপন করার মতো অসাধ্যটি সাধন করেন। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী সালোয়ার-কামিজ, বোরখা, ম্যাপ ও কাগজে প্যাঁচানো টাইম বোমাটি মুড়িয়ে তার ওপর আরো কাঁথা দিয়ে বাচ্চার দুধের কৌটা, ফিডারসহ দুধের অন্যান্য সরঞ্জাম দেয়, যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। তিনি বোরখা পরে দুধের শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে বাস্কেটটি হাতে বেরিয়ে যান অপারেশনের উদ্দেশ্যে। পরিকল্পনামতো ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে কর্মরত স্বামীর বন্ধু কুদ্দুস সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এবং কেঁদে-কেটে তাকে আর্থিক কষ্টের কথা জানায় এবং সঠিক সময়ের মধ্যে অপারেশনটি করতে হবে। তার ভাষায়,[৪৩]

> এজন্য বাচ্চাকে জোরে চিমটি কাটি। ও কেঁদে উঠলে বাচ্চা প্রস্রাব করেছে– এ কথা বলে বাথরুমে যাই। বাথরুমে এসে কল ছেড়ে দিই। লুকানো ম্যাপটি চোখের সামনে মেলে ধরি। তারপর ঝুড়ি থেকে বোমাটি বের করে মেয়েকে বাথরুমের এক কোণে রেখে ম্যাপ অনুযায়ী বাথরুমের পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের আর্কাইভ সেন্টারের দিকে যাই, যে বোর্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানি প্রশাসন পাকিস্তানের শান্ত-সুন্দর পরিস্থিতি তুলে ধরত বহির্বিশ্বে। সেখানে টাইম বোমাটি স্থাপন করে কাগজপত্র দিয়ে ঢেকে বেরিয়ে আসি। বাথরুমে ইচ্ছা করেই খানিকটা কাপড় ভিজিয়ে কন্যাকে কোলে তুলে ঝুড়িসহ দ্রুত বেরিয়ে এসে চলে আসি ... এমন সময় বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শুনতে পাই।

রেণু দাস '৭১-এ গৌরনদী কলেজে প্রথম বর্ষে পড়তেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তাকে উজ্জীবিত করেছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। "মরা ১৩ জন নারী ট্রেনিং নিয়েছিলাম। স্টেনগান, ছোট বন্দুক, পিস্তল, টাইমবোমা, গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছে আমাদের সঙ্গে বীথিকা বিশ্বাস, মিনতি ও রমা দাস। রমাদি ছিলেন আমাদের টিম লিডার।"একাত্তরে কলেজ ছাত্রী বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কণা এপ্রিলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। তারা এখানে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ নেন। একবার বুলেটের অভাবে বীথিকা

---

[৪২] *যুগান্তর*, ৬ মার্চ ২০০৯।
[৪৩] *যুগান্তর*, ৬ মার্চ ২০০৯।

বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারেন দু'জন রাজাকারকে। ১১ জুলাই সবচেয়ে বড় অপারেশনটি করেন তারা। সেটি ছিল পাকবাহিনীর গানবোটে গ্রেনেড চার্জ। গ্রেনেড চার্জ করার আগ্রহ দেখালেন বীথিকা এবং শিশির কণা। বৃষ্টিভেজা রাতে কোমরে হ্যান্ড গ্রেনেড বেঁধে নৌকায় ওঠেন তারা। কিছুদূর এগিয়ে নৌকা থেকে নেমে সাঁতরে গানবোটের দিকে এগিয়ে যান দুই তরুণী। কচুরিপানার আড়ালে অল্প অন্ধকারে ভেসে ভেসে পৌছান লঞ্চের কাছে। মুহূর্ত দেরি না করে দাঁতে গ্রেনেডের রিং চেপে ধরে টান দিয়ে ছুঁড়ে মারলেন ইঞ্জিন লক্ষ্য করে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকবাহিনীর গানবোট। বীরত্ব হাসি হেসে উঠল বীথিকা আর শিশির কণা। আশালতা বৈদ্য নিজে ৪৫ জন সাহসী নারীকে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গে একটি নারী মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে তুলেছিলেন। যারা ছোট-বড় ২২টি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। লুতফা হাসীন রোজী, নাজমা শাহীন বেবী দুই বোন বেয়নেট চার্জ করে রাজাকারকে হত্যা করেন। পরে মুজিব বাহিনীর উত্তরবঙ্গের ক্যাম্পে চলে আসেন এবং সম্মুখযুদ্ধে অংশ নন। নাজিয়া ওসমান চৌধুরী স্বামীর সঙ্গে যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সম্মুখযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

বীরপ্রতীক তারামন বিবির কথা তো সবারই জানা। যিনি অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন পুরো নয় মাস। গ্রামের নিরক্ষর এই নারী কোদালকাঠি, রাজীবপুর, তারাবর, সাজাই, গাইবান্ধা অঞ্চলের সাত-আটটি যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করে মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তার প্রথম যুদ্ধ ছিল ১১ নম্বর সেক্টরে। বীর প্রতীক ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম কুমিল্লা হতে ৭ কি. মি. দূরে ভারতের বিশ্রামগড় এলাকায় ব্যানার্জী বাবুর আম বাগানে বাঁশের চাটাই দিয়ে হাসপাতাল তৈরী করে অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। কাঁকন বিবি মুক্তিযুদ্ধের আরেক কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা। নিরক্ষর এই নারীও অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেন সিলেট অঞ্চলের স্থানীয় কমান্ডারের নেতৃত্বে। মহরতপুর, কাঁদাগাঁও, বসরাই, টেংরিটোলা, দোয়ারাবাজার, শিলাইড়পাড় ইত্যাদি সম্মুখযুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এক পর্যায়ে তিনি হানাদারদের হাতে বন্দি হন এবং কয়েকদিন পর কৌশলে পালাতে সক্ষম হন। মেহেরুন্নেসা মীরা ও হালিমা খাতুন গ্রাম-বাংলার আরো দুই সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধা। এ ছাড়া আরো অসংখ্য সাহসী নারী যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেন, যাদের নাম আমরা জানি না, জানার চেষ্ঠাও করা হয়নি সেভাবে। সীমিত পরিসরে দু'একজন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক তুলে এনেছেন কিছু নারীর চিত্র। আমরা সেসব নারীকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। বাঙালি নারীদের এই ইতিহাস, অবদান উপন্যাসে সঠিকভাবে ঔপন্যাসিকগণ তুলে ধরতে সক্ষম হননি।

১.৫ উপসংহার

চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের সাহিত্যে রয়েছে নারীর সচল অবস্থান। বিভিন্ন সময়ে নারীর রূপ সৌন্দর্য, নারীর মনো প্রবৃত্তি, নারীর সাংসারিক চালচলন নিয়ে লেখা হয়েছে। কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপন করেছেন নারীদের। কিন্তু ১৯৭১ সালের ভয়াবহ যুদ্ধ কবি-সাহিত্যিকদের মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে

দিলো, ফলে তাদের লেখনী পেল ভিন্ন মাত্রা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবে নারীকে উপস্থাপন করার কথা অধিকার বঞ্চিত নারী হিসেবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে নারীরা ঠিক সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে দেখা যায় যে নারীকে মুক্তিযুদ্ধের আলোকে পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নারীদের দেখানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার অবস্থান, যুদ্ধে তার ভূমিকা ও নির্যাতন নিপীড়নের প্রতিরূপ হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, নারী নির্যাতন, এক কথায় বাস্তবতার আলোকে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে উপন্যাসে। যুদ্ধের সময় নারীর নির্যাতন, নিষ্পেষণ, অভিভাবক ছাড়া নারীর সংগ্রামী দিনগুলোর কথা ঔপন্যাসিকগণ তাদের উপন্যাসে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন ঠিক সেইভাবে নারীর যুদ্ধ কাহিনী উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। পুরুষের তুলনায় নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কম ছিল একথা ঠিক কিন্তু নারীরাও যে স্বশরীরে অস্ত্রযুদ্ধ করেছেন, সম্মুখ যুদ্ধ করেছেন সে বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত। বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধে নারীরা পুরুষের সাথে থেকে তাদের সেবা শুশ্রূষা করেছেন, খাদ্য, পোশাক সরবরাহ করেছেন, সাথে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে করেছেন। দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী নারীর ত্যাগ ও সাধনা ও বীরত্বের কথা সঠিকভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন হয়নি। তবু ঔপন্যাসিকগণ তাদের উপন্যাসের মাধ্যমে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, ত্যাগ ও সাধনার কথা যেটুকু উপস্থাপন করেছেন তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জানতে অনেক সহায়তা করে।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

সেলিনা হোসেনের যুদ্ধ উপন্যাসে ইতিহাস ও নারী

শামীম আরা*

Abstract: Selina Hossin presents the valiant role of women in the liberation war of 1971 in many of her novels. Her *Juddha* (1998) is a novel that shows how women made equal contribution to the war like that of men. In *Juddha,* Taraman, the major female character participated in frotnline war and defeated many Pakistani soldiers. In the novel Makhan and Benu are freedom fighters, both playing equal role. Benu sacrified the greatest treasure of womanhood, her veginity, but does Benu's dignity rests in her state as 'Birangana.'? In this article the author examines how Selina Hossain tries to find an answer to this question in *Juddha*.

ৎভূমিকা

সেলিনা হোসেন (জন্ম : ১৪ জুন ১৯৪৭) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অঙ্গনে সুপরিচিত নাম। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একজন। দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে ইতিহাস বা সমাজবোধ না থাকলে অতীতের কোন পটভূমির আশ্রয়ে গড়ে ওঠা কাহিনির মধ্যে বাস্তবতা বা প্রাণ সঞ্চারিত হয় না, সুতরাং আধুনিক ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টির মূলীভূত যে শক্তি, তার উৎস নিহিত থাকে ইতিহাস বা সমাজ দর্শনের গভীরে। সেলিনা হোসেনের ঐুদ্ধ উপন্যাসে বাঙালির জাতীয় চরিত্রের ইতিহাস খুঁজলে আমরা দেখতে পাই, গ্রামীণ প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা সরল-সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস, প্রখর আবেগ, অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি, উদারনৈতিক সহিষ্ণুতার প্রবৃত্তি রক্তে মিলেমিশে একাকার। অন্যদিকে কুটিল স্বার্থান্বেষী চক্রের কালো থাবায় জাতি দিশেহারা। আবার কখনও পোড়খাওয়া জীবনে অস্তিত্বের প্রশ্নে প্রতিবাদমুখর, প্রতিরোধে বলিষ্ঠ এবং স্বাধীনচেতা। বলা প্রয়োজন, ১৯৭১ সালে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অর্জিত স্বাধীনতা হচ্ছে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালির শোষণ, বঞ্চনা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং এক পর্যায়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার এক অনন্যসাধারণ

* ড. শামীম আরা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

দৃষ্টান্ত। ঔপন্যাসিক মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের আলোচিত ও অনালোচিত বিশেষ দিকগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন ঐদ্ধ উপন্যাসের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এই উপন্যাসের বাস্তবতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা। যুদ্ধটা কেন হয়েছিল, কী ছিলো সেই যুদ্ধের শ্রেণীচরিত্র, কারা অংশগ্রহণ করেছিলো, কী ছিলো এই যুদ্ধের পটভূমি, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কেমন ছিলো, ধর্মকে কেন ব্যবহার করা হয়েছিল – এসব প্রশ্নের উত্তর যাঁদের কাছে পরিষ্কার নয়, তাঁদের পক্ষে এ উপন্যাসের মর্ম উদ্ধার করা কঠিন। সেলিনা হোসেনের যুদ্ধ উপন্যাসের পাঠকের জন্য তাই প্রাসঙ্গিক ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করা একটি অপরিহার্য শর্ত।[১]

সমালোচকের সঙ্গে এক মত পোষণ করে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, এই উপন্যাসের কাহিনি ইতিহাস-নির্ভর এবং সত্য ঘটনার ওপর এর অবয়ব নির্মিত হয়েছে।

যুদ্ধ উপন্যাসে ইতিহাস ও নারী

যুদ্ধ উপন্যাসের ইতিহাস–বলতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, 'নারী'–বলতে যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী নারীকে বোঝানো হয়েছে। যখন কোন দেশের আপামর জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা নিজ দেশের সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষিত, অত্যাচারিত এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাকে মুক্তিযুদ্ধ বলা যেতে পারে।[২]

ঐতিহাসিক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মতে, "মুক্তিযুদ্ধ আমরা করেছি একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য। লড়াই করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু এখানে আরও একটি কথা এসেছে, সেটা হলো 'মুক্তির কথা'। বঙ্গবন্ধু কিন্তু প্রথমে মুক্তির কথা বলেছেন, তারপর বলেছেন স্বাধীনতার কথা। ৭ই মার্চের ভাষণে একটি বাক্যের মধ্যে তিনি এ শব্দ

---

[১] স্বরোচিষ সরকার, ''সেলিনা হোসেনের দুটি উপন্যাস,'' *কথানির্মাতা সেলিনা হোসেন*, ফজলুল হক সৈকত ও জান্নাতুল পারভীন সম্পাদিত (ঢাকা : নবরাগ প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ৬৫।

[২] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬), ভূমিকা।

দুটোকে উচ্চারণ করেছেন। 'স্বাধীনতা' একটি খুব মাইক্রো কনসেপ্টের কথা। 'মুক্তির' তাৎপর্য অনেক ব্যাপক অনেক বিশাল।"[৩]

ইতিহাসে নারী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নারীর জীবন অধ্যয়নের একটি বড় দিক।[৪] কেননা ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য : "নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিল স্বাধীনতার মতো একটি বড় অর্জনে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল তার জীবন বাজি রাখার ঘটনা।"[৫]

ঐতিহাসিক প্রেক্ষপটে বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ এবং ১৯৪৭ পরবর্তী সকল ঘটনাপ্রবাহে পুরুষের পাশাপাশি বাংলার নারীসমাজ ছিল সমান সক্রিয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> অবিভক্ত ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়, সামাজিক অবরোধমুক্তি ও শোষণের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়েছেন নারীরা। তাঁরা জেলে গেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, পুরুষের বেশে যুদ্ধ করেছেন, দুর্জয় প্রতিরোধের ঘাঁটি তৈরি করে চারদিক আন্দোলিত, আলোড়িত করেছেন অসীম সাহসে।[৬]

আধুনিক ইতিহাস পূর্বে ব্রিটিশ শাসনামলের শেষদিকে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উত্তরকালে তেভাগা, নানকার টংক প্রভৃতি সংগ্রামে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদেশী পণ্য বর্জনের মাধ্যমে যে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় তার মধ্যেও রয়েছে নারীর অংশগ্রহণ। 'বিদেশী পণ্য বর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁরা সুতো কেটে, তাঁত বুনে, নিজেদের কাপড় নিজেরাই তৈরি করতে শুরু করেন। একদিনের অরন্ধন ও উপবাসের ডাকে তাঁরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল। মনোরমা মাসিমা বরিশাল শহরে এক বিশাল নারী বাহিনীর নেতৃত্ব

---

[৩] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা: তত্ত্ব ও পদ্ধতি* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৩৭।

[৪] সেলিনা হোসেন, *ঘরগেরস্থির রাজনীতি* (ঢাকা: ইত্যাদি প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ৮৭।

[৫] ------, *ভাষা মুক্তিযুদ্ধ সাহিত্য* (ঢাকা:ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ২১৯।

[৬] *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৮-৭১, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬।

দিয়েছিলেন।[৭] ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নবশশী দেবী, সুশীলা সেন, কমলকামিনী গুপ্তা প্রমুখ নারী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ সময় গ্রামীণ মহিলাদের স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজে হাতেখড়ি নিয়েছেন নবশশী দেবীর নাতনি বিক্রমপুরের আশালতা সেন।[৮] স্বাদেশিকতার এই প্রবল জোয়ারের সময় ব্রিটিশ পুলিশের চোখে সন্দেহজনক মহিলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবী চৌধুরাণী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তথা স্বদেশী আন্দোলনে প্রথম মহিলা রাজবন্দি ছিলেন একজন বাঙালি ননীবালা দেবী।[৯]

১৯২১ সালে চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন নেলী সেনগুপ্তা। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবী অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের নারী বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বন্দি হন। তিনিই প্রথম নারী যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নারী সমাজের প্রকাশ্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১০]

১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে কাজ করেছেন রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের চারজন নারী–শামসুন্নেসা বেগম, রওশন আরা বেগম, রাইসা বানু বেগম ও রদরুনেসা বেগম। বিশ শতকে বহু ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী ধারার সংগঠন গড়ে ওঠে। এসময় 'শ্রীসংঘ' নামে বিপ্লবী দলে যোগ দেন লীলা নাগ, আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস প্রমুখ। চট্টগ্রামের সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে অংশগ্রহণ করেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কম্পনা দত্ত।[১১] নারী আন্দোলনের ইতিহাসে দেশপ্রেমী, শোষণবিরোধী, উপনিবেশবিরোধী, সুদীক্ষিত, সংকল্প ও দৃপ্ত-প্রত্যয়ী অভিযাত্রী এক আত্ম-নিবেদিত অগ্নিকন্যার নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২)। তিনি প্রথম শহীদ কন্যা হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এই অমিততেজী যোদ্ধার জন্ম ১৯১১ সালে

---

[৭] পিটার কাস্টার্স (মূল), কৃষ্ণা নিয়োগী (অনু.), *তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী* (ঢাকা : গণ সাহিত্য প্রকাশনা, ১৯৯২), পৃ. ২৩।

[৮] মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ৮৫।

[৯] মাহমুদ শামসুল হক, *হাজার বছরের বাঙালী নারী* (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০০), পৃ. ৩০২।

[১০] *বাংলার নারী আন্দোলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।

[১১] আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৪২।

চট্টগ্রামের ধলাঘাট গ্রামে।[১২] ১৯৩০ সালের ১৮-২২ এপ্রিল চট্টগ্রামে সংঘটিত বিপ্লবী অভ্যুত্থানে বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা জীবন উৎসর্গ করে প্রমাণ করলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের সমান আগ্রহ ও যোগ্যতা রয়েছে।[১৩] খিলাফত আন্দোলনে অসাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাদের অন্যতম শওকত আলী ও মাওলানা মোহাম্মদ আলীর মাতা বি-আম্মা অবাদি বেগম ছিলেন একজন সক্রিয় নেত্রী। নারী পুরুষ-সমাজকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিল, সন্তানদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ও অর্থ-তহবিল সংগ্রহে এগিয়ে এসেছিল।[১৪]

শোষিত-বঞ্চিত বাংলার কৃষককুলের সংগ্রামই ইতিহাসে তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলন ছিল বর্গাদারদের, জোতদারদের সঙ্গে উৎপাদিত শস্য অর্ধেক ভাগাভাগির বদলে, নিজের জন্য দু-তৃতীয়াংশ রাখার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ছিল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের চ্যালেঞ্জ। এই সংগ্রাম গ্রাম-বাংলার কৃষক সমাজের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য ও কৃতিত্ব।[১৫] দিনাজপুর জেলার আটওয়ারী থানার রামপুর গ্রামে জ্বলে উঠেছিল এই আন্দোলনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ। পরবর্তীতে দেশের ১৯টি জেলায় তা পত্র পল্লবে বিকশিত হয়। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নারী বাহিনীর ছিল দুর্ধর্ষ ও কৌশলী নেতৃত্ব ।

তেভাগা আন্দোলনের অনুরূপ আরও একটি আন্দোলন হলো 'নানকার' আন্দোলন। 'নানকার' শব্দটি সিলেট জেলার ভূমি-ব্যবস্থায় বহুল পরিচিত একটি শব্দ।[১৬] উর্দু ভাষায় রুটিকে নান বলা হয়। খাদ্য বা খাই খোরাকি অর্থে নান শব্দের ব্যবহার। দাস বা ক্রীতদাস প্রথার সংস্কারকৃত রূপই হলো নানকার ব্যবস্থা।[১৭] এ ব্যবস্থায় অমানুষিক অত্যাচারের অন্ত ছিল না। লোহার শিক পুড়িয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছেকা বা দাগ দেওয়া হতো।[১৮] নানকারদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল যেমন : সুখাইর

---

[১২] রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য* (ঢাকা: ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৭৫।

[১৩] রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৩৩।

[১৪] এম. আব্দুর রহমান, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা* (কলকাতা : প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সী, ১৯৮৭), পৃ. ২৯-৩৭

[১৫] *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, পূর্বোক্ত।

[১৬] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

[১৭] সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ৮২।

[১৮] *তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

বিদ্রোহ ১৯২২-২৩, কুলাউড়া বিদ্রোহ ১৯৩১-৩২, ভানুবিল বিদ্রোহ ১৯৩৩-৩৫, লাউতা বাহাদুর বিদ্রোহ ইত্যাদি। এসব আন্দোলন-সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশ নিয়েছিল।

ময়মনসিংহের উত্তরে অবস্থিত গারো পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ ১২ বছর পর্যন্ত টংক প্রথার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসে এটাই টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলন। এই প্রথার বিরুদ্ধে এবং টাকায় খাজনা দেয়ার দাবিতে টংক কৃষকদের মরণপণ সংগ্রাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। টংক আন্দোলনে প্রথম শহীদ হন রাশমনি হাজং নামক অত্যন্ত সাহসী এক নারী।[১৮]

তেভাগা, নানকার ও টংক আন্দোলনের পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল এলাকার কৃষক বিদ্রোহও (১৯৪৮-১৯৪৯) পাকিস্তান আমলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাচোল আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও পুলিশের বর্বরতার কাছে পরাজয় স্বীকার না করে ইতিহাসে কিংবদন্তিতে পরিণত হন ইলা মিত্র।[১৯] অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন এক অনন্য সাধারণ নারী। ১৮৪৬-১৮৪৮ কালপর্বে তেভাগার দাবিতে উত্তরবঙ্গে আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে আসছিল ঠিক সেই সময়ে বৃহত্তর রাজশাহীর নাচোলে সাঁওতাল, হিন্দু, মুসলমান কৃষকদের আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেয়। নাচোল কৃষক-আন্দোলনের সাথে ইলা মিত্র ও তার স্বামী রমেন মিত্র উভয়ই জড়িত ছিলেন। ইলা মিত্র এই আন্দোলনকে তূর্ণমূল পর্যায়ে নিয়ে যান। আন্দোলন চলাকালে একদল সাঁওতালসহ ইলা মিত্র পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। নাচোল থানায় তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। তাঁর মুক্তির দাবিতে জেলের ভেতরে-বাইরে চলে অনশন, ধর্মঘট।[২০] পাঁচ বছরের একমাত্র ছেলেকে বাইরে রেখে জেলের নির্জন কক্ষে তিনি সাত বছর কাটিয়েছেন। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ধাপেই নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল- এ কথা বলা যায় নির্দ্বিধায়।

যুদ্ধ উপন্যাসে নারী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের অবদান স্পষ্টভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরার অভীলাস আলোচ্য যুদ্ধ উপন্যাসটি। উপন্যাসটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়- তিনি বীর প্রতীক তারামন বিবি। সংক্ষেপে তাঁর পরিচয়

---

[১৮] সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ৮২।

[১৯] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

[২০] *তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

জানা যাক-"তারামন বিবি কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর থানার কোদালকাঠি ইউনিয়নের শঙ্কর মাধবপুর গ্রামে ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারিদ্র্য-পীড়িত আব্দুল সোবহানের অশিক্ষিত স্বামী পরিত্যক্ত মেয়ে।[২১] ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মা কুলসুম বেগম তারামনকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা আজিজ মাস্টারের বাড়িতে আশ্রয় নেয়, যার পাশেই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প। এই শিবিরের কমান্ডার ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুহিব হাবিলদার। মুক্তিযোদ্ধা আজিজ মাস্টারই প্রথম কাজের মেয়ে হিসেবে তারামন বিবিকে মুহিব হাবিলদারের কাছে রেখে গেলে তিনি তারামন বিবিকে ধর্ম মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করেন।[২২] প্রথম দিকে রান্নাবান্নার কাজ করলেও মুহিব হাবিলদার তারামন বিবিকে অতি যত্নে রাইফেল চালানো, স্টেনগান চালানো এবং গুপ্তচর-বৃত্তি শিক্ষা দিতে থাকলে দিনে দিনে তার মধ্যে অকুণ্ঠ দেশপ্রেম এবং সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম হয়। তিনি জীবন বাজি রেখে শত্রুপক্ষের খবরা-খবর সংগ্রহে অংশ নেন। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ১১ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে রাজীবপুর, মোহনগঞ্জ, আবরতলীসহ বিভিন্ন স্থানে পাশাপাশি থেকে মরণপণ যুদ্ধে অংশ নেন।[২৩]

তবে অশিক্ষিত, রাজনীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তারামন নারী হিসেবে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে কিছুটা দ্বিধান্বিত থাকলেও মুহিব হাবিলদারের সহায়তায় তিনি বলিষ্ঠ এক যোদ্ধায় পরিণত হন। উল্লেখ্য, মুহিব হাবিলদার ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং সৎ চরিত্র-সম্পন্ন দৃঢ়চেতা মানুষ। তিনি ষোড়শী এই মেয়েটির মধ্যে অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তাকে কন্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে নিজ হাতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।[২৪] তারামন বিবির কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে।[২৫] 'তারামন তাঁর খেতাবের কথা জেনেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পঁচিশ বছর

---

[২১] মেজর রফিকুল ইসলাম পি এস সি, *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা ১৯৭১* (ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ২৩।

[২২] আজকের কাগজ, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬; ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা* (ঢাকা : নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৪), পৃ. ৫৫।

[২৩] আমিরুল ইসলাম, আহম্মদ মাযহার, আসলাম সানী (সম্পাদিত), *শত মুক্তিযোদ্ধার কথা* (ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ১৩৮।

[২৪] মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও নারী মুক্তিযোদ্ধা* (ঢাকা : ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ৫৩-৫৪।

[২৫] রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী* (ঢাকা : আইইডি, ২০০৬), পৃ. ১০২।

পর। লেখক এবার জানালেন তাঁর অন্তরলোকের অনেক অজানা কথা।[২৬] যুদ্ধ উপন্যাসটিতে যুদ্ধকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় স্থান পেলেও নারীকে একটি স্বতন্ত্র স্থানে রাখার চেষ্টা করেছেন লেখক। এই উপন্যাসে মূল চরিত্র বলতে বিশেষ কাউকে নির্দেশ করা যায় না তবে পুরো উপন্যাসে একজন অজ্ঞাতনামা লোকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাহলে তিনিই কী মূল চরিত্র ? এর উত্তরে বলা সমীচীন যে, লোকটি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-প্রেরণা-সাহস ও স্বাধীনতার স্বপ্নের প্রতীক।'[২৭] লেখক এই উপন্যাসের মূল সত্তা হিসেবে নারীকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যুদ্ধ করেছিল একথা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে তাঁরা পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তাদেরকে সেবা করেছে, তাদের আশ্রয় দিয়েছে, ভালোবাসায় হৃদয় ভরিয়ে দিয়েছে, বিপদের সময় লুকিয়ে রেখেছে, লাশের সৎকার করেছে, কবরে ফুল দিয়েছে আর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মতো তারাও আহত হয়েছে কিন্তু কী আশ্চর্য ! তাঁরা তো মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেনি। এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক বোঝাতে সম্মত হয়েছেন যে – নারীরাও মুক্তিযোদ্ধা ছিল, এই উপন্যাসের তাঁরাই প্রাণ, কাহিনির প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের সুদৃঢ় অবস্থান। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> লোকটির অবস্থান উপন্যাসের প্রায় সর্বত্র হলেও আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে এমন কোন ধারাবাহিকতা নেই বা তার চরিত্রে এমন কোন উজ্জ্বল গুণ আরোপিত হয়নি, যাতে আমরা লোকটিকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। বরং এর চেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র তারামন বিবির এবং খানিকটা বেণুর। বারুয়া মাঝির স্ত্রী সোনামিথিকেও তাদের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। বেণু ও সোনামিথি যদি তারামন বিবিরই অপর নাম হতো, তাহলে নির্দ্বিধায় তারামনকেই বলতে পারতাম এ উপন্যাসের মূল বা কেন্দ্রীয় চরিত্র।[২৮]

তবে একথা সত্য যে, লেখক তারামনকে দিয়ে যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারেননি সে অসমাপ্ত কাজগুলো বেণু, সোনামিথি কিংবা ছহিতনের মাধ্যমে শেষ করেছেন। যুদ্ধ উপন্যাসে মোট ৮টি গল্প লক্ষ করা যায়। এই ৮টি গল্পে নারীর বীরত্বকেই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে।

---

[২৬] স্বরোচিষ সরকার, ''সেলিনা হোসেনের দুটি উপন্যাস'', *কথানির্মাতা সেলিনা হোসেন*, পৃ. ৬৬।

[২৭] তদেব, পৃ. ৬৫।

[২৮] তদেব, পৃ. ৬৫।

প্রথম গল্প তারামনের বিয়ে ভাঙার গল্প। মাত্র ৬ মাস সংসার করার পর স্বামী মেছের আলী তাকে তালাক দিলে তারামনের উক্তি, "সংসারের মুখে ছাই দিলাম আব্বা। এখন থেকে আমি স্বাধীন।"[২৯]

দ্বিতীয় গল্পটি সুভাষ, সুষমা, দেবেশ, নিখিল, সরলা, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর। সুষমার স্বামী দেবেশ ৫২-এর ভাষা-আন্দোলনের মিছিলে গিয়েছিল আর ফেরেনি। স্বামী ফিরে আসবে এই আশায় সিঁথি লাল সিঁদুরে রাঙ্গিয়ে রাখে সুষমা। ছেলে সুভাষও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ডাকে ঘরছাড়া, তারও প্রতীক্ষায় থাকে সুষমা। হেমন্ত এসে সরস্বতীকে বিয়ে করে ইন্ডিয়া শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যায়। হেমন্ত ভালো তবলা বাজায়, সে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন তবলচি। বাড়ির সবচেয়ে প্রৌঢ় নিখিল নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাতে কালেমা, সুরা ফাতিহা শিখে নিয়েছে, টুপি সঙ্গে রাখে, নামাজ পড়ে। যুদ্ধের সময়ে তার উক্তিতে ধর্মের একটি নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়– "এখন ধর্ম আর বিশ্বাস নেই, ওটা ঘটনা, আচরণ, নিয়মপালন।"[২৯]

পাকিস্তানিরা আবদুর রহমান মাস্টারকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁর অপরাধ তিনি মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা কামালের বাবা। তৃতীয় আখ্যানটি মেনাজ পরিবারের। শঙ্কর মাধবপুরে মেনাজ পরিবারের বসতবাড়ি। ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মিলিটারি এই গ্রাম পুড়িয়ে দেয়, ঘরের মেয়েদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। তারা বেণুকে ধরে নিয়ে যায়। বেণুর পরিবার কোদালকাঠি গ্রামে চলে যায়। কিছুদিন পর আবার তারা পুরোনো ভিটায় ফিরে এসে দেখতে পায় বেণু মাখনের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। বেণু অন্তঃসত্ত্বা হলে বুঝতে পারে তার জরায়ু জখম হয়েছে। যুদ্ধ শেষে মাখন ফিরে এসে দেখে তার পরিবারের কেউ বেঁচে নেই আর তার একটি পা যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, এটাও জানতে পারে বেণু। তারপর সে বলে–

"... ভালো কইরে দেখো হামাক। তুমহি দেছো পা। হামি দিছি জরায়ু। তোমার পায়ের ঘা শুকায়ে গেছে। কয়দিন পর হামারও জরায়ুর ঘা শুকায়ে যাবে। আমি ভালো হয়ে যাবো।"[৩০]

চতুর্থ গল্পটি হলো – প্রৌঢ় মকবুল-ছহিতন ও তাদের দুই ছেলে – রজব ও তরফ-এর যুদ্ধে যাওয়ার ঘটনা। রাস্তার পাশে এক মুক্তিযোদ্ধার লাশ পেয়ে তাঁর দাফনের কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে মকবুল-ছহিতন। মুক্তিযুদ্ধে হাজারও শহীদের কবরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি – কেউ বধ্যভূমিতে, কেউ জলাশয়ে, কারও লাশ শেয়াল-শকুন

---

[২৯]সেলিনা হোসেন, যুদ্ধ (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, একুশে ২০০৬), পৃ. ১১।

[২৯] তদেব, পৃ. ২০৩।

[৩০] তদেব, পৃ. ২০৩।

কামড়ে খেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কাফনের কাপড় পাওয়া যায়নি, তাইতো তারা শার্ট-প্যান্টের কাফন পরিয়ে দিয়েছে, আর জানাজা ! "লাশ কবরে নামানোর আগে বুড়ো বুড়িকে বলে জানাজায় খাড়া রজবের মা। বুড়ি অবাক হয়, কী কন ! মাইয়ালোক তো জানাজা হড়ে না বুড়ো খেঁকিয়ে বলে, শহীদের জানাজা অইবো না এইডা অয়নি ? যুদ্ধের সময় মাইয়ালোক, বেডালোক নাই। যুদ্ধের সময় তো যুদ্ধই ধর্ম ।"[৩১]

পঞ্চম গল্পটি সুনন্দা, অমল, যুগলপ্রসাদ ও নঈমকে কেন্দ্র করে। সুনন্দাকে ধরে নিয়ে যায় মিলিটারি কারণ সে সৈয়দপুর বালক উচ্চ বিদ্যালয় কলোনীর ছোট-ছোট বাচ্চাদের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি শিখিয়েছে। অন্যদিকে অমল, নঈম, যুগলপ্রসাদসহ অনেক মারোয়ারি ও হিন্দুকে দিয়ে মিলিটারিরা ব্রিজ, কার্লভার্ট, বিমানবন্দরের নির্মাণ কাজ করায়। সামান্য ভুলে পশুর মতো আচরণ করে। একদিন মিলিটারি ঘোষণা করে একটি ট্রেন আসবে। সেই ট্রেনে চেপে তারা ভারত চলে যেতে পারবে। এই ঘটনাটি সত্য। সৈয়দপুরে বিহারীদর ৮০% ছিল ওয়ার্কশপে কর্মরত এবং তাদের দ্বারা স্টেশনে ঘটেছে নির্মম হত্যাকাণ্ড। যাত্রী নামিয়ে হত্যা-নির্যাতন একটি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় ছিল।

যুদ্ধ উপন্যাসে বর্ণিত ট্রেনটি এসেছিল কিন্তু তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়া দূরের কথা কিছুদূর যেতে না যেতে কামরা অন্ধকার করে চলন্ত গাড়ি থেকে তাদের গুলি করে দরজা দিয়ে বাহিরে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। 'সৈয়দপুরের কাছে গোলাহাটে ৩৫০ জন বাঙালিকে একদিন হত্যা করা হয়।[৩২] এই ঘটনার সঙ্গে ট্রেনটির সাযুজ্য রয়েছে। অমল, যুগলপ্রসাদ, নঈম প্রাণে বেঁচে গেলে সৈয়দপুর ক্যাম্পে ট্রেনিং নেয় পরে বাগজুরিতে চলে যায়। অজয় সাংমাও তাদের সঙ্গে ট্রেনিং করে। কমান্ডার এনায়েতের নির্দেশে তারা নাজিরপুর মিলিটারি ক্যাম্প আক্রমণ করে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় যাদের মধ্যে অমল, নঈম ও যুগলপ্রসাদ রয়েছে।

ষষ্ঠ গল্পটি বারুয়া মাঝি ও সোনামিথির। বারুয়া মাঝি মুক্তিযোদ্ধাদের পারাপার করতো। শালগ্রাম পৌঁছে দেওয়ার পথে সে শহীদ হয়। সোনামিথি সম্পর্কে জেনে গেলে মিলিটারিরা তাকে ধর্ষণ করে। ফলে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় কিন্তু সোনামিথি তার সন্তানকে নষ্ট করতে চায় না কারণ এই সন্তানই একদিন যুদ্ধের স্বাক্ষি দেবে। সোনামিথির কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ওপর পূর্ণ-আস্থার বিষয়টি স্পষ্ট হয়–

---

[৩১] তদেব, পৃ. ২০৩।

[৩২] সিরাজুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক, *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

> তুমি কি জানো না যে এখানে কেউ কন্থা হবার কথা ভাবতেও পারে না। ততোক্ষণ লড়বে যতোক্ষণ একজনও জীবিত থাকবে। আর পাকিস্তানের জেলে যে বেটা বন্দি আছে তাকে হাজারবার মেরে ফেলে হাজারবার বাঁচিয়ে তুললেও সে এদেশের মানুষকে কন্থা বানানোর ষড়যন্ত্র করবে না। তার মেরুদণ্ড বাঁকা হয় না। ওটা ভিন্ন ধাতুতে তৈরি।[৩৩]

যুদ্ধের সাক্ষী হিসেবে 'যুদ্ধশিশু'কে সোনামিথি জন্ম দিতে চায়। হতে চায় 'বীরাঙ্গনা'। মনোরম, শ্রুতিমধুর, মহৎ, 'বীরাঙ্গনা' নামটি ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[৩৪] ধানমন্ডিতে স্থাপিত হয়েছিল নিষ্ঠুর ভয়াবহতার শিকার ভাগ্যাহত এসব নারীদের জন্যে পুনর্বাসন কেন্দ্র। বিচারপতি সোবহান ছিলেন পুনর্বাসন বোর্ডের চেয়ারম্যান।[৩৫] স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন এই বোর্ড তার কার্য-পরিধির আওতায় এগিয়েছিলেন অনেকগুলো পদক্ষেপ। উদ্ধারকৃত নারীদের স্বাস্থ্য-সেবা, অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে আগ্রহীদের গর্ভপাত, নার্সিং, টাইপিং, সেলাই ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করা, ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, নগদ অর্থ প্রদান, গৃহ-নির্মাণ, তাদের সন্তানকে (যুদ্ধশিশু) বিভিন্ন সেবা-সংস্থার মাধ্যমে ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, সুইডেন, বুলগেরিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে দত্তক হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি।[৩৬]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে – নারী, নারীর ভূমিকা, নারীর অধিকার, তার দায় ও কর্তব্যের সীমা, অর্জন ও ত্যাগের পরিসর ইত্যাদি বিষয়গুলো দীর্ঘ সময় ধরেই নানা মতামত, তর্ক, কখনও যুক্তিহীন বিতর্কে পর্যবসিত হয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি, অনুশাসন প্রজ্ঞাপনের ব্যবহারে পুরুষ তার অপবল ও শক্তির প্রয়োগক্ষেত্র এবং ভোগ ও উপভোগের অপর্যাপ্ত আধার হিসেবে নারীকে চিহ্নিত করে রেখেছে ইতিহাসের সুদীর্ঘ সীমা জুড়ে।

স্বাধীনতার ৪২ বছর কেটে গেলেও একজন 'বীরাঙ্গনা' কেন মুক্তিযোদ্ধা নয় এই প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমাদের এখন পথের সন্ধান চাই –

> ১৯৭১ সালে সশস্ত্র পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের পথ চাই। পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর অপরাধের

---

[৩৩] সেলিনা হোসেন, যুদ্ধ, পৃ. ১৯১।

[৩৪] নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ১৫।

[৩৫] তদেব, পৃ. ১৭।

[৩৬] তদেব, পৃ. ১৫-১৭।

> চিহ্নের সংরক্ষণ চাই। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি পর্বে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের অস্তিত্বের উল্লেখ চাই।[৩৭]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'বীরাঙ্গনা'রা অনেকেই অশিক্ষিত ও প্রান্তিক পর্যায়ের। দেশের জন্ম-লগ্নে তাঁদের অবদানের জন্য তাঁরা যে স্বীকৃতি পেতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁরাও যেমন সচেতন নন, তেমনি রাষ্ট্রেরও উদ্যোগের অভাব রয়েছে। তবে আশার বাণী হলো এই যে, বর্তমান সরকার যুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধার ও প্রতিজ্ঞায় সংকল্পবদ্ধ। তাই –

> বীরাঙ্গনাদের সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করে গেজেট আকারে তা প্রকাশের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মুক্তিযোদ্ধাদের মতো সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
>
> এবং
>
> আগামী ২৬ মার্চের (২০১৪) মধ্যে কেন গেজেট প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং এ বিষয়ে ৪২ বছরের নীরবতা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।[৩৮]

যুদ্ধ উপন্যাসের সপ্তম গল্পটি কর্নেল তাহের ও তার স্ত্রী লুৎফাকে দিয়ে শুরু হয়েছে। কর্নেল তাহের পাকিস্তানের কোয়েটা শহর থেকে মেঘালয়ে পালিয়ে আসেন যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য। কর্নেল তাহের ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব পান। তিনি বেশকিছু যুদ্ধ পরিচালনা করে সফল হন। রংপুর জেলার রৌমারী থেকে আরম্ভ করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত অঞ্চল তাঁর অধীনে ছিল। আনোয়ার, বেলাল, দুলাল, আফতাব, ইউসুফকে নিয়ে তিনি কোদালকাঠি, চিলমারী ও হালুয়াঘাট আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কামালপুরের সম্মুখ-যুদ্ধে এম এম মটারের আঘাতে কর্নেল তাহেরের একটি পা ক্ষত-বিক্ষত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনের শহীদ হওয়া এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে কর্নেল তাহেরের বাম পা বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে তা ইতিহাস সত্য। এই উপন্যাসে সম্মুখ-যুদ্ধের পটভূমিতে যে সংলাপগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা থেকে নেওয়া হয়েছে। ঔপন্যাসিক গুরুত্বপূর্ণ সংলাপগুলোর একটি শব্দও পরিবর্তন করেননি, এটি ইতিহাসের প্রতি লেখকের নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপায়। 'গল্পটি ৭১'র ডিসেম্বরে যখন পাক-মিলিটারি আত্মসর্মপণের কথা ভাবছে তখন সিদ্দিক সালিক তাদের আত্মসমর্পণের কারণ ও বাঙালির প্রতি সত্যিকার

---

[৩৭] সাজিদ হোসেন, *একাত্তরের যুদ্ধশিশু* (ঢাকা : সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ১৬১।

[৩৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ জানুয়ারি, ২০১৪।

বৈষম্যের কথা প্রকাশ করেছে–"এরা কেন দুই পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলে তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি আস্তে আস্তে আরো অনেক কিছু নিজের চোখে দেখতে পাই। যেটা বাঙালিদের যথার্থ দাবি।"[৩৯]

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড বহুল আলোচিত হলেও আমার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাসের মধ্যে ঐদ্ধ কম আলোচিত হয়েছে। যুদ্ধ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও সরাসরি সম্মুখযুদ্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ রয়েছে। কিন্তু কাহিনীতে তারামন বিবির জীবনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধ, তাঁর তালাক-প্রাপ্তি, স্বামী থেকে বিচ্ছেদ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রতীকী কাহিনী। তালাকের পর পিতার সঙ্গে কাপড় উড়িয়ে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর রৌমারী যাওয়ার দৃশ্যটিতে আমি সেই সবই তুলে ধরেছি। এ উপন্যাসে কেবল হানাদার পাকিস্তানিদের ট্রেন কিলিংয়ের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার চিত্রই তুলে ধরা হয়নি, বাঙালির প্রতিরোধ-সংগ্রামের চিত্রও আছে। উপন্যাসে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র 'লোকটি' এমনভাবে তৈরি করেছি – যে সবদেশে ঘুরছে। আবার উপন্যাসের সব জায়গায় তার বিচরণ। কী হচ্ছে সে দেখছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তাঁদের সাহস জোগায়, দেশের মধ্যে বিচরণ করে স্বাধীনতার স্বপ্ন নির্মাণ করে। তবে উপন্যাসের শেষে মুক্তিযোদ্ধা মাখনকে উদ্দেশ্য করে পাকিস্তানিদের দ্বারা ধর্ষিত ও গর্ভবতী বেণুর উচ্চারণই আমার প্রতিপাদ্য : "ভালো কইরে দেখো হামাক। তুমিই দেছো পা। হামি দিছি জরায়ু। তোমার পায়ের ঘা শুকায়ে গেছে। কয়দিন পর হামারও জরায়ুর ঘা শুকায়ে যাবে। আমি ভালো হয়ে যাব।"[৪০]

প্রকৃতঅর্থে, যুদ্ধ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ইতিহাস-সত্য ঘটনার সঙ্গে নারীর সম্পৃক্ততা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তাঁদের সামাজিক মূল্যায়ন এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু জাতীয় দিবসে সংবর্ধনা দিয়ে নয়, তাঁদের প্রকৃত সম্মান নিশ্চিত করাই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য।

উপসংহার

সেলিনা হোসেনের যুদ্ধ উপন্যসির প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুসঙ্গে। ব্যক্তির বেঁচে থাকার সঙ্কট, মূল্যবোধের রূপান্তর, ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে আঘাত, মৃত্যু-যন্ত্রণা-ঘৃণা এবং স্বজন হারানোর বেদনার ভেতর দিয়ে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চিত্র অঙ্কন করেছেন। পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনা কালের যুদ্ধের অদ্ভুত পরিস্থিতির এ এক মৌল সত্য। যে সত্য পৃথিবীর সকল মানুষের অভিন্ন অনুভব। ঔপন্যাসিক যুদ্ধের দেশীয়

---

[৩৯] সেলিনা হোসেন, যুদ্ধ, পৃ. ৩১৫।

[৪০] সেলিনা হোসেনের সাক্ষাৎকার ' শিলালিপি', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১২।

প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন একটি সেক্টরের সরাসরি যুদ্ধকে চিত্রিত করে এবং অগণিত মানুষের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও যুদ্ধ সম্পর্কিত দেশজ ঐতিহ্য সংলগ্ন কল্পনার ভেতর দিয়ে। যুদ্ধ উপন্যাসের স্বাধীনতার স্বপ্ন নারী-পুরুষ উভয়কে সমানভাবে আন্দোলিত করে। উপন্যাসে মাখন যে অর্থে মুক্তিযোদ্ধা বেণুও সেই অর্থে একজন মুক্তিযোদ্ধা। পৃথিবীর তাবৎ যুদ্ধের এটি চিরন্তন সত্য। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ছিল সবত্র। এই উপন্যাসে পুরুষের বীরত্বের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে–যা ইতিহাস সত্য। বাঙালি জাতীর ইতিহাসে সকল ঘটনা প্রবাহে নারীর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ তার ব্যতিক্রম নয়। শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়, সামাজিক অবরোধমুক্তি, দুর্জয় প্রতিরোধের ঘাঁটি তৈরি করে চারদিক আলোচিত, আলোড়িত করেছে বাঙালি নারী ঐদ্ধ উপন্যাসে এসে তার সার্থকতা দেখতে পাই।

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

বাংলা গীতিকবিতা ও আরবি কাসিদা : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ মতিউর রহমান*

Abstract: In ancient times Bengali poetry was highly lyrical. *Charyapad* or Buddhist lyrical song, 'Baishnab' songs, 'Baul Gan' etc. were the dsifferent types of Bengali lyric. These lyrics were known by different names and the practice of singing these lyrics in the court of every king, in the house of every Jamindar, in the drawing room of every elite of society and in various social festivals was a very popular tradition in our country. The Arabic poetry which is well known as 'Qasida' was also mainly lyrical like the ancient Greek and Bengali lyrics. The Jahili poets were also born poets as the Bengali poets. In different courts of the kings, in fairs or in different oases these born poets had sung their own lyrics in their own marvelous tone and rhythm. After giving a brief idea of Bengali lyric, its characteristics and classification and also about its poets, this essay discusses the theoretical sides of Arabic lyric, 'Qasida.'

ভূমিকা

কবিতা হলো অন্তরের ভাষা, হৃদয়ের গভীর থেকে নিঃসারিত আবেগ অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ।[১] কবি মনে সৃষ্ট বিচিত্র ভাব, রূপক কল্পনাপ্রসূত বিষয় যখন ছবির মতো প্রত্যক্ষ এবং গানের মতো মধুর করে অলংকার পূর্ণ অন্তঃমিলযুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ লাভ করে তখন তাকে কবিতা বলে।[২] কবিতা পৃথিবীর সব ভাষার সাহিত্যেরই একটি

---

* ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান,সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ فهو لغة النفس أو هو صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرة দ্র. জুরজি যায়দান, *তারিখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াহ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩; ইংরেজ কবি কোলরিজ বলেন : The best words in the best order- যথোপযোগী শব্দের আবশ্যম্ভাবী বাণী বিন্যাসই কবিতা। দ্র. শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য-সন্দর্শন* (ঢাকা : সুচয়নী পাবলিশার্স, সংশোধিত নতুন সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২০।

২ মানব মনের ভাবনা, কামনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখনই তার নাম কবিতা। দ্র. মাহবুবুল আলম, *বাংলা ছন্দের রূপরেখা* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ৭ম সং, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২; الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبرعن الأخيلة البديعة و الصور المؤثرة البليغة দ্র. আহমাদ হাসান আয-যায়য়াত, *তারিখুল আদাবিল 'আরাবি* (প্রকাশনালয়ের নাম ও তারিখ বিহীন), পৃ, ২৮। Poetry is the spontaneous overflow of powerful

প্রধান, প্রাচীন ও ঋদ্ধ শাখা। বাংলা সাহিত্যে তো বটে অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য সঠিক। গীতিকবিতা লেখার আগে বাংলা সাহিত্যের সব শাখার মাধ্যম ছিল কবিতা। বাঙালির নাড়ির সাথে কবিতা ও গানের ঝংকার মিশে আছে। চর্যাপদের কবিতার পর কাহিনিভিত্তিক কবিতাই সাহিত্যের আসর দখল করেছিলো। মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তার আগে মৈমনসিংহ গীতিকা, মঙ্গলকাব্য, পুথিসাহিত্য সবটাই কবিতায় লেখা। বাংলা কবিতা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চর্যাপদ এর মাধ্যমে শুরু হয়ে রবীন্দ্র যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করেছে।[৩] বৌদ্ধগান ও দোহা থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে বিহারীলাল চক্রবর্তী ও মধুসূদন দত্ত, এমনকি পঞ্চকবি[৪] পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা পেয়েছি গীতিকবিতার বিশাল ভাণ্ডার।[৫]

অপরদিকে আরবি সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও সফল সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি সাহিত্য।[৬] পূর্বে খ্রিস্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে এ ভাষায় সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ ঘটে।[৭] প্রাচীন কাল থেকেই আরবি সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল কবিতা (شعر)।[৮] আরবি কবিতা বা شعر প্রাচীনকালে শুরু হয়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হবার পর একটি গ্রহণযোগ্য মানে উপনীত হয়েছে এবং পরিপক্কতা লাভ করেছে।[৯] প্রকৃতপক্ষে কবিতায় তাদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। তাদের কবিতা ছিল অতি উচ্চাংগের এবং নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হিসেবে

---

feeling. cf. Words Worth, *Preface to Lyrical Ballads, in the Norton Anthology of English Literature,* Vol- 11, Ed, E. Talbot Donalson et al (Newyork : Norton, 1962), p.83.

৩ ড. আব্দুল জলীল, *আরবি কবিতায় ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৫; মৌলানা নূরুদ্দীন আহ্‌মদ, 'অস্-সব'উ-ল্-মু'অল্লকাত (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ১৮।

৪ পঞ্চকবি হলেন : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত সেন, ডি-এল রায় ও কাজী নজরুল ইসলাম।

৫ বাংলা ভাষায় আধুনিক গীতিকবিতা শুরু হয় ঊনবিংশ শতকের চল্লিশ দশক থেকে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এ ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত গীতিকবিতা লিখে চলেছেন কবিরা। এই ধারা নানা মাত্রায় পুষ্টি লাভ করেছে। দ্র. মোস্তফা তারিকুল আহসান, দীর্ঘকবিতা ও তনুমধ্যা, *কারুজ*, ত্রয়োদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ৬২।

৬ মুহাম্মদ সোলায়মান, আরবি কাসিদা : উৎপত্তি ও বিকাশ, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৪র্থ খন্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রী.; পৃথিবীর প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী ভাষা সমূহের মধ্যে আরবি ভাষা অন্যতম। দ্র. মো. আবু বকর সিদ্দীক, *আরবি সমালোচনা সাহিত্য* (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), ভূমিকাংশ দ্র.।

৭ আল-শায়খ মোস্তফা আল-গুনাইমি, *রিজাল আল-মু'আল্লাকত আল-আশার* (বৈরুত : আল-মাকতাবা আল-আহলিয়া, ১৩৩২ হি.), পৃ. ১৮; হান্না আল-ফাখুরি, *তারিখ আল-আদাব আল-'আরাবি* (ইরাক : মাকতাবা আল-বুলসিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ২০; আহমদ আল-ইস্কান্দারি ও মোস্তফা ইনানি, *আল-ওয়াসিত* (মিসর : মাকতাবা আল-মা'আরিফ, ১৩৪৪ হি./১৯২৮ খ্রি.), পৃ. ৫।

৮ আহমাদ হাসান আয-যায়য়াত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।

৯ ফুয়াদ আফরাম আল-বুস্তানি, *আশ-শি'রু জাহিলি* (বৈরুত: আল-মাতবা'আতুল কাছূলিকিয়্যাহ, ১৯২৯ খ্রি.) পৃ. ১৬; আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১।

সর্বজনস্বীকৃত। তৎকালীন যুগে কবিতাকে 'আরব জাতির জীবনালেখ্য' বলা হত।[১০] জাহিলি যুগের আরবি সাহিত্য বলতে কাব্যসাহিত্য বা কাসিদাকেই বুঝানো হয়।[১১] প্রাঞ্জল ভাষা বিন্যাস, আকর্ষণীয় শব্দ ব্যঞ্জনা এবং চিত্তাকর্ষক অর্থের প্রাচুর্য ও মাধুর্য এ কাব্যসাহিত্যের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী ও দৃঢ় করে তুলেছে।[১২] ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত কাসিদা তথা গীতিকবিতাগুলো সাহিত্যিক মানে খুবই উচ্চাঙ্গের এবং যথেষ্ঠ পরিপক্ক। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ও আরবি কবিতার উদ্ভব হয়েছিল প্রায় একই সময়ে।[১৩] বাংলা কবিরা যেমনিভাবে কবিতা তথা গীতিকবিতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে আরবি কবিরাও তাদের সমস্ত মেধা, মনন উজাড় করে দিয়ে গীতিকবিতা রচনা করেছেন।

গীতিকবিতা

যে কবিতা সুরে সুরে কণ্ঠে ধারণ করা যায় সেটাই তো গীতিকবিতা। অন্যভাবে বলতে হয়, যে কবিতায় গীতিময়তার প্রাধান্য, সেটাকেই গীতিকবিতা বলা হয়। ব্যক্তি-অনুভূতি কবির মানসলোকে ছন্দোময় কাব্যের সৃষ্টি করে তা-ই কবিতা হয়ে ধরা পড়ে গীতিকবিতায়।[১৪] সেই কবিতা সুর হয়ে ঝঙ্কার তোলে শিল্পীর কণ্ঠে। আর তার অনুরণন প্রসারিত হয় সঙ্গীত পিপাসুদের মনের কন্দরে।[১৫] ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকবিতাকে বলা হয় 'লিরিক' (Lyric)।[১৬] বীণা বাদ্যযন্ত্র বা Lyre সহযোগে এ ধরণের কবিতা গীত[১৭]

---

১০ æPoetry is the public register of the Arabs" cf.: R.A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Cambridge : The University Perss, 1962), p. 32.

১১ আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, *আরবি সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৮৯।

১২ মুহাম্মদ সোলায়মান, আরবি কাসিদা : উৎপত্তি ও বিকাশ, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৪র্থ খন্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রি.।

১৩ ড. আব্দুল জলীল, *আরবি কবিতায় ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ.১৫; 'অস্-সব'উ-ল্-মু'অল্লকাত, পৃ. ১৮।

১৪ অধ্যাপক মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৫৮১; *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৭।

১৫ *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৭।

১৬ প্রাচীন গ্রিসেই (Lyric) পরিভাষাটির জন্ম। Palgrage তাঁর Golden Treasury of Songs and Lyrics ভূমিকায় লিখেছেন : A Lyric poem shall turn on some single thought, feeling or situation. একইভাবে সমালোচক Henley বলেছেন : A Lyric is a single emotion temperamentally expressed in terms of poetry. দ্র. মোস্তফা তারিকুল আহসান, দীর্ঘকবিতা ও তনুমধ্যা, *কারুজ*, ত্রয়োদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ৬২।

১৭ গীত মানুষের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তা স্পষ্ট হয়। 'আঃ', এ শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হতে পারে, বিরক্তিবাচক হতে পানে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হতে পারে। 'তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!' শুধু এটুকু বললে দুঃখ বুঝাতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সাথে বললে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাবে। এ স্বরবৈচিত্রের পরিনামই সঙ্গীত। সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ

হত বলে তার নাম হয়েছে 'লিরিক' (Lyric)।[১৮] গীতিকবিতা বলতে বোঝায় যে কোনো ছোট একটি কবিতা, যা কাহিনী বা গল্প বর্ণনা করে না, যার মধ্যে একজন মানুষের ভাব, অনুভূতি বা চিন্তাধারার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটে।[১৯] বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতা সম্পর্কে বলেছেন : 'বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্ফুটন মাত্রা যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকবিতা।'[২০] কবির আন্তরিকতাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার একমাত্র কষ্ঠিপাথর। বিদ্যাপতির উদ্ধৃতি দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিকবিতা সম্মন্ধে বলেছেন : 'যাহোক আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা কিছু একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ, ঐ যেমন বিদ্যাপতির :

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শুণ্য মন্দির মোর-

সে-ও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের কোন একটি সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা।'[২১]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে লিরিক বা গীতিকবিতার সঙ্গায় লেখা হয়েছে : "In Perfect Lyric – the instrument is the material form to which the words have to adept themselves।"[২২]

গীতিকবিতা হচ্ছে, কবির একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা কামনা ও আনন্দ বেদনার ছন্দায়িত প্রকাশ।[২৩] প্রকৃত প্রস্তাবে কবির হৃদয়জাত অনুভূতি যখন পাঠকের অনুভূতিলোকে সংবেদনশীলতার আলোকে সিম্ফনী জাগাতে সক্ষম হয়, তখন তা গীতিকবিতার পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। শুধুমাত্র কবির নিজ অন্তরের বোধটুকু পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই এই কবিতার উদ্দেশ্য। শুদ্ধসত্ত্ব বসু যেভাবে বলতে চেয়েছেন :"গীতি-কবিতায় কবি তাঁর মানসিক অনুভবের একটা দ্যুতির বিচ্ছুরণ ঘটান মাত্র, তাঁর আবেগে যে অনুরণন ধ্বনিত-তাতে পূর্ণতার আস্বাদ যে থাকবে এমন কথা নেই, একটুখানি ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনার একটি অভিভাবের বাঙ্ময় রূপায়নই যথেষ্ট। ভাবের ঐক্য গীতিকবিতার একটি সুসংহত লক্ষণ।"[২৪] গীতিকবিতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে ছন্দের দোলা। ছন্দের সুর-লয় ও শব্দ বিন্যাসই গীতিকবিতা এর একমাত্র অপরিহার্য শর্ত। হৃদয়ের অনুভূতি সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী

আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলে। দ্র. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (ঢাকা : সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১৩ খ্রী.), পৃ. ২৩।

১৮ *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৫৮১।

১৯ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও ড. সুধীর চন্দ্র বড়ুয়া, *সাহিত্য কোষ* (ঢাকা : মাতৃভুমি প্রকাশনী, ২য় মুদ্রন-২০১৩ খ্রী.), পৃ. ৬৭।

২০ *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৭; *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৫৮১।

২১ *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৭।

২২ *The New Encyclopaedia Britannica*, Vol-7 (Chambridge : The University of Chicago, 15th Edition, 1968), p.593.

২৩ গীতিকবিতায় কবির হৃদয়ের অনুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা প্রাণের অন্তস্তল থেকে আবেগকম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাকেই গীতিকবিতা বলা হয়। দ্র. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৫৮১।

২৪ *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৭; মোস্তফা তারিকুল আহসান, দীর্ঘকবিতা ও তনুমধ্যা, *কারুজ*, ত্রয়োদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ৬২-৬৩।

নয় বলে তা অবলম্বনে লেখা গীতিকবিতাও দীর্ঘ আকারের হয় না।[২৫] আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতি, অবয়বের স্বল্পতা, সঙ্গীতমাধুর্য ও গতিস্বাচ্ছন্দ্য-এই কয়টি বৈশিষ্ট্য গীতিকবিতার মধ্যে বিদ্যমান।[২৬]

গীতিকবিতায় মানবজীবনের ইঙ্গিত নেই। গীতিকবিতা আত্মসচেতন কবির একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ। কবি এখানে আত্মবিমুগ্ধ, তাই সারা কবিতাজুড়ে থাকে প্রাণস্পন্দন। কবির ব্যক্তি অনুভূতি বা মনের রূপ তাকে স্নিগ্ধকান্তি দান করে। কবির চারিত্রিক কমনীয়তা, নমনীয়তা বা দৃঢ়তা গীতিকবিতায় প্রতিফলিত। তাই গীতিকবিতা কবির আপন দর্পন। অর্থাৎ কবির একান্ত ব্যক্তি-অনুভূতি যখন সহজ ও সাবলীল গতিতে সঙ্গীতমুখর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন গীতিকবিতার জন্ম।[২৭] গীতিকবিতায় ঘটেছে ছন্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ। ছন্দ এসেছে ভাবের অনুসারী হিসেবে। ভাবের সর্বোত্তম প্রকাশের জন্য উপযোগী ছন্দনির্মাণে কবিরা ছিলেন তৎপর। তাই গতানুগতিক ছন্দে এসেছে পরিবর্তন। শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে গীতিকবিতায়।[২৮]

গীতিকবিতায় সুর সংযোজন করলে গানের রূপ ধারণ করে, আর গানে নিজের প্রয়োজনেই সুর থাকে। গীতিকবিতা আর গানে ভেদ থাকলেও সুর এসে ভেদাভেদের দেয়াল ভেঙ্গে দেয়। তখন গীতিকবিতা হয়ে যায় গান, আবার গান হয়ে উঠে গীতিকবিতা। দু'জনায় যেন দু'জনার আপনজন। সুরকে নির্ভর করে তাদের এই আত্মীয়তা। তাই সুরারোপিত গান যেমন গান, সুরারোপিত গীতিকবিতাও তখন হয়ে যায় গান। গানের কথায় যেখানে সব কিছুই কবির আত্মভাব অনুরঞ্জিত, যেখানে জগৎ ও জীবনের প্রতিফলন ঘটে কবির চোখ দিয়ে, কবির ব্যক্তিত্ব জাগতিক ব্যাপারগুলো নিজের মনের মতো ঢালাই করে নেয়- সে রচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে গীতিকবিতার রূপ।[২৯]

কবি সেখানে নায়ক, প্রধান চরিত্র, তার মনের ভাবেই প্রকাশিত হয় জীবন ও জগৎ। এ জাতীয় কবিতার নাম মন্ময়ধর্মী গীতিকবিতা, এখানে কবির নিজের অভিজ্ঞতাই বড় কথা। অন্যদিকে কবি যে কবিতায় জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আপনাকে বিলীন করে দেন, বিষয়কে বিষয়ের দিক থেকে উপলব্ধি করেন, এ শ্রেণীর কবিতা তন্ময়ধর্মী গীতিকবিতা।[৩০] এখানে কবির তদগত দৃষ্টি বড় কথা। মন্ময় ও তন্ময় দু'প্রকারের রচনাই গীতিকবিতা। শুধু কবির অভিজ্ঞতার স্বরূপ ভেদ এবং প্রকাশ ও পরিবেশনার গুণে, বুনানির প্রভেদের জন্যই একই গোত্রের হয়েও রূপ ভিন্ন। মোট কথা, যে কবিতায় কবির নিজের অনুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা আর প্রাণের গভীর থেকে আবেগকম্পিত সুরে সম্পুর্ণ ভাবমর্যাদা আত্মপ্রকাশ করে তারই নাম গীতিকবিতা।

---

২৫ *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৭।
২৬ তদেব।
২৭ *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৭; *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৫৮১।
২৮ *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৫৮১।
২৯ *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৭।
৩০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

ভাবের বৈচিত্র গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। কবিহৃদয়ের মধ্যে জীবন ও প্রকৃতির বিচিত্র ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে। সে সকল ভাবের প্রকাশ গীতিকবিতায় ঘটে বলে তাতে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।[৩১] বিষয়ের এই বৈচিত্র্যের জন্য গীতিকবিতাকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা চলে। যেমন : ভক্তিমূলক গীতিকবিতা,[৩২] বন্দনামূলক গীতিকবিতা,[৩৩] দেশাত্মবোধক গীতিকবিতা,[৩৪] প্রেমমূলক গীতিকবিতা,[৩৫] প্রকৃতিবিষয়ক গীতিকবিতা,[৩৬] সনেট,[৩৭] স্তোত্র

---

৩১ *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ৫৮২।

৩২ ভক্তিমূলক গীতিকবিতার বিষয় ধর্ম ও ভক্তিভাব। অর্থাৎ এ ধরণের গীতিকবিতা ধর্ম ও ভক্তিভাবকে অবলম্বন করে রচিত। এ প্রকার গানে সুরারোপের ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিক ভাবকে প্রাধান্য দেয়া হয়। শঙ্কারাচার্যের 'স্তোত্রমালা', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কোথা তুমি', রামপ্রসাদের 'পদাবলী', গোবিন্দদাসের 'বন্দনাগীতি', Cardinal Newman এর *Lead Me Kindly Light,* Browning এর *Saul*, রবীন্দ্রনাথে গীতাঞ্জলীর 'কবিতানিচয়', রজনী সেনের 'নির্ভর' এই শ্রেণীর কবিতা। দ্র. *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৪৯।

৩৩ বন্দনা মানে স্তব বা স্তুতি। ফলে এ গানের সুরেও ভক্তিভাব প্রতিফলিত হয়। বন্দনামূলক গীতিকবিতা অনেকটা ভক্তিমূলক। যেমন নিশিকান্তের 'অরবিন্দ-বন্দনা'। দ্র. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

৩৪ দেশাত্ববোধক গীতিকবিতা হলো দেশপ্রেমমূলক গান। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, দেশ ও দেশের মাটির প্রতি অনুরাগ, দেশের অতীত বীরত্বের কাহিনীকে আশ্রয় করে কবির ব্যক্তি-অনুভুতি প্রকাশ ঘটে দেশাত্ববোধক গীতিকবিতায়। ফরাসি স্বদেশ-সঙ্গীত *The Mersellaise*, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ', অক্ষয় বড়ালের 'বঙ্গভূমি', যদুগোপালের 'জন্মভূমি', দিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ', প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। দ্র. তদেব।

৩৫ প্রেমের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত গান প্রেমমূলক গীতিকবিতা। এ রচনায় প্রেমের আশা-আনন্দ, নিরাশা-হতাশা, ব্যাথা-বেদনা ইত্যাদি পরিস্ফুট। মোটকথা, কবির আত্মগত ভাবকল্পনার স্বতঃস্ফুর্ত রূপ প্রেমমুলক গীতিকবিতায় বিধৃত। ইংরেজী সাহিত্যে Burns এর *My love is like a red rose,* Donne এর *The Ecstasy*, Browning এর *The Last Ride Together, One word More*, রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তপ্রেম', দেবেন সেনের 'লাজ ভাঙান', গোবিন্দদাসের 'আমি তোরে ভালবাসি', এবং জীবনান্দদাসের 'বনলতা সেন' উল্লেখযোগ্য। দ্র. তদেব।

৩৬ বাহ্য প্রকৃতির রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দকে নিজের অন্তর-রসে সঞ্জীবিত হয়ে আত্মগত ভাবকল্পনার রূপ যে রচনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তার নাম প্রকৃতিবিষয়ক গীতিকবিতা। Wordssworth এর *The Daffodils*, Keats এর *Autumn*, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', নজরুল ইসলামের 'বাদল দিনে', সত্যেন দত্তের 'ঝর্ণা', গোবিন্দদাসের 'বর্ষার বিল', কালিদাস রায়ের 'বাংলার দীঘি', মোহিতলালের 'কালবৈশাখী' এই শ্রেণীর কবিতা। দ্র. তদেব।

৩৭ সনেট কথাটার উৎপত্তি ইতালি ভাষায় 'সনেটো' থেকে। ইটালিয়ান কবি Petrarch (1304-1374) এর জন্মদাতা। সনেটো মানে মৃদুধ্বনি। সনেট এ প্রকার মন্ময় কবিতা। একটি সম্পূর্ণ ভাবকল্পনা চৌদ্দ অক্ষর সমন্বিত চতুর্দশ পঙক্তিতে একটি বিশেষ ছন্দরীতিতে আত্মপ্রকাশ করে সনেট। সনেট দু'ভাবে সম্পূর্ণ। প্রথম আট পঙক্তিতে ভাবকল্পনার ইঙ্গিত

বা প্রশস্তিমূলক গীতিকবিতা,[৩৮] চিন্তামূলক গীতিকবিতা,[৩৯] শোকগীতি,[৪০] রাখালিয়া শোকগীতি,[৪১] লঘু বৈঠকী কবিতা।[৪২]

থাকে এবং শেষ ছয় পঙক্তিতে থাকে ভাবকল্পনার ব্যাখ্যা। প্রথম আট পঙক্তি অষ্টক এবং শেষ ছয় পঙক্তি ষস্টক নামে অভিহিত। অষ্টকের আট পঙক্তি আবার দুভাগে বিভক্ত- প্রত্যেক ভাবে চার পঙক্তি থাকে এবং প্রত্যেকটি পঙক্তির নাম চতুষ্ক। শেষ ছয় পঙক্তির আবার দুভাগে তিন পঙক্তি হিসেবে বিভক্ত ও ত্রিপদিকা নামে পরিচিত। সনেট রচনার কৌশল বিশেষ একটা আঙ্গিক কুশলতার ওপর নির্ভর করে। যে রচনাকার একাধারে কল্পনাপ্রবণ এবং সংযত, সনেট রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। রচনায় উল্লেখযোগ্য কুশলগুলো হলো : সাধারণত চতুর্দশ অক্ষর (কখনো আঠারো অক্ষর সমন্বিত পঙক্তির কবিতা)। একটি মাত্র ভাবের দ্যোতনা থাকে। অষ্টক ও ষস্টকের বিভাগ রক্ষা করে চলা; সনেটের ভাবে গভীরতা ও ভাষার ঋজুতা থাকতে হবে। সনেটের স্বতঃস্ফূর্ত অন্যান্য গীতিকবিতার তুলনায় বেশ কম। ইটালিয়ান কবি পেত্রার্ক, দান্তে, ট্যাসো; ইংরেজ কবি সিডনি, শেকসপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ডি.জি. রসেটি, আর্নল্ড, রুপার্ট ব্রুক প্রভৃতি সুবিখ্যাত সনেট রচয়িতা। বাংলা সনেট রচয়িতা হিসেবে মধুসূদনের নাম সর্বাগ্রে গণ্য। তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে ভাবৈশ্বর্যের দিক হতে 'বঙ্গভাষা' উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছে' যে ভাব গভীর সংহত সনেট বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম চৌধুরী মোহিতলাল প্রমুখ সনেটে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্র. *সাহিত্য কোষ*, পৃ. ৯৬; *সাহিত্য-সন্দর্শন*, পৃ. ৫০-৫৪।

৩৮ 'ওড' (Ode) বা স্তোত্র গ্রিক সাহিত্য থেকে উদ্ভুত। প্রাচীনকালে গ্রিসে রঙ্গমঞ্চে কোরাসে বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সঙ্গীত ও নাচের মাধ্যমে যে গান গাওয়া হতো তাকে 'ওড' বলা হতো। 'ওড' একক বা সমবেতকণ্ঠে গাওয়া চলত। বর্তমানকালে প্রশস্তিমূলক গীতিকবিতায় কোন গম্ভীর বিস্ময়বস্তু বা উপাদানের মাধ্যমে কবির মনের অনুভুতির ভাবমর্যাদার প্রকাশকে স্তোত্র কবিতা নামে আখ্যায়িত করা হয়। গ্রীক সাহিত্যে Alcaeus, Anacreon, Pindar, প্রমুখ কবিগণ স্তোত্র-কবিতা রচনা করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে Gray এবং Collins এর অনুকরণে কবিতা লিখেছেন। Milton এর *Ode on the morning of Christ Nativity*, Dryden এর *Alexander`s Feast*, Gray এর *The Bard*, Collins এর *Ode to Evening*, Wordssworth এর *Intimation Ode*, Shelley এর *Ode to the Westwind*, Keats এর *Ode to a Nightingale*, টেনিসনের *Ode in the Death of the Duke of Wellington* কয়েকটি বিখ্যাত স্তোত্র কবিতা। বাংলায় সুরেন্দ্র মজুমদারের 'মাতৃস্তুতি', অক্ষয় বড়ালের 'মানব বন্দনা', সত্যেন দত্তের 'নমস্কার', রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ', মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' ও 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' উল্লেখযোগ্য। দ্র. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।

৩৯ কবি যখন তার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কবিতায় রূপ দেন তা চিন্তামূলক গীতিকবিতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। Browning এর *Rabbi Ben Ezra*, হেমচন্দ্রের 'জীবন-সঙ্গিত', রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব', মোহিতলালের 'পাপ', যতীন সেন গুপ্তের 'নবপন্থা' এই শ্রেণীর কবিতা। দ্র. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

গীতিকবিতার প্রকারভেদ থেকে এ তথ্য উদঘাটিত হয় যে, কবি মনের প্রকাশের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যেই গীতিকবিতার বিশিষ্টতা বিরাজমান। বিহারী লালের গীতিকবিতায় খাঁটি প্রাণের ভাষায় তার প্রাণের গভীর আকুতি প্রতিফলিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের গীতিকবিতায় নারী কল্পনা বিভুষিত হয়ে উঠেছে। অক্ষয়কুমার বড়ালের গানে আত্মনিষ্ঠতা ও ব্যক্তিগত ভাবতন্ময়তা মুখ্য বিষয়। হেমচন্দ্রের গীতিকবিতায় পাওয়া যায় সহজ ভাব প্রবণতা। মননশীলতা সুরেন্দ্রনাথের গানের বৈশিষ্ট্য। গোবিন্দ দাসের গীতিকবিতায় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বেদনা সাবলীলভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য লঘু সরলতা। নবীনচন্দ্র অনুসরণ করেছেন উচ্ছাস প্রবণতা। করুনা নিধান বন্দোপাধ্যায় প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন গীতিকবিতায়। যতিন্দ্রমোহন বাগচীর গীতিকবিতায় রয়েছে গ্রামবাংলার মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট আর গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনা। জসীম উদদীনের গীতিকবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামীন মানুষের জীবনাচরণ। তিনি অতি সহজ গীতিছন্দে তার গানের অবয়বে গ্রামের অবহেলিত মানুষের রূপচিত্র তুলে ধরেছেন।

সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে গীতিকবিতার যে কয়টি ভাগ রয়েছে সব তাদের রচনায় ফুটে উঠেছে অদ্ভুত সৌন্দর্যরূপ ধারণ করে। গীতিকবিতা রচনা সম্ভারে বাংলা সাহিত্যের ভুবন সমৃদ্ধ ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে। তাদের গীতিকবিতায় বাংলা সাহিত্য ও বাংলা গানের ভুবন হয়েছে সমৃদ্ধ ও ঐশর্যমণ্ডিত। কবি হৃদয়ের প্রেম- ভালোবাসা, ব্যাথা-বেদনা, বিরহ-

---

৪০ গ্রীক ইলেগোস (Elegos) শব্দ থেকে ইংরেজি ইলেজি (Elegy) শব্দটি এসেছে। ইলেজি হলো শোক সঙ্গীত। শোকসঙ্গীতে কবি ব্যক্তিগত বা জাতীয় শোক কাহিনীকে তার রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে গীতিকবিতা রচনা করেন। তবে রচনার ব্যক্তি বিশেষের শোকানুভুতি প্রকাশ করা হলে তাকে 'মোনোডি' বলা হয়। শোকের অনুভুতির যে আন্তরিকতা তার ওপর শোকসঙ্গীতের ভালো মন্দ নির্ভর করে। বাংলা সাহিত্যে শোকসঙ্গীতের মধ্যে বিহারীলালের 'বন্ধু বিদায়', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', রবীন্দ্রনাথের 'স্বরণ', গোবিন্দ দাসের 'বঙ্কিম বিদায়', করুনানিধানের 'উদ্দেশে' ও নজরুল ইসলামের 'চিত্তনামা' উল্লেখযোগ্য। দ্র. *তদেব।*

৪১ রাখালীয় শোকসঙ্গীত বন্ধু বা পরিজনের মৃত্যু উপলক্ষে রাখালের মুখে বেদনার ভাষা প্রয়োগ করে কবি আপন মনের শোক প্রকাশ করেন। অবশ্য এ গীতিকবিতায় কবিকে একটা সুষ্ঠু রাখালিয়া পরিবেশও সৃষ্টি করতে হয়। ইংরেজতে Milton এর *Lycias*, Shelley এর *Adonais*, Aronold এর *Thyrsis*, বাংলায় কালীদাস রায়ের 'কৃষাণীর ব্যাথা', যতীন সেনের 'চাষার ঘরে', এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্র. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬।

৪২ 'ভার্স দ্য সোসিয়েটে' (Verse de Societe) হলো লঘু বৈঠকি গীতিকবিতা। এ প্রকারের গীতিকবিতায় জীবনের হালকা আনন্দ ও সমাজ জীবনের লঘু চিত্র কবির মনের মাধূরী মিশিয়ে ব্যক্তি অনুভূতির দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে রূপ লাভ করে। ইংরেজী সাহিত্যে *Austin Dobson, Herrick* এবং বাংলার অপরাজিতা দেবী ('বুকের বীণা') এই শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন। দ্র. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

হরষ, আশা-আকাঙ্খা, প্রকৃতির রূপাবলি, স্বদেশের গৌরবগাথা রূপায়নের মাধ্যমে তারা গীতিকবিতার জগতে অতুলনীয় রূপৌশ্বর্যে মহিমান্বিত করেছেন।

কাসিদা (قصيدة)

গীতিময়তা ও সাংগীতিকতা আরবি কবিতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন জাহিলি যুগে যথাক্রমে আটপৌরে ও শৈল্পিক গদ্য[৪৩] থেকে আরবি কবিতার ক্রমবিকাশ ঘটে। যার স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট তিনটি ধাপ তথা সাজা'[৪৪] (السجع), রাযাজ[৪৫] (الرجز), ও কাসিদা[৪৬] (قصيدة)

---

৪৩ পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য দু'ভাগে বিভক্ত – গদ্য ও পদ্য। প্রত্যেক সাহিত্যেই গদ্য ও পদ্যের আলাদা রচনাশৈলী রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন আরবি গদ্য সাহিত্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী। আর তার হচ্ছে প্রাচীন আরবি গদ্যে ছন্দশৈলীর ব্যবহার। জাহিলি যুগে আরবি গদ্যে ছন্দরীতির ব্যবহার ছিল সর্বব্যাপী। এ যুগে ছন্দ ছাড়া আরবি গদ্য খুব কমই রচিত রয়েছে। অবশ্য এ যুগের ছান্দিকতা ছিল সহজাত, কষ্ট সৃষ্টিযুক্ত নয়। গণক (كاهن) ও আররাফীনরা (عرافين) ছান্দিক বাক্য ছাড়া কথাই বলতেন না। আরবিতে ছন্দকে السجع ও ছান্দিক রীতিকে الأسلوب المسجع বলা হয়। দ্র. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, পৃ.৩৩। এ যুগের গদ্য সাহিত্য মূলতঃ আমছাল (الأمثال) বা প্রবাদ, হিকাম (الحكام) বা জ্ঞানগর্ভ-উপদেশাবলী, ওয়াসায়া (الوصايا) বা ওসীয়ত, খুতাব (الخطبة) বা বক্তৃতা ও কিসাস (القصاص) বা কাহিনীসমূহ, রাসাইল (الرسائل) পত্রাদি ইত্যাদি। এগুলো স্বাভাবিক, ছোট ছোট বাক্যবিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ শব্দে বিন্যস্ত। তাদের বর্ণনায় কোন অতিরঞ্জন বা মিথ্যার অবকাশ নেই। দ্র. আহমাদ হাসান আয-যায়য়াত, পৃ. ১৮।

৪৪ কবুতরের বাকবাকুম ডাকের (سجع) ন্যায় এ জাতীয় বাক্যের মধ্যেও এক ধরণের সূর ও গীত রয়েছে বলেই একে سجع নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। سجع বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য মূলত: জ্যোতির্বিদ, পুরোহিত ও যাদুকরগণ উপাসনালয়ে প্রয়োগ করতো। জনসাধারণকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করার জন্য পুরোহিতরা শ্লোক বা মন্ত্রের মাধ্যমে এ জাতীয় মনোহরী পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। দ্র. ড. শাওকি যায়ফ, *তারিখুল দাবিল 'আরাবি, আল-আসরুল জাহিলি* (মিসর : দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ১৮৫; জুরজি যায়দান, পৃ. ৫৭; হান্না আল-ফাখূরি, *আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবি* (বৈরুত : দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ১৩২; আহমাদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড (মিসর : মাকতাবাতুত তিজারিয়াহ আল-কুবরা, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ২৪।

৪৫ আরবি কবিতা উন্মেষের মূলে মন্ত্র বা ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের প্রভাব ছিল। তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে উষ্ট্রীচালকদের ছড়ার সুর। তাই দেখা যায় অধিকাংশ কবিতাই ছিল হিদা হিজা, রাযাজ ও কাস্বাস্বমূলক কবিতা। হিদা ছিল কারাভা সঙ্গীত; মরুভূমীতে উটের চলার তালে তালে চালকেরা যে গান গাইতো তা 'আল-হিদা' নামে পরিচিত। যা ছিল সমকালীন সমাজের মানুষের হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, সখ-দুঃখের বর্ণণায় মুখর। হিজা ছিল দ্বন্দ্ব সঙ্গীত; গোত্র বিবাদ ছিল সে যুগের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, সেই গোত্র-যুদ্ধে অনুপ্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে গীত হত হিজা সঙ্গীত। ব্যঙ্গধর্মীতা এই হিজা সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ব্যঙ্গ কবিতা যেমন অনলবর্ষী তেমনি হৃদয়গ্রাহী। রাযাজ ছিল রণসঙ্গীত; এটি প্রায় হিজার

প্রতিটিই ছিল গীতধর্মী। আরবি কবিতা সর্বপ্রথম মুরসাল (المرسل) বা ছন্দমুক্ত গদ্য থেকে মুসাজ্জা (المسجع) বা ছন্দযুক্ত গদ্য তথা সাজা' (السجع);[৪৭]-য় পরিণত হয়। কালের বিবর্তনে এ سجع বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য রাযাজ (الرجز - রণসঙ্গীত) [৪৮] বা অন্ত:মিল সম্পন্ন

সমধর্মী। রাযাজ সঙ্গীতে গোত্রের শৌর্য-বীর্য, সম্মান-সুখ্যাতির কথা এমনভাবে কীর্তিত হত যে, যোদ্ধারা স্বীয় কৌলিন্যের কথা স্বরণ রেখে তাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুদ্ধ করত। কাস্বাস্ব ছিল লোক সঙ্গীত; কাহিনী কেন্দ্রিক সঙ্গীতই এর বিষয়বস্তু। প্রাকইসলামী যুগের বিভিন্ন কর্ণরোচক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হত এ ধরণের জনপ্রিয় সঙ্গীত। প্রেমের মোহাবেশের ঈষৎ স্পর্শে আদিরসের সঙ্কেতে রমণীয়তর এই সঙ্গীতের গীতিধর্ম সংক্ষিপ্ততার বহিরাবরণ ভেদ করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হত। দ্র. অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *প্রাচীন আরবি কবিতা* (কলিকাতা : বাণী বুক স্টল, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ড-ঢ; জাহিলি যুগের الرجز ধ্বনি অন্যান্য ধ্বনির চেয়ে বেশী প্রিয় ছিলো। কারণ তারা সুখ-দু:খ, যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায় ব্যাপক ভাবে الرجز ধ্বনি ব্যবহার করতো। দ্র. সৈয়দ আমির আলি, *এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্স* (হাবিব আহসান অনু.) (কলকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১ম প্র., ১৯৯২ খ্রী.), পৃ. ২; ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমদ, *দিরাসাতু ফি আদাবি ওয়া নুসুসিল আসরিল জাহিলি* (কায়রো : মাকতাবাতুল নাহদাতিল মিসরিয়্যা, ২০০১ খ্রি.), পৃ.১৪২।

৪৬ 'কাসিদা' শব্দটি আরবি قصد ধাতু হতে قصيدة শব্দটি নির্গত যার অর্থ হলো - নিরেট ও পরিপূর্ণ, মূল বা মজ্জা, এবং উদ্দেশ্য ও সংকল্প। কাসিদার অর্থ ভাঙ্গা ও বিভক্তও হয়ে থাকে।

৪৭ জুরজি যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭; হান্না আল-ফাখুরি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২; *জাওয়াহিরুল আদাব*, পৃ. ২৪; ড. শাওকি যায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫; মুহাম্মাদ তফাজ্জল হোসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

৪৮ যুদ্ধে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক কবিতা। দ্র. *প্রাচীন আরবি কবিতা*, পৃ. ড.; আরবি সাহিত্যের 'হিরোইক এইজ'টি বিশ্ব সাহিত্যে খুব গুরুত্ব বহন করে। অন্ধকারযুগসহ এ যুগটির বিস্তৃতি ছিল ৫২৫ খ্রি. থেকে আরম্ভ করে ৬২২ খ্রি. পর্যন্ত। এ সময় বৃহৎ গোত্রগুলো বিভিন্ন কারণে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এসব যুদ্ধ ইতিহাসে 'আইয়ামুল আরাব' নামে খ্যাত। জয়-পরাজয়, হত্যা-লুণ্ঠন ও প্রেম-বিরহসহ এ-সকল যুদ্ধের বহুমুখী অভিজ্ঞতা আরব গোত্রসমূহে অসংখ্য কবির উদ্ভব ঘটায় এবং তাদের বিশ্বমানের কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। বনু বকর ও বনু তাগলিবের মধ্যে সংঘটিত চল্লিশ বছর স্থায়ী 'বাসুস' যুদ্ধের 'দাহিস' এবং 'গাবরা'-র যুদ্ধ গোত্রসমূহের কবিদের কবিত্বশক্তি স্ফুরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু আরব দেশে নয়, প্রাচীন ভারতীয়দের কাব্যপ্রতিভা স্ফুরণে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের, প্রাচীন গিকদের কবিত্বশক্তি বিকাশে ট্রয়ের যুদ্ধের, মধ্যযুগের শেষ ভাগে ইউরোপীয়দের সাহিত্য-বিপ্লবে ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের এবং আধুনিক বাংলা কবিতা ও গদ্য সাহিত্যের উন্নয়নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় যুদ্ধ, প্রতারণা ও সীমালঙ্ঘনের ভূমিকার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কবিতার উল্টরণে প্রেম, মৃত্যু, যুদ্ধ, হতাশা ও বিয়োগান্ত ঘটনাবলি যে অনেকটা অপরিহার্য তা বলাই বাহুল। প্রাচীন গ্রীসের অন্ধ কবি হোমার (১২০০-৮৫০ খ্রি.পূর্ব), মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতালীয় কবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রি.), বৃটিশ কবি শেকসপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রি.), পিতৃপরিত্যক্ত জাহিলি কবি ইমরুউল কায়স (মৃ. ৫৩৯ খ্রি.) প্রাচীন ভারতের বাল্মীকি ও ব্যাসদেব এবং আধুনিক ভারতীয় উপমহাদেশের কবি মির্জা

পংক্তিতে রূপলাভ করে এবং ধীরে ধীরে পূর্নাঙ্গ কাসিদা (قصيدة) হিসেবে প্রকাশ পায়।[৪৯] এর গীতিময়তা আরো অধিক পরিশীলিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তা সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।[৫০] ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে এ সকল কাসিদা শ্রুতিমধুর, সুষমামণ্ডিত, সাবলীল ও সুসম্পন্ন।[৫১]

শিল্পোত্তীর্ণ বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য সম্বলিত 'কাহিনীকাব্য' কে 'কাসিদা' (قصيدة) নামে আখ্যায়িত করা হয়। জাহিলি যুগের আরবি কবিতার চূড়ান্ত রূপ ও সে যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যিক নিদর্শন হল 'কাসিদা' (قصيدة)।[৫২] কবির নিজস্ব ভাবধারা, ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য এ জাতীয় কবিতায় সাবলীল ভাষায় অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফূটিত হয় বলে একে 'কাসিদা' (قصيدة) বলা হয়।[৫৩] কাসিদার প্রতিটি লাইনকে বয়াত বা শ্লোক বলে এবং প্রথম বয়াত বা শ্লোকটিকে مطلع বলে। কাসিদার প্রথম বয়াত থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমানভাবে দুটি

গালিব (জন্ম ১৭৯৮ খ্রি.), আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (জন্ম ১৮৭৭ খ্রি.), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ১৮৬১ খ্রি.), বাঙালী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) প্রমুখ অমর কবির জীবনে কথাটির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্র. এ. কিউ. এস. আবদুস শাকুর খন্দকার, আরবি কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্য ৭, জুলাই২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ৪৩-৪৪।

৪৯ ড. আব্দুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

৫০ আহমাদ হাসান আয-যায়য়াত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯; *জাওয়াহিরুল আদাব*, পৃ. ২৪; জুরজি যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

৫১ আবুল খায়ের মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, আরবি সাহিত্যে রেনেসাঁ ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, কুষ্টিয়া, ৩য় খন্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৪ খ্রী.।

৫২ ড. ইবরাহিম আনিস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (দেওবন্দ : কুতুব খানাহ হুসাইনিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৭৩৮; Kasida, the name is derved from the Arabic root æKasada" with the meaning æto aim at." cf. *The Encyclopaedia of Islam.* Vol. 11 (Leyden : E.J. Brill, 1908), P. 796.

৫৩ 'কাসিদার' সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: An Arabic Kasida is a very artificial composition the same rhyme has to run through the whole of the verses, however long the poem may be. cf. *Encyclopeadia of Islam,* P. 796.; যে সকল ভাষাবিদ কাসিদার অর্থ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য মনে করেন, তাঁদের মতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিল তথা পুরস্কার, সম্মান ও সহানুভূতি লাভের জন্য লিখিত দীর্ঘ আরবি কবিতাকে 'কাসিদা' বলা হয়। দ্র. আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, পৃ. ৪৫; সুন্দরভাবে কেটে ছেটে সুসজ্জিতকারী গাছের মালীকে الأشجار مقصد বলা হয়, তদ্রুপ সুনির্দিষ্ট অর্থবহ শব্দ দ্বারা একটি পরিপূর্ণ কবিতা রচনাকারী কবিকে القصيد مقصد বলা হয়। দ্র. ইবন কুতায়বা, *আশ শি'র ওয়াশ শু'আরা*, পৃ. ১৮; আত-তাহানাবী, *কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনূন*, ২য় খন্ড (কলিকাতা: প্রকাশনালয়ের নাম বিহীন, ১৮৬২ খ্রি.) পৃ. ১১৭৫; কোন কোন ভাষাবিদের মতে : কাসিদার অর্থ সমতা, সঠিকতা, পূর্ণাঙ্গতা ইত্যাদিও হয়ে থাকে। যেহেতু এ জাতীয় কবিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ছন্দ সঠিক ভাবে প্রয়োগ করে এবং সমতা বিধান করে পূর্ণাঙ্গতা দান করা হয়, তাই এ ধরণের কবিতাকে কাসিদা নামে আখ্যায়িত করা হয়। দ্র. R.A. Nicholson, p. 76.

চরণে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি বয়াতের এক একটি চরণ (শ্লোকার্ধ) কে মিসরা বলে।[৫৪] কাসিদায় সাধারণত: ২৫ থেকে ১০০ পর্যন্ত বায়াত বা শ্লোক থাকে।[৫৫] ২৫ টির কম হলে তাকে قطعة বলা হয়। কখনও কখনও একশত এর বেশী শ্লোকও কাসিদাতে পাওয়া যায়।[৫৬] যেমন কবি মু'আল্লাকাতভুক্ত কাসিদাগুলো অন্যান্য কাব্যসমূহের চেয়ে বেশী দীর্ঘ। এগুলোর সর্ব নিম্ন চরণ সংখ্যা ৬৪ এবং সর্বোচ্চ ১১৫ টি। কাসিদাগুলোর আকার দীর্ঘ হওয়ায় কেউ কেউ এগুলোকে তিওয়াল (الطوال)[৫৭] বা 'দীর্ঘকবিতা'[৫৮] নামে আখ্যায়িত

---

৫৪ মুহাম্মদ সোলায়মান, *আরবি কাসিদা : উৎপত্তি ও বিকাশ* ৪র্থ খন্ড, ১ম সংখ্যা (কুষ্টিয়া: ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ষ্টাডিজ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭৩; সাধারণত: কাসিদার প্রতিটি বায়াতের দু' মিসরার শেষ অক্ষরে অন্ত:মিল পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে এ মিল প্রতিটি বায়াতের শেষ মিসরার শেষ অক্ষরে পরিদৃষ্ট হয়। অন্ত:মিলের অক্ষরের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন কাসিদাকে বিভিন্ন আক্ষরিক নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যেমন: শেষ অক্ষরে "লাম" বিশিষ্ট কাসিদাকে "কাসিদা লামিয়্যা" "মিম" বিশিষ্ট কাসিদাকে "কাসিদা মিমিয়্যা", "রা" বিশিষ্ট কাসিদাকে "কাসিদা রায়িয়্যা" নামে অভিহিত করা হয়। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৭ম খন্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৫৬৭।

৫৫ æThe verses of which it is built vary in number, by are seldom less than twenty five or more than a hundred." cf.: R.A. Nicholson, p. 77.; ড. ইবরাহীম আনীস, পৃ.৭৩৮; *The Encyclopedia Americana*, Vol. II (Danbury : Aericana Corporation, 1981), p. 153.; William Benton, *Encyclopedia Britannica,* Vol. II (Chicago : Britannica Corporation, 1973), p. 184.

৫৬ E.G. Browne. *A Literary History of Persia,* Voll-2 (Chambridge : 1953). p.29.

৫৭ আহমদ ইবন আল-আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬; জুরজি যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২; ইউসুফ আস'আদ আদ-দাগির, *মাসাদিরুদ দিরাসিয়্যাহ আল-আদাবিয়্যাহ*, ১ম খন্ড, (লেবানন : প্রকাশনালয় ও তা. বি.), পৃ. ৪২; R. A. Nicholson, p. 103.

৫৮ দীর্ঘকবিতা : বিশ্বকবিতার নিরিখে দেখলে, দীর্ঘকবিতা সুপ্রাচীন ও স্বতন্ত্র এক সাহিত্যিক-রূপবন্ধ, যা কিনা চলে আসছে খ্রিষ্ট-জন্মের তিন-চারশ বছর আগে থেকে। কবির মনে যখন এমন কোনও বক্তব্য-বিষয় জমে ওঠে, যা বলবার জন্য বিস্তৃত পরিসর প্রয়োজন-তখনই রচিত হয়ে যায় দীর্ঘকবিতা। কবি, এমনকি, নিজেও বুঝে ওঠেন না, কখন, কোন ফাঁকে ঘটে গেল এমন ঘটনা, অর্থাৎ দীর্ঘকবিতা এমন কোনও কলাকৌশল নয় যে, দৈর্ঘ-প্রস্থ নিরূপণ করে, নকসা করে তা বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্ডওয়ার্থ যেমনটি মনে করতেন, 'কবি অকপটে নিজের সাথে ও পৃথিবীর সকল মানুষের সাথে কলা বলেন কবিতা' এবং এই অকপট বাক্যালাপ শেষে, বিস্মিত হয়ে যখন দেখে অনেক প্রসঙ্গে বহুবিধ কথা বলা হয়ে গেছে; তখনই আমরা দীর্ঘকবিতা হিসেবে চিহ্নিত করি, ওইসব কাব্যকৃতিকে। অবশ্য কোলরিজ দীর্ঘকবিতার ফর্মকে স্বীকার করতে চাননি। তিনি এবিষয়ে বলেছেন-'কবিতা দীর্ঘ হলে তা আর কবিতা থাকেনা।' অনেকে দীর্ঘ আকৃতির অর্থাৎ ৫০/৬০/৭০ অথবা এরও অধিক চরণের গীতিকবিতা (Lyric) কে দীর্ঘকবিতা বলে বিভ্রান্তের সৃষ্টি করেন। আয়তনে দীর্ঘ কোন কবিতাই দীর্ঘকবিতা নয়; দীর্ঘ আয়তন অবশ্যই দীর্ঘকবিতা হয়ে ওঠার অন্যতম শর্ত, কিন্তু একমাত্র শর্ত নয়। অনেক সময় ক্ষুদ্র ফর্মের কবিতাও দীর্ঘকবিতা হতে পারে। সেটা নির্ভর করে বিষয়বস্তু, বোধের গভীরতা, জার্নি এবং প্রকাশভঙ্গির উপর। নব্য ক্লাসিক কবি আভিং ব্যাবিট টি.এস. এলিয়টকে দীর্ঘকবিতা রচনায় রাস্তা দেখান এবং সে পথ ধরেই এলিয়ট 'ওয়েষ্ট ল্যান্ড' এর মতো দীর্ঘকবিতা লিখে নোবেল পুরস্কার পান। বিশ্বসাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকবিতা রচনা ও চর্চা হলেও কেউ স্পষ্টভাবে এর ফর্ম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এরপরেও তাদের অনেক কবিতা আঙ্গিক বা

করেছেন।[৫৯] কিন্তু আকারে দীর্ঘ হলেও 'দীর্ঘকবিতা'-র আরও যেসব শর্তাবলী রয়েছে তা কাসিদাগুলোতে নেই। মূলতঃ অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের 'দীর্ঘকবিতা' বলতে যা বুঝায় তদ্রুপ কবিতার তুলনায় কাসিদা অতি ক্ষুদ্র।[৬০] ফলে কাসিদাকে 'দীর্ঘকবিতা' বলা যায় না। জাহিলি যুগে যদিও ছন্দবিজ্ঞান আবিস্কার হয়নি, তথাপিও আরবদের স্বভাবজনিত কাব্যিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা বিভিন্ন ছন্দে কবিতা রচনা করতো।[৬১] প্রতিটি কাসিদাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ছন্দ বিদ্যমান থাকে। প্রাচীন আরবের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্য সংকলন 'আস-সাব'উল মু'আল্লাকাত' এর তিনটি কাসিদা তাবীল ছন্দে এবং দুটি কাসিদা কামিল ছন্দে রচিত হয়েছে। সে যুগের খ্যাতনামা কবি কা'ব ইবন যুহায়র রচিত 'বানাত সু'আদ' কাসিদাটি বাসীত ছন্দে রচিত হয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। পরবর্তী যুগের কবিগণ শুধুমাত্র তিনটি ছন্দকেই প্রাধান্য না দিয়ে অন্যান্য ছন্দের মাধ্যমে ও তাঁদের কাসিদা রচনা করেছেন। আরবি সাহিত্য বিশারদগণের মতে কবি মুহালহিল ইবন রাবী'আ তাঁর ভ্রাতা কুলায়বের মৃত্যুতে ৩০ লাইনের যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন তা-ই আরবি সাহিত্যের প্রথম কাসিদা।[৬২] সে কবিতাটির কিয়দাংশ নিম্নরূপ :

প্রকরণগতভাবে এবং বিষয়বস্তুতে দীর্ঘকবিতার প্রাণবিন্দু ছুঁয়েছে। মলয় রায় চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক দীর্ঘকবিতা 'জখম' প্রকাশ করেন ১৯৬৫ সালে।

৫৯ আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬; *'অস্-সব'উ-ল্-মু'অল্লকাত*, পৃ. ১৯; গোলাম সামদানী কোরায়শী, *আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৮-৯; অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *প্রাচীন আরবি কবিতা* (কলিকাতা : বাণী বুক স্টল, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ), ভূমিকাংশ।

৬০ আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।

৬১ ছন্দকে আরবিতে بحر 'বাহার' বলে। প্রাচীন আরবি কবিতা তথা কাসিদা ষোলটি بحر বা ছন্দে রচিত। ব্যাকরণবিদ খলিল ইবন আহমদ (মৃ: ৭৯১ খ্রী.) সর্বপ্রথম এ ছন্দবিজ্ঞান আবিষ্কার করেন। তিনি ১৫ টি বাহার চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সা'ঈদ ইবন মুস'ঈদাহ আবুল হাসান আল-আখফাশ আরও ১টি বাহার যুক্ত করে ১৬টি বাহার চূড়ান্ত করেন। বাহ্‌রগুলো হলো যথাক্রমে (১) তা'বিল (২) মাদিদ (৩) বাসিত (৪) ওয়াফির (৫) কামিল (৬) হাযাজ (৭) রাজায (৮) রামাল (৯) সারিহ (১০) মুনসারিহ (১১) খাফিফ (১২) মুদারি (১৩) মুকতাদাব (১৪) মু'জতা (১৫) মুতাকারিব (১৬) মুতাদারিক। দ্র. মুহাম্মদ যিয়া আল-দিন আল-সাবুনি, *আল-মু'জায ফিল বালাগাহ ওয়াল-'আরূদ* (মক্কা: মাতবা'আতুর রাবিতাতিল 'আলামিল ইসলামী, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১০৭; নাসিফ আল-ইয়াজিযি, *মাজমা'উল-আদাব ফি ফুনূনিল অ'ারাব* (বৈরুত : আল-মাতবা'আতুল আমেরিকানিয়্যাহ, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ১৮০; আব্দুল মুন'ঈম খাফাজি, *আশ-শি'রিল 'আরাবি আওয়ানুহু ওয়া কাওয়াফিহি*, (কায়রো: প্রকাশনালয়ের নাম বিহীন, ১৯৪৮ খ্রি.) পৃ. ৩১-৪৬।

৬২ বনু বকর ও বনু তাগলিবের মধ্যে সংঘটিত চল্লিশ বছর স্থায়ী বাসুস যুদ্ধের সময় গোত্রীয় নেতা বীর যোদ্ধা কুলাইবের ভাই মুহালহিল তাগলিব গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আবির্ভূত হন। যুদ্ধের শুরুতে কুলাইবের নিহত হবার ঘটনায় ভ্রাতৃশোকে ত্রিশ শ্লোকের একটি কাসিদা রচনা করে, যা ছিল প্রথম দীর্ঘতম কাসিদা, মুহালহিল আরবি কাসিদা তথা কবিতার পথিকৃৎ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। দ্র. এ. কিউ. এস. আবদুস শাকুর খন্দকার, আরবি কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড ৫, সংখ্য ৭, জুলাই২০১১-জুন২০১২, পৃ. ৪৩; يقال ان مهلهل اول من قصد القصائد و هو خال امرؤ القيس و جد عمرو بن كلثوم. দ্র. আবী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতায়বা আল-দিনওয়ারি *আশ শি'র ওয়াশ শু'আরা আও তাবাকুতশ শু'আরা* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৩৪; *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫ জুরজি

نبئت ان النار بعدك اوقدت * واستب بعدك ياكليب المجلس
وتكلموا فى أمر كل عظيمة * لو كنت شاهد هم بها لم ينسبوا[৬৩]

* হে কুলায়ব ! আমি তোমাকে অবহিত করছি যে, নিশ্চয় অগ্নী তোমার প্রস্থানের পর প্রজ্বলিত হয়েছে।

* তারা এমন প্রত্যেক মহান বিষয়ে পরস্পর পরস্পরে আলাপ করেছে, যদি তুমি উপস্থিত থাকতে তাহলে তুমিও তাদের সাথে জড়িয়ে পড়তে।

উকায[৬৪] মেলায় কাব্য প্রতিযোগিতায় কাসিদা গাওয়া হতো। বিচারকদের বিচারে প্রথমস্থান অধিকারী শ্রেষ্ঠ কবিতাটি কা'বা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতে। এজন্য ঐসব কাসিদাগুলো 'মু'আল্লাকাত'[৬৫] নামেই সমধিক বিশেষিত ও সর্বজন বিদিত।[৬৬] বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায় মু'আল্লাকাভুক্ত গীতিকবিতাগুলোর প্রত্যেকটিই 'উকায' মেলায় প্রথম হওয়ায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে এবং বিজয়ী শ্রেষ্ঠ কাসিদাগুলো কা'বা ঘরের দেয়ালে

যায়দান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১; আহমাদ হাসান আয-যায়য়াত, পৃ. ৪৮; The first Arabian ode was composed, according to tradition, by Muhalhil b. Rabia the Taghlibite on the death of his brother kulayb. cf. R.A. Nicholson, p. 76;

৬৩ আবি তাম্মাম হাবিব ইবন আওস আত-তাই, *দিওয়ানুল হামাসাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি. / ১৪১৮ হি.), পৃ. ২৭৭-২৭৮।

৬৪ 'উকায' মেলা : জাহিলি যুগে (৪৫০-৬২২ খ্রি.) আরবের সাংস্কৃতিক বিকাশে 'উকায' মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। মক্কার অনতিদূর নাখলাহ্ ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'উকায' নামক স্থানে প্রতি বৎসর যুল কাদ মাসে বিশ দিন ব্যাপি এক বার্ষিক মেলা বসতো। যুল কা'দা, যুল-হাজ্জ ও মহররম এই তিন মাস যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাত করা নিষিদ্ধ ছিল। এ ছিল ''এক ধরণের ঐশী যুদ্ধ বিরতি।' 'উকায' ছিল আরব দেশের 'অলিমপিয়া'। এখানে তারা শুধু বাণিজ্য করতেই আসতো না; তারা আসতো তাদের পরাক্রম ও গৌরবগাথা ঘোষণা করতে; কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রদর্শন করতে। ফলে এ মেলায় নির্বিবাদে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলতো। 'উকায' মেলা ছিল কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞজনদের মিলনকেন্দ্র। এ মেলা আরবের ''Academic franchise" হিসেবে কাজ করতো। দ্র. ইবন 'আবদি রাব্বিহি, *আল-ইকদুল ফারিদ*, ৩য় খণ্ড (কায়রো : লাজনাতুত তা'লিফ, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ১১৬; সৈয়দ আমির আলি, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* (বাংলা অনুবাদ) (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, নতুন সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭৩-৭৪; 'উকায' মেলাকে 'জন বানিয়ান' এর 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' এর কাল্পনিক মেলা 'ভ্যানিটি ফেয়ার' এর সাথে তুলনা করা যায়। এ মেলায় ইটালি, জার্মান, ফ্রান্স, ইংল্যাডসহ প্রভৃতি দেশ তাদেও নিজস্ব উৎপাদিত জিনিষপত্র বিক্রির জন্য প্রদর্শন করতো। ঐ মেলাতে প্রতিটি দেশের জন্য একটি করে লাইন বরাদ্দ ছিল। যদিও তার এ মেলার বর্ণনা ছিল সম্পুর্ণ কাল্পনিক ও ব্যাঙ্গাত্মক। দ্র. ইকবাল শাইলো, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম* (ঢাকা : সবুজপাতা প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৮।

৬৫ মু'আল্লাকা হলো জাহিলি যুগের কতগুলো সর্বোত্তম কাসিদার প্রসিদ্ধ নাম। 'উকায' মেলায় শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত কবিতাগুলো সকলের পঠনের সুবিধার্থে মিসরিয় লিলেন কাপড়ের উপর সোনালী অক্ষরে লিখে কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। তাই এ কাসিদাগুলোকে 'মু'আল্লাকা' বলা হয়। দ্র. হান্না-আল ফাখূরি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫; আহমদ ইসকান্দারি গং, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আদাবিল 'আরাবি*, ১ম খন্ড (বৈরুত : দারু এহইয়াউল উলুম, ১৯৯৪ খ্রি./ ১৪১৪ হি.), পৃ. ৪৮।

৬৬ কাযি হুসায়ন ইবন আহমাদ আয-যাওযানি, *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'আ* (বৈরুত : দারু ইবন কাছির, ১৯২৯ খ্রি.), পৃ. ১৪।

ঝুলিয়ে রাখা হতো।[৬৭] কেউ কেউ বলেন : আরবগণ এসব কবিতাকে তদের মূর্তির মতো সিজদা করতো।[৬৮] আবার কোথাও কোথাও 'কাসায়িদুল মাশহুরাহ' নামকরণ করা হয়েছে।[৬৯]

আরবি সাহিত্যবিশারদদের কেউ কেউ কাসিদাকে 'গীতিকা'[৭০] নামেও আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন।[৭১] কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের বিচারে কাসিদা 'গীতিকা' নয় বরং 'গীতিকবিতা'। কেউ আবার কাসিদার ইংরেজী প্রতিশব্দ করেছেন 'ওড' (Ode)।[৭২] কিন্তু ওডের বাংলা অর্থ হলো স্তোত্র বা প্রশস্তিগীতি।[৭৩] আরবিতে যাকে বলা হয় 'মাদিহা' বা প্রশংসাগীতি। যা বাংলা ও আরবি গীতিকবিতার একটি শাখামাত্র। সুতরাং বলা যায় যে, কাসিদা 'দীর্ঘকবিতা'ও নয় আবার 'গীতিকা'ও নয়। কাসিদা হলো শুধুই 'গীতিকবিতা'।

কাসিদা (قصيدة) ও গীতিকবিতা

গীতিকবিতার আরবি হলো 'শি'র গিনা'ঈ' (الشعر الغنائي)। কবিতা (الشعر) ও সঙ্গীত (الغنائي) আভিধানিক অর্থে না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায় সমার্থক। আরবি কবিতা ও সঙ্গীত কোন কালেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল না। জাহিলি যুগের কাসিদাও ছিলো মূলত: গীতিকবিতা। ইউরোপ তথা প্রাচীন গ্রিসে গীতিকবিতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।[৭৪] তাই

---

৬৭ *রিজালুল মু'আল্লাকাতিল 'আশার*, পৃ. ৫৮; æLegend has it that each of these odes was awarded the annual prize at the fair of ' Ukaz and was inscribed in golden letters and suspended on the walls of the Ka'bah. cf. P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan ST Martins Press, 1972), p .93

৬৮ মুস্তফা সাদিক আর-রাফিয়ি', *তারিখুল আদাবিল 'আরাবি*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবি, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৮৩;

৬৯ জুরজি যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬ ; ড. শাওকি যায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।

৭০ **গীতিকা :** একটি মাত্র কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটকীয় গ্রন্থন ক্রিয়া, চরিত্র ও ঘটনাবৈচিত্রের মাধ্যমে যা অগ্রসর হয় এবং গীত হওয়ার জন্যই যা রচিত হয় তাই গীতিকা নামে পরিচিত। বাংলায় যা গীতিকা, ইংরেজীতে তাই ব্যালাড (Ballad)। অন্যান্ন লোক সাহিত্য শাখার মত গীতিকা আদিম সমাজে সৃষ্ট হয় নাই। ইহা অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গীতিকার সংকলন। দ্র. বাংলাবিশ্বকোষ, ২য় খন্ড (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ.৩২৭; বাংলাপিডিয়া (ঢাকা :বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৬-১৭৮।

৭১ *'অস্-সব'উ-ল্-মু'অল্লকাত*, ভূমিকাংশ; হাফেজ মাওলানা মো. আবু আশরাফ, *সাবা'য়ে মু'য়াল্লাকাত* (ঢাকা : দারুল উলুম পাবলিকেশান্স, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৫; *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম*, পৃ. ২৪-২৮।

৭২ A.J. Arberry, *The Seven Odes* (New York : The Macmillan Company, 1957), p. 7-30.

৭৩ *সাহিত্য সন্দর্শন*, পৃ. ৫৪।

৭৪ প্রাচীন গ্রিক কাব্যসাহিত্য ছিল প্রধানত দু'ধরণের যথা : মহাকাব্যিক (Epic) এবং নাট্যকবিতা (Dramatic)। মহাকাব্যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। যাতে বর্ণিত হয় বংশ পরম্পরায় কয়েক পুরুষের যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্থান-পতনের ইতিহাস আর কবির নিজ গোষ্ঠীর সাথে তার প্রতিদ্বন্দী গোষ্ঠীর নায়কবৃন্দের

বলে আরবি কবিতার গীতিময়তা বাইরের কোনো সংস্কৃতি থেকে আমদানী বা আনয়ন করা হয়েছে তা নয়। বরং তা বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হিজায ও নজদের মরুভূমির গভীরে বসবাসকারী জাহিলি যুগের বেদুঈন কবিগণ কর্তৃক মৌলিকভাবেই উদ্ভাবিত। ছন্দ ও অন্ত্যমিলভিত্তিক আরবি কাসিদার সাঙ্গীতিকতা ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগের আরব উপদ্বীপে বিশুদ্ধ আরবীয় পরিবেশে কবিতাকে আশ্রয় করেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে, বাইরের কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে নয়। কারণ, প্রথমত জাহিলি যুগে আরব উপদ্বীপ বহির্দেশীয় যেকোনো সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন ছিল। দ্বিতীয়ত মরুবেষ্টিত নিরক্ষর যাযাবর আরবদের জীবনধারণ পদ্ধতিও ছিল এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার সভ্য জাতিসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তৃতীয়ত বিষয়বস্তু, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের দিক থেকে পারসিক, গ্রিক ও রোমকদের কবিতা ছিল অনেকটাই অন্যরকম। তাদের কবিতা ছিল প্রধানত মহাকাব্যিক ও অভিনয়ধর্মী।[৭৫]

ইতিপূর্বে আমরা গীতিকবিতার যে সংজ্ঞা, শর্ত ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি সে আলোকে আরবি কাসিদা গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে কিনা তা আলোচনার দাবী রাখে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, কাসিদায় কবি নিজস্ব ব্যক্তি জীবনের ঘটনা ব্যক্ত করেন সুললিত কাব্য ঝংকারে, বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে, যেখানে কোন আতিশয্য থাকে না, থাকেনা কোন কৃত্রিমতার বাহুল্য। মু'আল্লাকাতভুক্ত ইমরু'উল কায়সের কাসিদা এর সেরা নিদর্শন।[৭৬] কাসিদায় সাধারণত কবিসত্তা এবং তাঁর মানসিক আবেগ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি প্রকাশ পায়।[৭৭] এ গানসদৃশ কাসিদায় কবি তাঁর আনন্দ অথবা দু:খের চিত্র অংকন করে থাকেন।[৭৮] এ জাতীয় কাসিদা সাধারণত: কবির অন্তর্মুখী হয়ে থাকে।

গোত্রপ্রেম ও শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের নীতিমালা। প্রাচীন কালে অন্যান্য ভাষাতেও অসংখ্য কাহিনী আশ্রিত কবিতা রচিত হয়েছে। কবি হোমারের ইলিয়ড, ভারত বর্ষের মহাভারত, ফেরদৌসীর শাহনামা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নাট্যকবিতায় কবিগণ যে সকল কবিতায় কোন ঘটনাকে বিভিন্ন ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন তাকেই নাট্য কবিতা বলা হয়। এগুলো মূলত: ড্রামাটিক বা নাটকীয় উপাদান সমন্বিত কবিতা। যার মধ্যে কবি নাটকীয় কৌশল অবলম্বন করে শ্রোতা তথা পাঠকের নিকট কোন রাজ-রাজড়ার সঙ্গে সংঘটিত বিশেষ পটভূমিকায় উপস্থাপন করেন অর্থনীতি আর সমাজনীতির প্রচলিত ব্যবস্থাপনার বিষময় চিত্র। দ্র. ড. গুনায়মি হিলাল, *আল-আদাবুল মুকারান* (মিসর : দারুন নাহদা, তা. বি.) পৃ. ৩১১; হান্না আল-ফাখূরি, *তারিখুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা ওয়াল-আদাবিল আরাবি* (প্রকাশনালয় ও তারিখ বিহীন), পৃ. ১০০১; জুরজি যায়দান, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫ ও ৫৬; আহমদ হাসান আয-যায়য়াত, পৃ. ৩০-৩২; *আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা*, পৃ. ৯০, ৯১; *আল-'আসরুল জাহিলি*, পৃ. ১৮৯; *মিন তারিখিল আদাবিল 'আরাবি*, ১ম খন্ড, পৃ. ৭০।

৭৫ মুহাম্মদ উসমান আলি, *ফি আদাবী মা কাবলাল ইসলাম* (লিবিয়া : দারুল আওয়াঈ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১০৩-১০৪।

৭৬ *প্রাচীন আরবি কবিতা*, পৃ. ভূমিকা, ঢ।

৭৭ ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২; ড. আলি জুনদি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

৭৮ ড. এ. এম. এম. আবদুল গফুর চৌধুরী, *আরবি সাহিত্যের ইতিহাস* (জাহিলি যুগ) (চট্টগ্রাম : আনন প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬০; ড. মুকতাদা হাসান আযহারি, *আরবি সাহিত্যের ইতিহাস*, বঙ্গানুবাদ: ড. মো. আব্দুস সালাম ও অন্যান্য, ১ম খণ্ড, (রাজশাহী : মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৪০; ড. শাওকি যায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০; ড. আলি জুনদি, পৃ.২৭৫।

যেখানে কবির আপন সত্তা, মনের আশা-আকাঙ্খা, উল্লাস, কৃতিত্ব, বিরহ, বেদনা, ব্যথা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়ে থাকে। এখানে বাইরের কোন বিষয়ের বিবেচনা কবির অনুভূতি, মানসিক সংবেদন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে প্রভাবিত করতে পারেনা। এসব কাসিদায় কবি নিজস্ব ভঙ্গিমায় চিত্রায়িত হয়ে থাকেন।[৭৯] অনেক গায়ক-কবি মূল বিষয়বস্তুর সাথে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুরও আলোচনা করতেন। এ ধরণের কবিতাকে الاستطراد বলা হয়।[৮০] জাহিলি যুগে প্রচলিত আরবি কবিতা ছিলো গীতিধর্মী এতে কোন সন্দেহ নেই।[৮১] সে যুগের কবিরা প্রেমগাথা (الغزل), বর্ননা মূলক (الوصف), গৌরবগাথা (الفخرية), বীরত্বগাথা (الحماسة), প্রশংসাগাথা (المدح), ব্যাঙ্গকবিতা (الهجاء), মদের বর্ণনা (الخمرية), শোকগাথা (الرثاء), ওজর পেশ করা (الإعتذار), জ্ঞানগর্ভ কবিতা ও প্রবাদ প্রবচন (الحكم والإمثال) প্রভৃতি কাসিদাসমূহকে তারা 'বীণা' নামক বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলে গাইতেন। এসব কাসিদা জাহিলি সমাজে গীতিকবিতা হিসেবে গণ্য হতো। সুপ্রাচীনকাল হতে গ্রিকরাও এ ধরণের গীতিকবিতা অনুশীলন করে আসছিলেন। তাই ইউরোপিয় অর্থেও জাহিলি যুগের সকল কবিতাকে গীতিকবিতা হিসেবে বিবেচিত করা যায়।[৮২] বিষয়বস্তুর দিক থেকেও কাসিদাকে গীতিকবিতা বলা যেতে পারে। কেননা বাংলা ও ইংরেজী গীতিকবিতায় বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি প্রেম তথা রোমান্টিসিজম উল্লেখযোগ্য। ঠিক তেমনিভাবে দেখা যায় আরবি কাসিদাগুলোতেও রোমান্টিসিজমের সবকটি উপাদান পাওয়া যায়।[৮৩]

একজন আরব কবি আরব উপদ্বীপের পারিপার্শ্বিকতা ও সমসাময়িক প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির যে কোন বৈশিষ্ট্যধর্মী কবিতাই রচনা করুন না কেন, তিনি তাতে আপন চিত্রই তুলে ধরার প্রয়াস পান। গ্রিক কবিতায় কবিকেই গান গাইতে হয়। এসব বৈশিষ্ট্য বা রীতি বিবেচনা করলেও আরবি কবিতা গীতিকবিতার আওতায় পড়ে। কেননা, প্রাচীন আরব কবিগণ কবিতার দ্বারা নিজেরাই নিজস্ব ভঙ্গিতে সুর তুলতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, কবিতা গানের সাথে সম্পৃক্ত।[৮৪] মোটকথা গান ছিলো আরবি কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ জন্যই আরবগণ কবিতা আবৃত্তিকে ইনশাদ (انشاد) ও হুদা (الحدا) নামে অভিহিত

---

৭৯ ড. *শাওকী যায়ফ*, পৃ. ১৯০।

৮০ *প্রাগুক্ত*। এই استطراد মুলক কবিতা জাহিলি কবিতার অর্থগত বৈশিষ্টের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। তা হচ্ছে যে, কবি তার কবিতায় একটি অর্থ চয়ন করে অন্য অর্থে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে তার বক্তব্যকে বিস্তৃত করে, পুনরায় প্রথম অর্থের দিকে ফিরে আসাই استطراد। দ্র. ড. হাসান শাযলি ফারহুদ গং, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

৮১ আবি আলি আল-হাসান ইবন রশিক আল-কায়রোআনী আল-আজদি, *আল-'উমদাহ ফি মুহাসিনিশ শি'র ওয়া আদাবিহি ওয়া নাকদিহি*, ২য় খন্ড (বৈরুত : দারুল জিল, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৪১; ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪২।

৮২ ড. শাওকি যায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯-১৯১।

৮৩ রোমান্টিসিজমের উপাদান তথা কল্পনা, ইমাজিনেশন, ফেন্সী, প্রকৃতি,ভাবাবেগ, শিশু জীবন, মানবতাবাদ, রহস্য, দুঃখ, বিষাদ, নস্টালজিয়া, পিছুটান, আত্মবর্ণনা প্রভৃতি কাসিদায় ব্যাপকভাবে এসেছে। দ্র. *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা*, পৃ. ৭।

৮৪ ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

করতো। কবিগণ গান গাওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কবিতা রচনা করতেন এবং এক বিশেষ সুরের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতেন। শুরু থেকেই কবিগণ নিজেরাই নিজেদের কবিতা দিয়ে গান গেয়েছেন। কাসিদার জনক বলে কথিত মুহালহিল ইবন রাবি'আহ (মৃ.৫৩১ খ্রি.) তাঁর এ কাসিদাটি সুর করে গাইতে খুবই পছন্দ করতেন, যার শুরুটা ছিল :

طفلة ما ابنة المحلل بيضا * ء لعوب لذيذة فى العناق[৮৫]

* (আরবের অধিবাসী) মুহালহিলের এক শিশু কন্যা ছিলো। যার (শরীরের রং) ছিলো সাদা (শুভ্র) আর ঘাড়ে ছিলো এক চমকপ্রদ চিহ্ন।

আবুল ফারাজ আল-ইসপাহানি (মৃ.৩৫৬ হি.) তার বিশ্বকোষাকৃতির 'কিতাবুল আগানি' (২১ খণ্ডে প্রকাশিত) গ্রন্থের একাধিক স্থানে তা এবং নিজেদের কবিতা দিয়ে গান গাওয়ার বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। জাহিলি যুগের সঙ্গীতপ্রিয় কবি সুলাইক ইবন সুলাকাহ (মৃ. ৬০৫ খ্রি.), 'আলকামা ইবন 'আবাদাহ আল-ফাহল (মৃ. ৫৬১ খ্রি.), আল-আ'শা (মৃ. ৬২৯ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ স্বীয় কবিতাকে বাদ্য যন্ত্রের মাধ্যমে গান হিসেবে গেয়ে বেড়াতেন।[৮৬] শুধু সুর ও সঙ্গীতের কথাই নয় অনেক জাহিলি কবিতায় সরাসরি পেশাদার গায়িকা এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কথাও উল্লেখিত হয়েছে।[৮৭] জাহিলি যুগে বহুল প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে মৃদঙ্গ বা ঢোল (طبل), খঞ্জনি (دف), মন্দিরা বা করতাল (الصنج), বীনা (مزهر,عود), একতারা বা দোতারা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র (بربط), তারযুক্ত Mandolin বাদ্যযন্ত্র (طنبور) বাঁশিসদৃশ বাদ্যযন্ত্র (مرمار) বিষাণ বা বিউগল (بوق), চর্মাবৃত তবলাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র (كانا) ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা 'তবলা' শব্দটি সম্ভবত আরবি (طبل) শব্দ থেকে এসেছে। 'আলকামার কবিতায় বীনা (مزهر,عود) এবং আল-আ'শার কবিতায় করতাল (الصنج) নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়।

'আলকামা ইবন 'আবাদা বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক সময় তিনি প্রতিনিধি হিসেবে গাসসানি রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কয়েকজন বাইজান্টাইন রমণীকে 'মিযহার' বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান পরিবেশন করতে প্রত্যক্ষ করেছেন। হিরা সাম্রাজ্যেও তিনি এ জাতীয় গায়িকাদের গান প্রত্যক্ষ করেন। যেমন : 'আলকামা আল-ফাহল, তাঁর বিখ্যাত কাসিদা 'মিমিইয়া'র একটি শ্লোকে বলেন :

قد اشهد الشرب فيهم مزهر رنم * والقوم تصرعهم صهباء خرطوم[৮৮]

* বাদ্যযন্ত্রের তাল মিলিয়ে তাদের মাঝে মদ উপস্থিত করা হয়েছে। আর একটি গোত্র তখন রক্তিম বর্ণে শুঁড়ের আকার ধারণ করে।

---

৮৫ আবুল ফারাজ আল-ইসপাহানি, *আল-আগানি*, ৫ম খণ্ড (মিসর : দার আল-কুতুব, তা. বি.), পৃ. ৫১।

৮৬ ড. শাওাক যায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯-১৯১।

৮৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

৮৮ আবুল আব্বাস মুফাদদাল ইবন মুহাম্মদ আদ-দাব্বি, *দিওয়ানুল মুফাদদালিয়াত* (বৈরুত : দারুল ফিকর আল-লুবনানি, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪২০; মুহাম্মদ উসমান আলি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

কবি আল-আ'শা-ই সর্বপ্রথম আল-সনজ নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[৮৯] তিনি শ্রেষ্ঠ দশজন জাহিলি কবির অন্তর্ভুক্ত, পেশাদার চারণ-কবি হিসেবে পরিচিত, ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় বিশেষ পারদর্শী এবং মদ্য ও মদ্যপানের আসরের বর্ণনায় অধিক পারঙ্গম কবি আল-আ'শা মাইমুন ইবন কায়েস তাঁর মু'আল্লাকায় বলেন:

و مستجيب تخال الصنج يسمعه * إذا ترجع فيه القينة الفضل[৯০]

* (সঙ্গীত আসরে) সম্মানিতা গায়িকা যখন বাদ্যযন্ত্র পরিচালনা করছিলেন, তখন তিনি তার শুনে সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কবি আল-আ'শা তার নিত্যসঙ্গী মন্দিরা বা করতাল (আরবি নাম 'সনজ') নিয়ে সারা আরবদেশ ঘুরে বেড়াতেন এবং নিজের গানে সুরারোপ করার পর তা গেয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। এ জন্যই তিনি তার সময়ে 'صناجة العرب' (আরবদের মন্দিরাবাদক) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।[৯১] আল-আ'শার মু'আল্লাকায় উল্লেখিত প্রেয়সী হুবায়রা ছাড়াও খুলায়দার নাম এ ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯২]

কবি তারাফা স্বীয় মু'আল্লাকায় এক সুন্দরী গায়িকার নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন;[৯৩] সন্তান হারা উটনীর স্বকরুণ বিলাপের সাথে তুলনা করেছেন গায়িকার সুমধুর কণ্ঠ আর বাদ্যযন্ত্রের নিক্কন আওয়াজকে। 'বর্ণিত আছে যে, মক্কার লোকজনকে গান শুনানোর উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ ইবন জুদ'আন পারস্য হতে দু'জন গায়িকা আমদানী করেছিলেন।[৯৪] ঐতিহাসিক ইবন হিশাম উল্লেখ করেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর ইবন খতল নামক এক ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। এই ইবন খতল–এর নিয়ন্ত্রণাধীন দুজন গায়িকা মুহাম্মাদ (সা.) এর কুৎসা রচনা করে গান গাইতো।[৯৫]

জাহিলি যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেকালে হিরা, শাম ও কিন্দার রাজা-বাদশাহগণ এবং হিজায ও নজদের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ নিজেদের দরবারে একাধিক সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকী রাখতেন। এসকল গায়িকা (قينة বহুবচনে قينات বা قيان) বিখ্যাত কবিদের কবিতা দিয়ে গান গাইতো। মুহাম্মদ ইবন ইমরান আল-মারযুবানি (মৃ. ৩৮৪ হি.) তাঁর 'মুজামুশ শুআ'রা'[৯৬] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমরুউল কায়স তাঁর

---

৮৯ আবদুল গফুর চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

৯০ আল-আ'শা, *দিওয়ান* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৩৩।

৯১ *আল-আগানি*, ৯ম খন্ড, পৃ. ১০৯; ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪১। ইবন কুতাইবার মতে : কবি এ শ্লোকটিতে শ্রুতিমধুরতার দিক থেকে লঘু ছন্দেন মন্দিরার ধ্বনিকে বীণার সুমধুর সুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইবন কুতাইবাহ আরো মনে করেন যে, আল-আ'শাই সর্বপ্রথম তাঁর কবিতায় 'সনজ' শব্দটির উল্লেখ করেন এবং এজন্যই তাঁকে 'সননাজাতুল আরব' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দ্র. ইবন কুতাইবা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬

৯২ ড. শাওকি যায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

৯৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

৯৪ *আল-আগানি*, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩২৭।

৯৫ ইবন হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবুবিয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, (মিসর : মাতবা'আতুল হালবি, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

৯৬ এ গ্রন্থে জাহিলি যুগ থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত পাঁচ হাজার কবির জীবন ও কর্মের কথা বিবৃত হয়েছে।

এক গায়িকাকে তাঁর পূর্বসূরি বা সমসাময়িক কবি মুররা ইবনুর রোআ' এর কবিতার প্রশিক্ষণ দিতেন। তাছাড়া জাহিলি কবিদের কোনো কোনো কাসিদায় সরসরি এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, কবিতা সে যুগে গান হিসেবে গীত হতো। তাই বলা যায়, জাহিলি আরবদের কাব্যিক রূপ হলো মূলত: الشعر الغنائ বা গীতিকবিতা। মুখাদরাম কবি হাসসান ইবন ছাবিত এরূপ এক বর্ণনায় বলেছেন :

تغن بالشعر إما كنت قائلة * أن الغناء لهذا الشعر مضمار[৯৭]

* হে মহিলা! তুমি যে কবিতা বলেছিলে সে কবিতা দ্বারা সঙ্গীত পরিবেশন করো। (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই এই কবিতা সঙ্গীতের জন্য উপযোগী।

আবু নাজম আর রাজিয (মৃ.১৩০ হি.) জনৈক গায়িকাকে সম্বোধন করে তাঁর এক কাসিদায় বলেন :

تغنى فان اليوم من الصبا * ببعض الذى غنى امرؤ القيس أو عمرو[৯৮]

* কতক কবি বাল্য বয়স থেকেই সঙ্গীত পরিবেশনে অভ্যস্ত হন। সেকারণে আজ ইমরুউল কায়স অথবা 'আমর সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।

'আমর বলতে আবুন-নাজম এখানে জাহিলি কবি 'আমর ইবন ক্বামিআহকে বুঝিয়েছেন। তিনি ছিলেন ইরাকে বসবাসকারী 'বকর' গোত্রের সন্তান এবং ইউরুউল কায়সের সমসাময়িক। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ইমরুউল কায়সের মৃত্যুর এক বছর আগে ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে। কবি এ চরণটিতে তাঁর গায়িকাকে বলতে চেয়েছেন, 'তোমার সাহচর্যে আজ আমার কৈশর ফিরে এসেছে। কাজেই তুমি আমাকে ইমরুউল কায়স (মৃ. ৫৩৯ খ্রি.) ও 'আমর ইবন ক্বামিআহ (عمرو بن قمئة) এর সেই সব কবিতা গেয়ে শোনাও যেগুলোতে যৌবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে এবং তাঁরা নিজেরাও যেগুলো গান হিসেবে গেয়েছিলেন। ইসলাম আগমনের পরে বদরের যুদ্ধের সময়ও আরব সমাজে বিশেষ করে কাফির-মুশরিকদের মাঝে জাহিলি ভাবধারা ও চেতনা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিলো। এ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান উপদেশের সুরে কুরায়শদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলো যে, মুহাম্মাদ (সা.) এর আক্রমণের পূর্বেই তারা যেন তাদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় ফিরে আসে। আবূ সুফিয়ানের এ নির্দেশের প্রত্যুত্তরে কুরায়শ নেতা আবূ জেহেল বলেছিল : 'খোদার শপথ' আমরা সর্বপ্রথমে বদর প্রান্তরে যাবো। এরপর সেখানে তিন দিন অবস্থান করবো। উট জবেহ করে লোকজনকে খেতে দিবো, মদ পান করবো, নর্তকীরা গান পরিবেশন করবে। আর আমাদের সাথে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য আরবগণও গান শ্রবণ করবে। তারপর বিজয়ী বেশে ফিরে আসবো।[৯৯]

---

৯৭ *আল-'উমদাহ*, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪১; ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

৯৮ মুহাম্মদ উসমান আলি, পৃ. ১০৫-১০৬; মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি, *বুলুগুল 'আরাব ফি মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আরাব*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৪ হি.), পৃ. ৩৬৯।

৯৯ ড. শাওকি যায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১; *আল-আগানি*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২।

জাহিলিয়া যুগ থেকেই আরব রমণীগণ রণক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ছোট ছোট দল গঠন করে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতো। হিন্দ বিনত উতবা এবং কতিপয় কুরাইশ মহিলা একটি দল গঠন করে খঞ্জনি বাজিয়ে উহুদ যুদ্ধে সমবেত কণ্ঠে এ রণসংগীতটি গেয়েছিলেন। হিন্দা ছিলেন তাঁদের দলনেত্রী। গানটি এরূপ :

إن تقبلوا نعانق * ونفرش النمارق
أو تدبروا نفارق * فراق غير وامق

মিলাব বক্ষ যদি হও আগুয়ান * বিছায়ে দেব মোরা প্রেমের উপাদান
পিছিয়ে আস যদি সরে যাব দূরে * বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব বাহুডোর ছিড়ে।

রণসঙ্গীত ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, দেবমূর্তি স্থাপনে, বিবাহোৎসবসহ বিভিন্ন সামাজিক উৎসবে, দেবদেবীর নামে পশু উৎসর্গে, আকাশে কালো মেঘ জমলে বর্ষণের প্রত্যাশায়, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির সময় বৃষ্টির দেবতার নিকট বৃষ্টি প্রদান ও বৃষ্টি বন্ধের প্রার্থনায়, মরুভূমির দীর্ঘ সফরে উষ্ট্র চালনায়, কূপ খননের মতো কঠিক কর্মে, প্রতিপক্ষকে মল্ল যুদ্ধে আহবানের সময়, উপঢৌকনের উদ্দেশ্যে রাজরাজড়া ও বিত্তশালীদের গুণকীর্তন-ইত্যাকার নানা অনুষ্ঠান ও উপলক্ষে নেচে-গেয়ে, ইশ্বর, দেবতা ও মানুষের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ।[১০০]

কবিতার মতো আরবি গানও কোন কালেই একসুরো তথা একঘেয়ে ও বৈচিত্রহীন ছিল না। সুর, লয়,তান ও ধ্বনির দিক দিয়ে প্রায় শুরু থেকেই আরবি কবিতার মতো সঙ্গীতও অবচেতনভাবে এবং স্বভাবগতভাবেই একাধিক ছন্দ ও সুরে গাওয়া হতো। প্রাচীন আরবদের সঙ্গীত ছিল তিন প্রকার : আন-নাসব, আস-সিনাদ ও আল-হাযাজ। নাসব ছিল আরোহীদের ও পেশাদার গায়িকাদের গান। এগুলো মর্সিয়া ও শোকগাথা জাতীয় গান। ছন্দঃশাস্ত্রে ও জাতীয় গান 'দীর্ঘ' (الطويل : the long) ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। সিনাদ শ্রেণীর গান ছন্দঃশাস্ত্রে 'গুরুগম্ভীর' (الثقيل: the heavy) ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার সঙ্গীতে সুরের স্পন্দন ও কম্পনমাত্রা সদা পরিবর্তনশীল এবং স্বরের মিল, তাল ও লয় ঘন ঘন ওঠানামা করে। হাযাজ শ্রেণীর সঙ্গীত ছন্দোবিজ্ঞানে 'লঘু' (الخفيف: the light) ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত নাচের সময় এ ধরণের গান গাওয়া হয় এবং এর সঙ্গে খঞ্জনি ও বাঁশি বাজিয়ে আনন্দফুর্তি করা হয়। ভদ্রলোকেরা এটিকে অরুচিকর ও হালকাপনা ভেবে থাকেন। এগুলোই ছিল প্রাচীন কালের আরবদের গান। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, ইরাক বিজিত হয় এবং পারস্য ও রোম থেকে কোমল সঙ্গীত আণীত হয়। আরবির সঙ্গে ফারসি ও রোমক ভাষায় রচিত বিভিন্ন সুর ও ছন্দের গানের চর্চা শুরু হয়। আরবরা বীনা, ম্যানডোলিন, পিয়ানো ও বাঁশিসহ আরো নানারকমের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান গাইতে থাকে।'[১০১]

---

[১০০] ড. শাওকি যায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২-১৯৩।
[১০১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।

জাহিলি যুগের সঙ্গীতে যে তিন প্রকার ছন্দের অস্তিত্ব ছিল তা নয়। ড. শাওকি যায়ফের মতে এগুলো ছাড়াও প্রাচীন আরবি সঙ্গীতে আরো কতিপয় ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজায বা কম্পমানপ্রধান (الرجز: the trenbing), রামাল বা প্রবাহমান (الرمل: the running), কামিল বা পরিপূর্ণ (الكامل: the perfect), মাদিদ বা প্রসরিত (المديد: the extended) এবং মুতাক্বারিব বা দ্রুতলয়ী (التقارب : the tripping)। সুতরাং দেখা যায় যে, জাহিলি যুগের কবিতায় ব্যবহৃত এবং পরবর্তীতে ইসলামোত্তর যুগে আল-খলিল ইবন আহমদ (মৃ. ১৭৫ হি.) কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সংজ্ঞায়িত ১৬টি ছন্দের মধ্য থেকে প্রাচীন আরবি গানে কমপক্ষে আটটির ব্যবহার ছিল। আসলে জাহিলি কবিতার সবগুলোই গীতিধর্মী ও সাঙ্গীতিক। সে যুগের আরবগণ প্রধানত গান হিসেবে গাওয়ার জন্যই কবিতা শিক্ষা ও কণ্ঠস্ত করতো। তবে কবিতা ও গান জাহিলি যুগে অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত থাকলেও ইসলামের আগমনের পর বহির্বিশ্বের সাথে আরব উপদ্বীপের যোগাযোগ এবং বিশেষত পারসিক ও রোমক সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের সঙ্গে আরবীয় সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের সংযোগের ফলে হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরবি কবিতা ও সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পথচলা শুরু হয়। কোনো কোনো কবি গানের চর্চা পরিত্যাগ করে শুধু কবিতা রচনা ও আবৃত্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী হন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফা এবং আমির-উমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজে আবির্ভূত সঙ্গীত-শিল্পীদের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও কঠোর সাধনায় মুসলিম বিশ্বে সংগতিশিল্প একটি স্বতন্ত্র কলা ও শাস্ত্র হিসেবে সংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[১০২] সঙ্গীত দিয়ে হাসানো ও কাঁদানো, সঙ্গীত দ্বারা ঘুম পাড়ানো, ঘুম ভাঙ্গানো ও বৃষ্টি নামানো এমন কি সঙ্গীত থেকে অগ্নিসঞ্চারের মতো অনেক কাহিনিও অরবদের সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে।[১০৩]

অতএব বলা যায়, গীতিকবিতা বাংলা ও আরবি সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে বিবেচ্য। বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদের ন্যায় আরবি সাহিত্যে এর মূল্য অনেক বেশী। বাংলা ও আরবি সাহিত্যের স্বনামখ্যাত কবিগণ এই ধারায় কাব্য রচনা করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যবোধের জন্য বাংলা গীতিকবিতা ও কাসিদা সাহিত্য জগতে অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। কাব্য সাহিত্যের এ ধারাটি অতীব প্রাচীন হলেও অধুনাকালেও এর চর্চা নিজস্ব ধারায় অব্যাহত আছে। খ্যাতিমান কবিগণ নিজ নিজ ভাষায় গীতিকবিতা চর্চা করে কাব্য সাহিত্যের এ ধারাটিকে আজও স্বরূপে সমুজ্জ্বল রেখেছেন। সাহিত্যমোদিদের মতে : ভাষা, ভাব ও আলঙ্কারিক সৌদর্যের দিক বিচারে এর আরো উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং সমৃদ্ধ হবে এর বিকাশধারা যুগে যুগে।

---

[১০২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩-১৯৪; মুহাম্মদ উসমান আলি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭ ।

[১০৩] P.K. Hitti, *op.cit,* pp. 371-372.

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

আইবিএস-এ নারী গবেষক: গবেষণার ধরন ও প্রকৃতি

মোঃ মাহমুদ আলম*

Abstract: Institute of Bangladesh Studies (IBS), an institute of the University of Rajshahi, started functioning on 24 January 1974. After a few years of the establishment of IBS, a woman enrolled as an M.Phil fellow in the 1977-1978 session. Since then, women continued enroling and obtaining M.Phil & PhD degrees competing with male fellows. Facing different impediments, their participation increased gradually, which play a great role for holistic development of Bangladesh in history, economy, art and culture, among other aspects pf Bangladesh. This article examines the present pattern and nature of the research work of the women fellows at IBS with a view to examining the participation of women in advanced research and also to show how they are working competently like men on different subjects, topics and issues.

সূচনা

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, বাংলাদেশ বিষয়ক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার এক অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সংসদের xxvi নং আইনে পাশ হওয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ অনুসারে এ গবেষণা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] বাংলাদেশের সমাজ, জীবন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার জন্য একটি আন্ত-শাস্ত্রীয় (inter-disciplinary) উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানববিদ্যা, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, আইনবিদ্যা ও গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক নয় এমন বিষয়ের উপর এখানে নিবিড়ভাবে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, অর্থনীতি তথা সামগ্রিক উন্নতির জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে সকল প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি উচ্চ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

---

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রেষণে), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

[১] *The Rajshahi University Act, 1973, Act No. XXVI of 1973.* [25th September, 1973] The Second Statutes of the University.

দেখা দেয়। তাই সৃজনশীল, সৃষ্টিশীল চিন্তার অধিকারী ও যোগ্য গবেষক তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বহু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের জনগণ, সম্পদ ও ঐতিহ্যের মিথস্ক্রিয়ায় সার্বিক অভিক্ষেপণের ফল হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আশা করা হয়েছিল সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বিধিবিদ্ধ আইনবলে গঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি এদেশের মানুষের উচ্চশিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিসরে ক্রমাগতভাবে অবদান রাখতে পারবে। বোর্ড অব গর্ভনর ও পরিচালক নিয়োগদানের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ১৯৭৪ সালের ২৪ জানুয়ারী থেকে।

আইবিএস-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

ক) বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, আইন, ভাষাতত্ত্ব, ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, কলা, প্রত্নতত্ত্ব, সংগীত ও সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা, বিশেষ করে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা;

খ) প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সরকারি কিংবা বেসরকারি সহযোগিতায় গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া;

গ) আইবিএস-এ সম্পাদিত গবেষণাকর্মের প্রাপ্ত ফলাফলগুলোকে জনসমক্ষে প্রকাশ ও উপস্থাপন করা, যাতে সেগুলো সমাজের প্রয়োজনে ও দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায়;

ঘ) বাংলাদেশ শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের সাথে গবেষণা কাজে সহযোগিতা করা;

ঙ) সেমিনার, কনফারেন্স ও প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্টাডিজকে দেশ ও দেশের বাইরে লোকপ্রিয়তা অর্জনে ব্যবস্থা নেওয়া; এবং

চ) ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য অর্জনে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা অর্জন ও প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।[২]

আইবিএস-এর উপরোক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি অনেকাংশে সফলতা লাভ করেছে। গবেষকদের উল্লেখযোগ্য অংশ নারী, যারা গবেষণার প্রায় সবক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

আইবিএস-এর নারী গবেষক

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত যেসব নারী গবেষক আইবিএস থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন তাদেরকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। উল্লিখিত সময়পর্বে মোট ২৬৭ জন গবেষক আইবিএস থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন, এর মধ্যে ৩০ জন নারী গবেষক বিভিন্ন

---

[২] Ibid.

বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন এবং মোট ৭৯ জন গবেষক আইবিএস থেকে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন, এর মধ্যে ২২ জন নারী গবেষক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন যঁদের একটি বিভাগওয়ারি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল:

আইবিএস থেকে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী নারী গবেষকগণের সংখ্যা

বিষয়	গবেষণার মাধ্যম	এমফিল সংখ্যা	পিএইচডি সংখ্যা
অর্থনীতি	ইংরেজি	০৪	০২
	বাংলা	০১	০১
আইন ও বিচার	ইংরেজি	--	০৫
ইসলামের ইতি. ও সংস্কৃতি	ইংরেজি	--	০২
ইংরেজি	ইংরেজি	০১	--
চারুকলা	বাংলা	--	০১
চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞান	ইংরেজি	--	০১
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	বাংলা	০২	০৪
ব্যবস্থাপনা	ইংরেজি	--	০১
	বাংলা	০১	--
ভূগোল	বাংলা	০১	--
মনোবিজ্ঞান	ইংরেজি	০২	০১
	বাংলা	০১	০১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	ইংরেজি	--	০১
	বাংলা	০১	--
লোক প্রশাসন	ইংরেজি	০১	০১
সমাজকর্ম	ইংরেজি	০১	০১
	বাংলা	০২	০২
সমাজবিজ্ঞান	ইংরেজি	০১	০৪
	বাংলা	০৩	০২
মোট		২২	৩০

উৎস: Annotated Bibliography of PhD Theses, comp. Md. Shahjahan Rarhi (Rajshahi, Institute of Bangladesh Studies, 2010).

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিভিন্ন বর্ষের মোট ১৩ জন নারী গবেষক আইবিএস-এ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারত আছেন। এর মধ্যে পিএইচডি গবেষণায় আছেন এগারো জন এবং এমফিল গবেষণায় আছেন দুই জন। এছাড়া বিভিন্ন বর্ষের মোট ১২ জন নারী শিক্ষার্থী

আইবিএস-এ এমফিল (৮ জন) ও পিএইচডি (৪ জন) পর্যায়ে ভর্তি হয়েছেন কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণা শুরু করেননি।[৩]

নারী গবেষকদের গবেষণার ধরনঃ তাত্ত্বিক বিচারে

রিসার্চ বা গবেষণার কোনো একক সংজ্ঞা নেই। Bangla Academy English-Bengali Dictionary অনুসারে গবেষণা হল "গভীর অনুসন্ধান।"[৪] Samsad English-Bengali Dictionary মতে "জ্ঞান উন্নয়নে পদ্ধতিগত অনুসন্ধানই গবেষণা।"[৫] অনুরূপ আর একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায় Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English-তে, সেখানে বলা হয়েছে রিসার্চ হচ্ছে æCareful study of investigation, specially in order to discover new facts or information."[৬] আরো স্পষ্টতর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন সি. আর. কোঠারি, তাঁর মতে, কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কিংবা কোনো সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া তথা কোনো তত্ত্ব নির্মাণের লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালিবদ্ধ পদ্ধতিতে জ্ঞানের অন্বেষণ করাই গবেষণা।[৭] প্রীতিকুমার মিত্র বলেন, সাধারণ ধারণায় গবেষণা হচ্ছে "আপনি যা জানেন না, তা খুঁজে বের করা।"[৮]

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-এ 'ধরন' শব্দের অর্থ "পদ্ধতি; প্রকার; প্রণালী (কাজের ধরন)" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯] আর গবেষণার ধরন বা প্রকারভেদ নিয়ে নানান জনের নানান মত পরিলক্ষিত হয়। প্রীতিকুমার মিত্র মনে করেন গবেষণা মূলত দুই প্রকারঃ (১) বিশুদ্ধ (pure) বা বুনিয়াদি (basic fundamental) এবং (২) ফলিত (applied)।[১০] বুনিয়াদি মৌলিক গবেষণার কাজ হচ্ছে অজানা এলাকায় অনুসন্ধান ও বিচরণ করে অজানা সত্য আবিষ্কার। জ্ঞান লাভের জন্যই চর্চা-এই হচ্ছে এ ধরনের

---

[৩] http://dept.ru.ac.bd/ibs/ongoing-research, Accessed on 13th May 2013; http://dept. ru.ac.bd/ ibs/ present-student, Accessed on 13th May 2013.

[৪] *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, 1993, "Research" ভুক্তির নীচে।

[৫] *সংসদ ইংলিশ-বেঙ্গলী ডিকশনারি* [সংসদ ইংরেজি-বাংলা অভিধান] ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৫, "Research" ভুক্তির নীচে।

[৬] *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English*, 8th edition, 2010, s. v. "Research."

[৭] C.R. Kothari, Research *Methodology: Methods and Techniques*, 2nd ed. (New Delhi: New Age International, 2004), p.1.

[৮] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ* (রাজশাহীঃ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০০৯), পৃ. ৩৪০।

[৯] *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সংস্করণ (২০০০), "ধরন" ভুক্তির নীচে।

[১০] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদনা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০।

গবেষণার মটো (motto) বা উদ্দেশ্য। অজানাকে জানার ইচ্ছা ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো বাস্তব প্রয়োজন মেটানো বা সমস্যা সমাধান তাঁর লক্ষ্যে থাকে না।[১১] লক্ষ্য থাকে প্রশস্ত, সাধারন নিয়মাবলি (generalization) আবিষ্কার করে তত্ত্বনির্মান করা। প্রয়োগের কাজটি উত্তরসূরিদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের গবেষণার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'কী' প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়। তবে 'কেন,' 'কীভাবে' ইত্যাকার প্রশ্নের জবাবও মৌলিক গবেষণায় মিলতে পারে।[১২] বর্তমান কালের বিদ্যায়তনিক গবেষণায় এ ধরনের গবেষণা শক্ত অবস্থান দখল করে আছে। কারণ, এখান থেকে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞানই বাস্তব ক্ষেত্রে ফলিত গবেষণার ভিত্তি রচনা করে। এ জন্যই এ জাতীয় গবেষণাকে বুনিয়াদি বা মৌলিক গবেষণা বলা হয়ে থাকে। অন্য কথায়, মৌলিক গবেষণা নানাবিধ তত্ত্ব (Theories) উৎপাদন করে, আর ফলিত গবেষণা সেসব তত্ত্ব ব্যবহার করে, তথা সেগুলোর উৎকর্ষ যাচাই করে।[১৩] আইবিএস-এর নারী গবেষকরা যেসব গবেষণা করেছেন বা করছেন তার সবই সাধারণ অর্থে বুনিয়াদি বা মৌলিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু গবেষণার উক্ত সাধারণ দ্বিবিভাজনে অনেকেই আপত্তি করেন। তাঁদের মতে অধিকাংশ একাডেমিক শৃঙ্খলায় বাস্তবে যা ঘটে তা যথেষ্ট যৌগিক প্রকৃতির। অর্থাৎ একই গবেষণার মধ্যে মৌলিক ও ফলিত আঙ্গিক বিদ্যমান থাকে, যদিও তার মধ্যে মৌলিক গবেষণার উপাদান ফলিত গবেষণার অনুপাতে অনেক বেশী। আইবিএস-এর নারী গবেষকদের মধ্যে এ ধরনের গবেষণার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন: নাহিদ ফেরদৌসি তার গবেষণাকর্মটিকে যৌগিক প্রকৃতির বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি বহুমুখী গবেষণা পদ্ধতি (বিশেষ উদ্দেশ্যে মতামত জরিপ, পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, মাঠ জরিপ পদ্ধতি) ব্যবহার করেছেন।[১৪] তবে কেউ কেউ তার গবেষণাকর্মটিকে ফলিত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমনটা জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, "প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ফলিত গবেষণা, যার লক্ষ্য হচ্ছে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ করা। এর প্রধান বিষয় হলো নতুন তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তি প্রদান ও বর্তমান প্রয়োজন পূরণে সঠিক বিকল্প পন্থা উদ্ভাবন করা।"[১৫]

তবে বাস্তবতার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে ফিলিপ্‌স ও পাগ একটি বিকল্প উপস্থাপন করেছেন, যেখানে গবেষণা তিন ধরনের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা, (১)

---

[১১] তদেব।

[১২] তদেব।

[১৩] তদেব।

[১৪] Nahid Ferdousi, "Juvenile Justice System in Bangladesh: An Analytical Study" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2010), p. 33.

[১৫] Zannatul Ferdous, "Floating Prostitutes and the Risk of HIV/AIDS: A Socio-metric Study in Rajshahi City" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2010), p. 34.

এক্সপ্লোরেটরি (exploratory) বা অনুসন্ধানমূলক গবেষণা, (২) টেস্টিং-আউট (testing-out) বা পুনঃপরীক্ষামূলক গবেষণা, এবং (৩) প্রবলেম-সলভিং (problem-solving) বা সমস্যা সমাধানমূলক গবেষণা।[১৬]

নতুন অনুসন্ধানমূলক গবেষণা

নতুন অনুসন্ধানমূলক গবেষণা এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে যেটি সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা থাকে। এ ধরনের নবক্ষেত্রীয় গবেষণা মূলত বুনিয়াদি প্রকৃতির হয়ে থাকে। গবেষণার শুরুতে কোনো স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগোনো হয় না, কোনো প্রাক্কল্পও (hypothesis) নির্মাণ করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। গবেষণায় তাত্ত্বিক, প্রত্যয়গত ও পদ্ধতিগত সমস্যা বিভিন্নভাবে সামনে আসে, যা নিরসনে অনেক সময়ে নতুন তত্ত্বনির্মান, প্রত্যয়গত কাঠামো (conceptual framework) নির্মাণ ও সংশোধিত পদ্ধতি ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[১৭] উল্লেখ্য যে, অনুসন্ধানমূলক গবেষণার প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞানের পরিধি ক্রমাগত সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এই প্রত্যাশায় যে, বাস্তবিক দরকারি কিছু আবিষ্কৃত হয়ে যেতে পারে। আইবিএস-এর নারী গবেষকদের বেশীরভাগ গবেষণাকর্ম-ই এর মধ্যে পরিগণিত হয়। মোসাঃ আকলিমা আকতার তার নতুন অনুসন্ধানমূলক গবেষণাকর্মটিতে উল্লেখ করেছেন:

বক্ষমান গবেষণাকর্মটিতে মনোবিজ্ঞান এবং যোগাযোগবিজ্ঞান এ দুটি শাস্ত্রের প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়ের সমন্বয় ঘটেছে। এ উভয় শাস্ত্রের চিন্তাধারার একত্র বিন্যাস করে আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং এর দুটি অনুসঙ্গী বিষয় জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয়েছে। সীমিত পরিসরে এই গবেষণায় উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে মানুষের সচেতনতা ও আচরণের উপর গণমাধ্যমের প্রভাব অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৮]

নুরুন নাহার তার অভিসন্দর্ভে লিখেছেন:

নারীর ভূমিকা বলতে রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা তাদের কর্মপ্রক্রিয়া এবং মতামতের গুরুত্ব ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অংশগ্রহনের মাত্রা কিরূপ? প্রতিবন্ধকতা সমূহ কী? এগুলো দূর করার উপায় কী?

---

[১৬] Estelle M. Phillips and Derek S. Pugh, How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors, Recvised and updated 4th ed. (Berkshire: Open University Press, 2005); উদ্ধৃত প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৬।

[১৭] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদনা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৬।

[১৮] মোসাঃ আকলিমা আখতার, "জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে পল্লী জনগোষ্ঠীর সচেতনতার উপর গণযোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব: রাজশাহী জেলার একটি সমীক্ষা" (এমফিল অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ. i.

এবং নারীরা কী ধরনের ভূমিকা রেখেছে? এসমস্ত বিষয়গুলো এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[১৯]

শাহানা কায়েস তার অভিসন্দর্ভে লিখেছেন
নগরায়ণ তার বিবিধ প্রভাববলয়ের ধারাবাহিকতায় পরিবার ও নারীর সামষ্টিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত করে। এই বাস্তবতার আলোকে জরিপ, কেসস্টাডি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত তথ্যাদির মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীতে পরিবার ও নারীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণাকর্মটিতে নানাবিধ দিক উন্মোচিত হয়েছে।[২০]
Shahorin Monzoor তার অভিসন্দর্ভে লিখেছেন, এই গবেষণার সার্বিক লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তায় নারী-পুরুষের পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি অনুসন্ধান করা যেখানে নারী-পুরুষের অবদান, এ সমস্যা মোকাবেলায় তাঁদের প্রতিবন্ধকতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাঁদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হবে।[২১]

পুনঃপরীক্ষামূলক গবেষণা

পুনঃপরীক্ষামূলক গবেষণায় পূর্বে প্রস্তাবিত সাধারণ সত্যের সীমা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় না। আবিষ্কৃত সত্য ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কোন পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং কোথায় কোথায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না তা ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা থাকে। পরিস্থিতির কীরূপ পরিবর্তন হলে অথবা কোন কোন নতুন উপাদান সংযোজিত হলে পূর্বের থিওরি অকার্যকর হবে তা নির্ণয় করা গবেষকের দায়িত্ব।[২২] বস্তুত পুনঃপরীক্ষার কোনো শেষ নেই, একই তত্ত্ব বিভিন্ন গবেষক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানান উপায়ে অসংখ্যবার নিরীক্ষিত হতে পারে। এ জাতীয় গবেষণা আইবিএস-এর নারী গবেষকগণ সাধারণত সম্পাদন করতে চান না।

সমস্যা-সমাধানমূলক গবেষণা

---

[১৯] নুরুন নাহার,"বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা: নির্ধারিত একটি গ্রাম ও একটি শহরের উপর সমীক্ষা" (এমফিল অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), পৃ. বারো।

[২০] শাহানা কায়েস, "বাংলাদেশের নগর এলাকায় পরিবারের পরিবর্তনের ধারা ও মহিলাদের অবস্থা: রাজশাহী মহানগরীর উপর একটি সমীক্ষা" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮), পৃ. ২০৬।

[২১] Shahorin Monzoor, "Gender Dynamics of Food Security in Bangladesh: Contributions, Constraints and Coping Mechanism" (MPhil Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2008), p. 11.

[২২] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদনা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৬।

সমস্যা-সমাধানমূলক গবেষণা একটি নির্দিষ্ট বাস্তব সমস্যা নিয়ে শুরু হয় এবং সমস্যার সূত্র অনুসরণ করে সমাধানের পদ্ধতিও খুঁজে নিতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রের সমস্যাসমূহ অত্যন্ত জটিল হওয়ায় সেগুলোর সমাধান একটিমাত্র বিদ্যায়তনিক (academic) শৃঙ্খলার (discipline) উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এজন্য গবেষককে একাধিক শৃঙ্খলা থেকে নানাবিধ তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত উপাদান আহরণ করে সেগুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে উপনীত হতে হয়। সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক শৃঙ্খলাসমূহে এ ধরনের গবেষণা বেশি হয়।[২৩]

সি. আর. কোঠারি গবেষণাকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করেছেন:[২৪]

(i) বর্ণনাত্মক বনাম বিশ্লেষণধর্মী (Descriptive vs. Analytical): Kamrun Nahar এর অভিসন্দর্ভটি বর্ণনামূলক। তাঁর বর্ণনায়-æএ গবেষণাকর্মটি প্রকৃতগত বিচারে প্রধানত বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণধর্মী, যা মূলত সহায়ক উৎসের ভিত্তিতে রচিত, তবে এতে প্রাথমিক উৎসেরও ব্যবহার করা হয়েছে।"[২৫]

Sultana Nazaeen তার অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে লিখেছেন æএ গবেষণা মূলত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের পারিবারিক তথ্য, মনঃসামাজিক অবস্থা ও তাদের আত্মমর্যাদাবোধের অবস্থার উপর একটি জরিপ।"[২৬]

Shahida Akter এর অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে বলা আছে:

বর্তমান গবেষণাটি অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনাত্মক পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত। এই অর্থে যে, অনুসন্ধানমূলক অংশে এর তথ্যগুলো প্রাথমিক অংশ থেকে নেওয়া, যা বাস্তবিক অর্থে প্রকৃতগত বিচারে প্রায়োগিক। তবে বর্ণনামূলক অংশটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে সহায়ক উৎসের সাহায্য নিয়ে। পুরো গবেষণাকর্মে প্রাথমিক তথ্য বা মূখ্য উৎস মাঠ জরিপের মাধ্যমে এবং সহায়ক তথ্য বা গৌণ উৎস দাপ্তরিক রেকর্ড, বইপত্র, সরকারি প্রজ্ঞাপন, আইন ও বিধি এবং তার বিশ্লেষণ থেকে সংগৃহীত।[২৭]

(ii) ফলিত বনাম বুনিয়াদি (Applied vs. Fundamental)- আইবিএস-এর গবেষণাগুলো মূলত সবই মৌলিক গবেষণা বলে গণ্য করা হয়।

---

[২৩] তদেব, পৃ. ৩৪৭।

[২৪] C.R. Kothari, *op. cit.*, p.2-4.

[২৫] Kamrun Nahar, "Political Violence in Bangladesh: Nature and Causes" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2009), p. 16.

[২৬] Sultana Nazneen, "Interpersonal Relations of the University Students of Bangladesh" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1994), p. 58.

[২৭] Sahida Akter, "Gender Discrimination at Workplace: A Study on Garments Industry in Bangladesh" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2007), p 19.

(iii) মাত্রাগত বনাম গুণগত (Quantitative vs. Qualitative)-আইবিএস-এর নারী গবেষকদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক বিজ্ঞান শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তারা মাত্রাগত ও গুণগত পর্যায়ের গবেষণা করেন। যেমন, Shahorin Monzoor তাঁর অভিসন্দের্ভে উল্লেখ করেছেন, এটি হলো একটি গুণগত পর্যায়ের গবেষণা যেখানে গৃহস্থালি পর্যায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারে পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি নির্ণয় করা গেছে।[২৮] এছাড়াও অন্যান্য শৃঙ্খলার কিছু গবেষক এ ধরনের গবেষণা করেছেন। উদাহরণ হিসাবে Rukhsana Shaheen এর নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁর গবেষণায় এ ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে:

এটি হলো একটি গুণগত পর্যায়ের গবেষণা, যেখানে ঢাকার সরকারি ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক হাসপতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা গ্রাহকের ধারণা বা মূল্যায়ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে মানুষের ব্যবহারের উপর আচরণ বিজ্ঞানের প্রভাব ও তার প্রায়োগিক দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। মূখ্য ও গৌণ উৎস সংগ্রহে এতে নানা ধরনের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র জরিপ, সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।[২৯]

Shamima Tasmin এর গবেষণাকর্মটি ও এ ধরনের বলে বিবেচনা করা যায়:

গবেষণাকর্মটিকে বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ করে তোলার জন্য এতে ব্যবহৃত তথ্যগুলো ক্রমবিন্যস্ত আকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে। এক সেট তথ্য দিয়ে অপর সেটের তথ্যাবলীকে যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র জরিপ পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণার তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত ও ব্যবহৃত তথ্যাবলী কতটুকু সঠিক তা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ক্রস রেফারেন্স পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।[৩০]

Akhtar Banu ও তার গবেষণাকর্মে এ ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন:

এতে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য উপস্থাপন ও সহজ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার জন্য সারণি ব্যবহার করা হয়েছে।

---

[২৮] Shahorin Monzoor, *op. cit.*, p. 22.

[২৯] Rukhsana Shaheen, "Exploration of Cognition of Health Care Seekers at Government Unani and Ayurvedic Degree College Hospital, Dhaka" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2000), p. i.

[৩০] Shamima Tasmin, "English Language Needs Analysis of the English Dept. of Rajshahi University," (MPhil Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2001), p. 4.

বিশ্লেষণধর্মী হওয়ায় এর তথ্য বিশ্লেষণে বর্ণনাত্মক পারিসাংখ্যিক পদ্ধতি যেমন- গণনিবেশন সংখ্যা ও গড় এর ব্যবহার করা হয়েছে।[৩১]

(iv) প্রত্যয়গত বনাম প্রায়োগিক (Conceptual vs. Empirical)-প্রত্যয়গত কাঠামোনির্ভর গবেষণা আইবিএস -এর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নারী গবেষকরাও এ ধরনের গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। আর প্রায়োগিক গবেষণা ঐ অর্থে হয়তো হয় না কিন্তু যৌগিক প্রকৃতির গবেষণার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রায়োগিক উপাদান থাকে। যেমন Serajum Munira বৈশিষ্ট্যগত বিচারে তার গবেষণাকর্মকে প্রায়োগিক এবং বর্ণনাত্মক প্রকৃতির বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইমপিরিক্‌ল্‌ সাইকেল এঁকে বিভিন্ন উৎস থেকে (প্রশ্নমালা জরিপ, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, নিবিড় এবং অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং রেকর্ড ও পিকচার গ্রহণ) তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন যা তাঁর গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।[৩২]

(v) অন্যান্য কিছু ধরনের গবেষণা: ওয়ান-টাইম গবেষণা বা অনুদৈর্ঘ্য গবেষণা, মাঠভিত্তিক গবেষণা বা ল্যাবরেটরি গবেষণা বা সিমুলেশন গবেষণা, ক্লিনিক্যাল বা ডায়াগনিষ্টিক গবেষণা, এক্সপ্লোরেটরি বা ফরমুলাইজড গবেষণা, ঐতিহাসিক গবেষণা, কনক্লুশন ওরিয়েন্টেড বা সিদ্ধান্ত-গ্রহণমূলক গবেষণা: আইবিএস-এ ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক গবেষক তার ডিগ্রি অর্জন করেন। নারী গবেষকদের মধ্যে যিনি প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন, ১৯৯২ সালে, তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শৃঙ্খলার। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ধরণের গবেষণা হওয়ায় তিনি লিখেছেন ঞগবেষণার প্রয়োজনে এতে ব্যাপক আকারে সচিত্রীকরণ নিদর্শন ও আলোকচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।"[৩৩] এছাড়া নাজমা বেগমও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি-তে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৯৪ সালে। তিনি ঐতিহাসিক পদ্ধতির পাশাপাশি জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে মুঘল আমলে সমাজের সকল স্তরে নারীর ভূমিকা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ কাজে তিনি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (manuscript) এবং বিভিন্ন ধরনের চিত্রকর্ম (paintings) ব্যাপক পরিসরে ব্যবহার করেছেন।[৩৪]

---

[৩১] Akthar Banu, "Drug Addiction Among the Youth in Bangladesh: A Study in Selected Areas" (MPhil Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2003), p. 116.

[৩২] Serajum Munira, "Cohesive Approach to Primary Education in Bangladesh: Issues and Challenges" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi), 2013, pp. 15-25.

[৩৩] Ayesha Begum, "Forts in Medieval Bengal: An Architectural Study" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1992), p.vii.

[৩৪] Najma Begum, "Portrayal of Women in Mughal Painting: A Study Based on Illustrated Manuscripts and Album Drawings" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1994), pp.iii-viii.

নারী গবেষকদের গবেষণার ধরন: আইবিএস-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে

আইবিএস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এর আঙ্গিক কাঠামো এমনভাবে গড়ে উঠেছে যেখানে, গবেষকরা গবেষণার মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটাতে পারেন। গবেষণার সাধারণ ধরন এমন যে, গবেষকগণের গবেষণার মাধ্যমে আইবিএস এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বর্ণচ্ছটা বিস্তৃত পরিসরে প্রকাশ পেতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো, যেমন- ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, আইন, ভাষা ও সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, কলা, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং সমগোত্রীয় বিষয়গুলোতে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া আইবিএস-এর লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, নারী গবেষকরা এসব বিষয়গুলোর অধিকাংশে সরাসরি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষোভাবে তাদের গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। ফলে তারা দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন, এখনো হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন বলে সবার প্রত্যাশা।

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করা-ও আইবিএস-এর উদ্দেশ্য। তাই আইবিএস কর্তৃক আয়োজিত দেশি-বিদেশি সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে আইবিএস-এর নারী গবেষকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। আইবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সেমিনার ভলিউমগুলোতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গবেষণাকর্মগুলোকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কাজে লাগানোও আইবিএস-এর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে নারী গবেষকগণের অবদানও কম নয়। কেননা আইবিএস-এর রেফারেন্স রুম দেশের সবার জন্য উন্মুক্ত যেখান থেকে সবাই এ গবেষণার সুফল ভোগ করতে পারেন।

নারী গবেষকগণের গবেষণার প্রকৃতি: তাত্ত্বিক বিচারে

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-এ প্রকৃতি শব্দের অর্থ "স্বভাবগত গুনাগুন; ধর্ম (বস্তু প্রকৃতি)"[৩৫] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় এর প্রকৃতি অনুসন্ধানে তথ্য অনুসন্ধান, অভিসন্দর্ভ রচনার প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার রয়েছে দুটি অংশ। যথা: ক.(search) বা অনুসন্ধান এবং খ.(research paper) বা আসল গবেষণা। অনুসন্ধান পর্বের প্রয়াস হচ্ছে 'কী?' প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা (what question)। এই কাজ সঠিক ভাবে করতে পারলে গবেষিতব্য বিষয়ের তাত্ত্বিক পরিস্থিতি কি তা জানা যায়। অর্থাৎ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি, দলিলাদি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিবিধ বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান ইত্যাকার সকল উপাদান সংগৃহীত হয়ে

---

[৩৫] *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০০, "প্রকৃতি" ভুক্তির নীচে।

পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য মজুত থাকে।[৩৬] আইবিএস-এর নারী গবেষকেরা এ কাজটি অত্যন্ত সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যেমনটি নাহিদ ফেরদৌসি লিখেছেন "এই গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোর অপরাধ বিচার পদ্ধতির আইনগত কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিচারিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা এবং শিশুকেন্দ্রিক সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নির্দেশনা তৈরী করা।[৩৭] শাহিদা আক্তার লিখেছেন "এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে বিদ্যমান লিঙ্গবৈষম্য বিশ্লেষণ করা। যেসব ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয় সেসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের তুলনা করা এর বিশেষ উদ্দেশ্য।"[৩৮] আরেকটি গবেষণার উদ্দেশ্যে দেখা যাচ্ছে, "দরিদ্র মাইগ্রান্টরা কিভাবে শহুরে সমাজে নিজেদের খাপ খাওয়ায়, সেই প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।"[৩৯] অন্য একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে "চিরায়ত সমাজে বিশেষ করে পল্লীঅঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে গণযোগাযোগ মাধ্যমের উপস্থিতি কোন নব চেতনার উদ্রেক করে কি না এবং তাদের আচরণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে কি না তা অনুসন্ধান করা-ই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।"[৪০]

অন্যদিকে, মূল গবেষণা পর্বের আসল কাজ হচ্ছে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তসমূহের বিচার বিশ্লেষণ (analysis) ও ব্যাখ্যা (interpretation)-যা উত্তর দেয় 'কেন?' প্রশ্নের (Why question)।[৪১] এই পর্যায়ে অনুসন্ধান করা হয় ব্যাখ্যার, বৈশদ্যের, বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তার সম্পর্কের ও তুলনার–যার মাধ্যমে ভবিষ্যকথন (predication), সাধারণীকরন (generalization), এবং তত্ত্বনির্মাণ (therization) করা সম্ভবপর হয়।[৪২] নুরুন নাহার লিখেছেন, দারিদ্র বিমোচনের সমস্যাগুলোর প্রকৃতি, তীব্রতা এবং পরিধি ব্যাখ্যা করা; সাথে সাথে দারিদ্র বিমোচনের উপায় ও পদ্ধতি বাতলানোও এ গবেষণার উদ্দেশ্য।[৪৩] এখানে তথ্য ও উপাত্তসমূহ ব্যবহার করা হয় গবেষিত বিষয়ের বোধ বা উপলব্ধি (understanding) বাড়ানোর জন্য, যেমনটি শাহিদা পারভীন উল্লেখ

---

[৩৬] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা", মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

[৩৭] Nahid Ferdousi, *op. cit.*, p. 27.

[৩৮] Sahida Akter, *op. cit.*, p 16.

[৩৯] Khandaker Mursheda Farhana, "Socio-Cultural Adjustment of Poor Migrants in Urban Bangladesh: An Empirical Study on Rajshahi City" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2008), p. 28.

[৪০] মোসাঃ আকলিমা আখতার, "জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কে পল্লী জনগোষ্ঠীর সচেতনতার উপর গণযোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব: রাজশাহী জেলার একটি সমীক্ষা" (এমফিল অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ. ৩০।

[৪১] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা", মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২।

[৪২] তদেব।

[৪৩] Nurun Nahar, "Poverty Alleviation in Bangladesh: Problems and Prospects" (MPhil Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1999), p. 11.

করেছেন "বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের পরিচয় উদঘাটনের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত এ গবেষণাকর্ম। তার বিশাল ও বিস্তৃত কর্মজীবন ও সে অনুসংগে সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতির রূপ অনুধাবনে এই গবেষণা সহায়ক হবে এ প্রত্যাশা সবার"।[৪৪] কাজটি করা হয় তুলনামূলক বিবেচনা, বিবিধ সম্পর্ক যাচাই, তত্ত্বনির্মান এবং পুরাতন তত্ত্বের অভীক্ষণের (test) সাহায্যে।[৪৫] আইবিএস-এর নারী গবেষকরা এ ক্ষেত্রটিকে গবেষণায় চমৎকারভাবে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। গবেষণার বিষয় বা সমস্যাটি কেন তার বর্তমান রূপ পেয়েছে, অন্য কী কী বিষয়ের সাথে তার কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে এবং সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে-এসব জিজ্ঞাসার জবাব গবেষণার ফলে বেরিয়ে অসতে পারে। এতে প্রথমত জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয় এবং দ্বিতীয়ত সমাধান সুত্রসমূহ বাস্তবে প্রযুক্ত হয়ে মানব সমাজের উপকারে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।
প্রীতিকুমার মিত্র মনে করেন, নানাবিধ সসীমতার জন্য ডিগ্রিপ্রার্থী গবেষকের উচিত এমন ধরনের একটি গবেষণাকর্ম বেছে নেওয়া যেটি সব দিক বাঁচিয়ে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব।[৪৬] ফিলিপ্স ও পাগ টেস্টিং-আউট বা পূনঃপরীক্ষামূলক গবেষণাকেই ডিগ্রিপ্রার্থীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করেন।[৪৭] গবেষণায় দেখা গেছে আইবিএস-এর নারী গবেষকরা এ ধরনের গবেষণা করেন। তবে নারী গবেষকদের সবাই যে একই পন্থা বা পদ্ধতি অনুসরণ করেন এমনটি নয়। কারণ গবেষণার ধরন বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এসব গবেষক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন।

তবে আসল কথা হল, গবেষণার বিষয় বা টপিক (topic), টপিকটির জটিলতা ও কাজের পরিসর যদি যৌক্তিক সীমার মধ্যে থাকে, অর্থাৎ ডিগ্রিধারী গবেষকগণের সীমিত সাধ্যের বাইরে না যায়, তবেই সেটি নিয়ে গবেষণায় হাত দেওয়া সমীচীন।[৪৮] আইবিএস-এর নারী গবেষকরা যেহেতু এখানে এক বছরের কোর্স ওয়ার্কে অংশগ্রহণ করেন, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তারা গবেষণাকর্ম শুরু করেন।

গবেষণার উপলব্ধিসমূহেরও (findings) অনুরূপ সামাজিক ও অ্যাকাডেমিক উপযোগিতা থাকার কারণে নারী গবেষকরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। ওয়ালীউল্লাহর রীতি বিশ্লেষণ করার পর শামীমা হামিদ লিখেছেন:

---

[৪৪] শাহিদা পারভীন,"বেগম শামসুন নাহান মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি" (এমফিল অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬), পৃ. আট।

[৪৫] তদেব।

[৪৬] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৮।

[৪৭] উদ্ধৃত, তদেব।

[৪৮] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৯।

এভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তার নিজস্বতায়, অপার ঐকান্তিকতায় দেশজ আবহ এবং অভিজ্ঞতার পরিশীলিত সম্মিলনে নির্মাণ করে নিয়েছিলেন তার সাহিত্যের সূচারু পরিমন্ডল। তার নির্বিরোধ সৃষ্টিসচেতনতা তাকে বরাংবার পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে জীবন ও জগতের ভাবসৌন্দর্য উদঘাটনে। তার সৃষ্টির আধুনিকতা, দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে শেখায়, জীবনের অভ্যন্তরে তাকাতে তাকিদ দেয়। তাই তাকে শুধু শ্রেষ্ট বলা যথেষ্ট নয় বরং বলা যেতে পারে যে, সমকালীনদের মধ্যে তিনি হলেন সবচাইতে সম্পন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যশিল্পী।[৪৯]

মোবার্‌রা সিদ্দিকা তার অভিসন্দর্ভের উপসংহারে বলেন:

সার্বিক বিচারে বলা যায়, গল্প-উপন্যাস-নাটক-কাব্য-প্রবন্ধ প্রভৃতিতে মহিলারা যে সৃজনশীলতার ছাপ রেখেছেন তা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গতি দান করেছে। রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য ও জীবনবোধের রূপায়নে, সমাজ চেতনার প্রতিফলনে এবং শিল্পোৎকর্ষের বিচারে আধুনিক যুগের প্রস্তুতিপর্বের এসব মহিলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান পাবার যোগ্য বলা যায়।[৫০]

গুলনাহার বেগম তার অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে "প্রাচীন বাঙ্গাঁলী রমণীর বেশ ও ভূষণের চিত্রগুলিতে ফুটে উঠেছে সমকালীন বাঙ্গাঁলী সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক ও প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা।"[৫১]

গবেষণাকে অনেকেই একটি কারুকর্ম (craft) এর সাথে তূলনা করেছেন।। এটি সম্পাদন করতে সুসম্মৃদ্ধ নিয়ম-নীতি ও কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে হয়। অনুসন্ধান ও বিষয় নির্বাচন এর পর্বকে উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। উৎস সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে-(১) প্রাথমিক (primary) ও (২) সহায়ক (secondary) উৎস। প্রীতিকুমার মিত্র মনে করেন, উৎস হিসেবে প্রাথমিক ও সহায়ক দুই-ই গবেষণায় সমান উপযোগী তথা অপরিহার্য।[৫২] তিনি আরো বলেন, গবেষণায় তাদের অবদান পৃথক এবং অনেকটা সম্পূরক চরিত্রের। প্রাথমিক উৎস যা দেয়, তা সহায়ক দিতে পারেনা এবং সহায়ক উৎস যা সরবরাহ করে, তা প্রাথমিক উৎসের নাগালের বাইরে। প্রত্যেক গবেষকের উচিত দু

---

[৪৯] শামীমা হামিদ, "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম: শব্দ ব্যবহার ও চেতনা-প্রবাহরীতি" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭), পৃ. ২২৯।

[৫০] মোবার্‌রা সিদ্দিকা, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরীন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), পৃ. ২৬৮।

[৫১] গুলনাহার বেগম, "প্রাচীন বাঙ্গাঁলী রমণীর বেশ ও ভূষণ, আদি কাল থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ২৬১।

[৫২] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬।

ধরনের উৎসকেই সম্যক কাজে লাগানো এবং তাদের সঠিক ও পরিমাণ মতো ব্যবহার দ্বারা গবেষণাকে সার্থকভাবে তুলে আনা।[৫৩] আইবিএস-এর নারী গবেষকগণ উৎসকে যে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন, তা তাদের গবেষণাকর্মে প্রতিভাত হয়। ফ্যাকাল্টি অনুসারে এসব উৎস অনুসন্ধান ও ব্যবহারের পার্থক্য সুস্পষ্ট। তথ্যের উৎসের বর্ণনা দিতে গিয়ে আকলিমা আখতার লিখেছেন "এ গবেষণায় মূলত: দু'ধরনের উৎস থেকে উপাত্ত আহরণ ও তা ব্যবহার করা হয়েছে। যথা: (১) প্রাথমিক উপাত্ত এবং (২) গৌণ উপাত্ত। এক্ষেত্রে মাঠভিত্তিক তথ্যকে বলা হয়েছে প্রাথমিক উপাত্ত এবং বিভিন্ন লিখিত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বলা হয়েছে গৌণ উপাত্ত।"[৫৪] ইসরাত জাহান লিখেছেন, উৎস অনুসন্ধানে সার্ভে পদ্ধতি এবং কনটেন্ট বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে ইনফারেন্সগুলো ড্র করা হয়েছে।[৫৫] শর্মিষ্ঠা রায় লিখেছেন, গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, কেসস্টাডি পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে।[৫৬] জেবুন্নেছা লিখেছেন, নমুনায়িত এলাকা থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে বস্তিবাসীর সাক্ষাৎকার এবং ভিন্ন ধরনের প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক সামাজিক গোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।[৫৭] Rehena Siddiqua তার গবেষণায় বিভিন্ন বই, জার্নাল ছাড়াও দুইটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।[৫৮] Pervin Bhanu তার গবেষণায় চূড়ান্ত তথ্য সংগ্রহের সময় কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন, যেমন: (a) অংশগ্রহণকারীকে পর্যবেক্ষণ (b) মাঠ জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ, (c) অংশগ্রহণকারীর সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা; এবং (d) অংশগ্রহণকারীর

---

[৫৩] তদেব।

[৫৪] মোসাঃ আকলিমা আখতার, "আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল অবলম্বনে পল্লী জনগোষ্ঠীর উপর গণযোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ৭৩।

[৫৫] ইসরাত জাহান রূপা, "বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা: নির্বাচিত গ্রামসমূহের উপর একটি সমীক্ষা" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫), পৃ. ৩৩।

[৫৬] শর্মিষ্ঠা রায়, "যৌথ পরিবারের অস্থিতিশীলতা এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধদের নিরাপত্তার উপর এর প্রভাব: একটি থানা ভিত্তিক সমীক্ষণ" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), পৃ. ২৭।

[৫৭] জেবুন্নেছা জামান খান, "রাজশাহী ও খুলনা শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকার আর্থ-সামাজিক কাঠামো: একটি ভৌগোলিক বিশ্লেষণ" (এমফিল অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২), পৃ. ১১।

[৫৮] Mosammat Rehena Siddiqua, "Child Labour: Law and Practice in Bangladesh" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2002), p. 43.

ওরাল হিস্টরি রেকর্ডিং।[৫৯] Rukhsana Shaheen লিখেছেন, এই গবেষণার জন্য নানান ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যেমন-স্টাডি পপুলেশন, কংগ্লোমারেট অব পিপল এবং গবেষক কর্তৃক সজ্ঞামূলক অনুমান।[৬০] Murshida তার গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র, পর্যবেক্ষণ ও কেসস্টাডি ব্যবহার করেছেন, আর গৌণ উৎস হিসাবে স্টাটিসটিকাল ইয়ারবুক, স্থানীয় প্রসাশনিক দলিলপত্র এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করেছেন।[৬১] (২) Research বা পুনরনুসন্ধান, অর্থাৎ মুখ্য গবেষণা: এ পর্যায়ে আহরিত তথ্যগুলোকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে কাজে লাগানো হয় এবং (৩) Presentation বা উপস্থাপন: গবেষণাকর্মের পুরো প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন ধাপে পেশ করার লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করা হয়।[৬২] গবেষণার এ পর্বটি খুবই গূরুত্বপূর্ণ, কেননা, সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে অভিসন্দর্ভটি পঠনযোগ্য কি না? আইবিএস-এর নারী গবেষকগণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তাঁরা এ পর্বটিতে প্রায় সবাই সফল হয়েছেন। কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত অভিসন্দর্ভ টাইপ যন্ত্রে লিখে উপস্থাপিত হত। কিন্তু কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে সম্প্রতিককালের গবেষকগণ তাদের অভিসন্দর্ভ আরও সুন্দর, আকর্ষণীয় ও নির্ভুল আকারে উপস্থাপন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছেন।

নারী গবেষকদের গবেষণার প্রকৃতি: আইবিএস-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে

উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির আলোকে যেসব গবেষণাকর্ম এখানে সম্পন্ন হয় তাতে সক্রিয়ভাবে নারী গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। সমাজবিজ্ঞান, আইন, ভাষা ও সাহিত্য শৃঙ্খলায় নারী গবেষকদের পদচারণা চোখে পড়ার মতো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান, নিয়তি ভাবনা, জীবন চিন্তা, শব্দ ব্যবহার ও চেতনা-প্রবাহ রীতি প্রভৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন; আইন ও বিচার শৃঙ্খলায় ভোক্তা-অধিকার, শিশুশ্রম, পরিবেশগত সুবিচার, গ্রাম্য আদালত, শিশু-অপরাধ আইন এর মতো বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। আবার সামাজিক বিজ্ঞান শৃঙ্খলায়, লিঙ্গ বৈষম্য, দরিদ্র অভিবাসীদের স্থানান্তর, নারী সমাজের উন্নয়ন, ভাসমান পতিতাদের

---

[৫৯] Pervin Bhanu, "Administrative Decentralization in Bangladesh: A Study of Two Selected Upazilas" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1994), p. 27.

[৬০] Rukhsana Shaheen, "Exploration of Cognition of Health Care Seekers at Government Unani and Ayurvedic Degree College Hospital, Dhaka" (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 2000), p. 148.

[৬১] Khandaker Mursheda Farhana, *op. cit.*, p. 29.

[৬২] প্রীতিকুমার মিত্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা, "গবেষণার অষ্টকথা," মোঃ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫২-৫৬।

জীবনমান, স্বাস্থ্যসেবা প্রার্থীদের অবস্থা, নগরে পরিবার পরিবর্তনের ধারা, বৃদ্ধদের নিরাপত্তা অধিকার, বিভিন্ন শ্রেণি-গোষ্ঠীতে সংস্কৃতির প্রভাব, নারী শিক্ষা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আইবিএস-এর নারী গবেষকগণ বাংলাদেশের নারী গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের নানান ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বিবিধ বিচারে গবেষণার ধরন ও প্রকৃতি

আইবিএস-এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এমন নারী গবেষকগণ গবেষণার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন (মোট বাইশ জন) এমন গবেষকদের মধ্যে ইংরেজিকে গবেষণার ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন দশ জন, অর্থাৎ ৪৫.৪৫%; বাংলাকে ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন বারো জন অর্থাৎ ৫৪.৫৫%। এ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এমফিল পর্যায়ে নারীরা গবেষণার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির তুলনায় বাংলাকে অধিকতর পছন্দ করেছেন।

পিএইচডি গবেষকদের (মোট ত্রিশ জন) মধ্যে ইংরেজিকে ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন উনিশ জন অর্থাৎ ৬৩.৩৩%, অন্যদিকে বাংলাকে ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন এগারো জন অর্থাৎ ৩৬.৬৭%। এ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পিএইচডি পর্যায়ে নারীরা গবেষণার মাধ্যম হিসেবে বাংলার তুলনায় ইংরেজিকে অধিকতর পছন্দ করেছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে ২০০২ সালের পরে কোন নারী বাংলা মাধ্যমে এমফিল গবেষণা সম্পন্ন করেননি এবং ২০০৩ সালের পরে অনেক দিন বিরতি দিয়ে একজন নারী ইংরেজি মাধ্যমে এমফিল গবেষণা সম্পন্ন করেন, যদিও তিনি অভিসন্দর্ভ দাখিল করেছিলেন ২০০৮ সালে। ২০০৩ সালের পরে নারী গবেষকগণ সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আইবিএস-এর কাঠামো (structure) কে অনুসরণ করে এমফিল ডিগ্রি সম্পন্ন না করে গবেষণাকর্মটিকে পিএইচডি-তে স্থানান্তর করেছেন, ব্যতিক্রম কেবল শাহরিন মঞ্জুর। উল্লেখ্য যে, ইংরেজি মাধ্যমে পিএইচডি অর্জনকারী নারীদের মধ্যে তিন জন আইবিএস থেকে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। তারা হলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের Ms. Zeennat Ara Begum; অবশ্য তিনি তার এমফিল ডিগ্রি সম্পন্ন করেন বাংলা মাধ্যমে; মনোবিজ্ঞান বিভাগের Sultana Nazneen এবং লোক প্রশাসন বিভাগের Pervin Bhanu. আর বাংলা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারীদের মধ্যে পাঁচ জন আইবিএস থেকে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। তারা হলেন অর্থনীতি বিভাগের ইসরাত জাহান রূপা, মনোবিজ্ঞান বিভাগের মোসাঃ আকলিমা আখতার, সমাজকর্ম বিভাগের জুবাইদা আয়েশা সিদ্দীকা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শাহানা কায়েস এবং সমাজকর্ম বিভাগের শর্মিষ্ঠা রায়।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী (মোট ২৬৭ জন) ২৩৭ জন পুরুষের বিপরীতে ৩০ জন নারী গবেষক আইবিএস-এ গবেষণা করেন বা করার সুযোগ

পান যার অনুপাত ৮৮.৭৬ ঃ ১১.২৪। অন্যদিকে এমফিল ডিগ্রি অর্জনকারী (মোট ৭৯ জন) ৫৭ জন পুরুষের বিপরীতে ২২ জন নারী গবেষক আইবিএস-এ গবেষণা করেন বা করার সুযোগ পান যার অনুপাত ৭২.১৫ ঃ ২৭.৮৫। এসব তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বাংলাদেশের নারীরা এখনও পুরুষের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের নারীরা যেখানে সাধারণ শিক্ষায় অনগ্রসর, সেখানে আইবিএস-এর মতো বাংলাদেশ বিষয়ক উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত আন্ত-শাস্ত্রীয় এ প্রতিষ্ঠানটিতে নারী গবেষকদের অন্তর্ভুক্তি ও কর্মপ্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। সর্বদিক বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণায় উল্লেখ্য সময়কালে আইবিএস-এ নারী গবেষকদের প্রবেশ ক্রমান্বয়ে যেমন বেড়েছে, তেমনি গবেষণার কাঙ্খিত মানও উন্নত হয়েছে সন্তোষজনকভাবে। অবশ্য অনুষদভেদে নারী গবেষকদের অংশগ্রহণে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাদের প্রবেশ্য অনুষদগুলোতে গবেষণাকর্ম সার্বিক বিচারে অনবদ্য ও কাঙ্খিত যা সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আইবিএস-এর নানা প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাদের গবেষণার ধরন ও প্রকৃতি যেমন বৈচিত্রময় তেমনি সময়োপযোগী, যুগান্তকারী ও বস্তুনিষ্ঠ। পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আইবিএস গবেষণার ক্ষেত্রে যে নতুনত্ব আনয়ন করতে সক্ষমতা অর্জন করেছে, নারী গবেষকগণ সে সুযোগ গ্রহণ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা (১৯৯১-২০০১) : বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের তুলনামূলক পর্যালোচনা

মো. সুলতান মাহমুদ*

Abstract: This article makes a comparative analysis of the political developments in Bangladesh during the BNP and AL regimes. The main purpose of this article is to examine the problems of political development in Bangladesh in the light of the crises of governance. The theoretical framework of political development has been discussed in this paper. The major emphasis is on understanding the problems of political development with reference to the effectiveness of political institutions, accountability of government and the role of civil society during BNP and AL government. Finally the writer suggests the prospects of political development in Bangladesh.

ভূমিকা

১৯৯০ সালের গণআন্দোলন-পরবর্তী বাংলাদেশে যে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এস পি হান্টিংটন তাকে গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১] '৯০ দশকে গণতন্ত্রের ন্যূনতম নির্দেশকগুলো ক্রমাগত পূরণের অব্যাহত প্রচেষ্টা রাজনৈতিক উন্নয়নের যাত্রায় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষত: অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন, নির্বাচনের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন, মৌলিক স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক কর্মসূচির ওপর বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় ১৯৯১-২০০১ সালে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ আমলে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়।[২] তবে উল্লিখিত প্রচেষ্টাসমূহ সত্ত্বেও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যয়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর অনেক বছর

---

* ড. মো. সুলতান মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ Samuel P. Huntington, "Democracy's Third Wave," *Journal of Democracy* 2(2), 1991. pp. 12-34.

২ Adam Przeworski, "Minimalist Conception of Democracy : A Defense", in Ian Shapiro and Casiano Hecker-Gordon (eds), *Democracy's Value* (Cambridge : Cambridge University Press, 1999).

কেটে গেলেও ক্রমেই তা অনুদার গণতন্ত্রের নমুনা সৃষ্টি করেছে।[৩] ১৯৯১-৯৬ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এবং ১৯৯৬-২০০১ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে।[৪] মূলত এই দু'টি আমলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা কাজ করেছে তার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর আবির্ভাব রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ থেকে রাজনীতি-বিশ্লেষকগণ পাশ্চাত্য রাজনৈতিক উন্নয়নকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক উন্নয়ন যাচাই করতে শুরু করেন। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয়েছিল রাজনৈতিক উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে একটি মানদণ্ড দাঁড় করানো, যার ভিত্তিতে অন্যান্য ব্যবস্থাকে তুলনা করে দেখা যে, এসব দেশে কতটুকু রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

রাজনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণে Samuel P. Huntington এর চিন্তাধারা এক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। তাঁর দৃষ্টিতে "Political Development as the institutionalization of political organization and procedures"[৫]

Almond and Powell রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন- Political Development is increased secularization of political culture the significance of such development is in general to increase the effectiveness and efficiency of performance of the political system to increase its capabilities."[৬] তাঁরা রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আরো বলেন, "Political Development has been defined as the increased differentiation and specialization of political structures and the increased secularization of political culture".[৭]

Howard Riggs রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, The term 'Development' in

---

[৩] Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy," *Foreign Affairs*, November/ December, 1997, p.12.

[৪] Fakruddin Ahmed, *The Caretakers : A First Hand Account of the Interim Government of Bangladesh (1990-91)* (Dhaka : The University Press Limited, 1998) and Muhammad A Hakim, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum* (Dhaka : The University Press Limited, 1993), p. 13.

[৫] Samsuel P. Huntington, "Political Development and Political Decay" in Welch (ed.), *Political Modernization* (London : Words Worth Publishing Company, Inc. 1977), p.44.

[৬] Gabriel A. Almond and Bringham Powell Jr., *Comparative Politics : A Developmental Approach*, (Boston : Little Brown & Company, 1966), p. 105.

[৭] *Ibid.*

the political context be confined to connote an increasing ability to make and carry but collective decisions affecting the environment (not the context).[৮]

রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি সাবলীল সংজ্ঞা প্রদানের নিমিত্তে G.A. Almond এর অনুপ্রেরণায় Committee on Comparative Politics of International Social Science Research Council প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই কমিটির মতে রাজনৈতিক উন্নয়ন - "A continuous interaction among the process of structural differentiation, the imperatives of equality and the integrative, responsive and adaptive capacity of a political system."[৯]

Philips Cutiright রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, "Political Development in terms of degrees of democratization as measured by parliamentary & election records, political stability and other criteria"[১০]

রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর ধারণাগুলোকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো হলো :

১. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি;
২. অংশগ্রহণমূলক নাগরিক সমাজ সৃষ্টি;
৩. একটি সক্ষম শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করা যারা দেশের জনগণের কাছে তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং
৪. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা সৃষ্টি করা যাতে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা লক্ষ্য করা যায়।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৯১-২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কতটুকু রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে। এমনকি উক্ত সময়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, নাকি এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে তা চিহ্নিত করাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। তবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো:

১. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা পরীক্ষা;
২. জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন এবং
৩. সিভিল সমাজের ভূমিকা পর্যালোচনা ।

---

[৮] J.C Johari, *Comparative Politics* (New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Limited, 1996), p.175.

[৯] এ কমিটি প্রায় দশ বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করে এ সম্পর্কে মূল্যবান অবদান সংযোজন করে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, J.C Johari, *op.cit.*, pp. 173-174.

[১০] Philips Cutright, "National Political Development : Measurement & Analysis", in James C. Charlesworth (ed.), *Contemporary Political Analysis* (New York : The Free Press, 1968), p.169.

গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল

প্রবন্ধটি সম্পাদনের জন্য মূলত দু'টি গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যথা : ক) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method), খ) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)। এখানে মূলত মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মের জন্য সরকারি অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট বিবরণী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, নির্বাচনী ইশতেহার, ঘোষণাপত্র, সংবাদ, বিবৃতি, প্রচারমাধ্যম, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ও ইন্টারনেটসহ বাংলাদেশের রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং ইতিহাসের ওপর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

১. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা

১.১ সরকারি ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

১৯৯১ সালে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা শুরু হলেও রাজনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য নির্দেশক হিসেবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার মাত্রা পূর্ববর্তী সামরিক শাসনের তুলনায় খুব বেশি পরিবর্তন হতে দেখা যায়নি।[১১] রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে সমাজ উত্তরণ ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা অর্জন। কিন্তু '৯০ পরবর্তীতে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যাশা জাগ্রত হলেও রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব, দলীয় ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সমস্যা, জাতীয় সংসদের অকার্যকারিতা, রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি ১৯৯১-১৯৯৬ এবং ১৯৯৬-২০০১ সালে যথাক্রমে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। মূলত প্রতিটি দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতি রাজনৈতিক নেতাদের অগণতান্ত্রিক আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। যা প্রকারান্তরে জাতীয় পর্যায়ে মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ঐকমত্য সৃষ্টিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় কোনো রাজনৈতিক শক্তি অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান দুই শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রতিযোগিতামূলক দোর্দণ্ড উপস্থিতি অব্যাহত থাকে।[১২] বিশেষত এর প্রভাবেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের মধ্যে অবিশ্বাস ও দুরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে কয়েকটি সফল সংসদীয় নির্বাচন এ দেশে গণতন্ত্রের যাত্রাকে সুসংহত করেছে।[১৩] কিন্তু নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে অনির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং

---

[১১] Talukder Maniruzzaman, *Politics and Security of Bangladesh* (Dhaka : The University Press Limited, 1994), pp. 42-43.

[১২] অরুণ কুমার গোস্বামী, "গণতন্ত্রে ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত", রতনতনু ঘোষ (সম্পা.), *গণতন্ত্র : স্বরূপ সংকট সম্ভাবনা* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০০২), পৃ. ১৩৭।

[১৩] S. Aminul Islam, "Political Parties and Future of Democracy', in A. M. Chowdhury and Fakrul Alam (eds), *Bangladesh on the Treshold of the Twenty-First Century* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002), p. 67.

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিজয়ী এবং পরাজিত বড় দলগুলোর পরস্পরবিরোধী দাবি ঐকমত্যের অভাবজনিত সমস্যাকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় রাজনৈতিক দলই প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।[১৪] তবে সরকার ও বিরোধী দল ১৯৯১-২০০১ সালে একটি অভিন্ন কথা বরাবরই বলেন যে, প্রত্যেকেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।[১৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা করেনি। গণতন্ত্র রক্ষার কথা বললেও উভয় দলই নিজেদের দলে অভ্যন্তরেই গণতন্ত্র চর্চা করতে অনীহা প্রদর্শন করছে। ফলে ১৯৯১-১৯৯৬ সালে এবং ১৯৯৬-২০০১ সালে যথাক্রমে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি বরং গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সরকারি ও বিরোধী দল পরস্পরকে দায়ী করে বক্তৃতা বিবৃতি অব্যাহত রাখে।[১৬] এ সময়ে জাতীয় কোনো ক্ষেত্রেই তেমন অগ্রগতি হয়নি। বিরোধী এবং সরকারি দলগুলো যেমন নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লিপ্ত হয়ে জাতিকে সত্যিকার কোনো দিক-নির্দেশনা দিতে পারেনি। অন্যদিকে ১৯৯৬ সালে ১২ জুনের নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র রক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও বাস্তবে পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের অনুরূপ কার্যক্রমে লিপ্ত হয়।[১৭] আওয়ামী লীগ আমলে বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতির কারণে সাধারণ ও উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রোহী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়, যা পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের আমলেও লক্ষ্য করা যায়।[১৮] ১৯৯১-৯৬ সালে সরকারি দলের সাথে বিরোধী দলের সম্পর্ক এবং কর্মকাণ্ড পরবর্তীতে ১৯৯৬-২০০১ সালেও লক্ষ্য করা যায়। বিরোধী দল সরকারি দলের প্রতি এবং সরকারি দল বিরোধী দলের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ প্রদর্শন করে।[১৯] এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ চলে যায় ব্যক্তিগত আক্রমণে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিএনপি সরকারের শুরু থেকে ১৯৯২ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে দেশের রাজনীতি বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, গণরায়ে প্রদত্ত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের ফাঁসি কার্যকর করা এবং ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবির ইস্যুতে উত্তপ্ত হয় সংসদের অধিবেশন। সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং আর হরতালে উত্তপ্ত হয় রাজপথ। আইনশৃঙ্খলা

---

[১৪] অরুণ কুমার গোস্বামী, "গণতন্ত্রে ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত", রতনতনু ঘোষ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮।

[১৫] Ataur Rahman, *Democratization in South Asia : Bangladesh Perspective* (Dhaka : Bangladesh Political Science Association, 2000), p. 17.

[১৬] Sreeradha Datta, "Bangladesh's Political Evolution : Growing Uncertainities", *Strategic Analysis*, Vol. 27, No. 2, April-June 2003, p. 234.

[১৭] সাহাবুল হক এবং বায়েজীদ আলম, *বাংলাদেশের জোট রাজনীতি : ১৯৫৪-২০১৪* (ঢাকা: অবসর, ২০১৪) পৃ. ২৫৫।

[১৮] Arun Kumar Goswami, "Rajshahi-5 Parliamentary by-election : An Analysis," in perspective in Social Science Vol. 7. June 2001. pp. 123-157. Center for Advanced Research in Social Science, University of Dhaka.

[১৯] এস এম রাজী, "বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভূমিকা (১৯৯০-২০০১) : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।

পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে।[২০] দীর্ঘ ১৫ বছরের সামরিক শাসন (১৯৭৫-১৯৯০) থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের আবির্ভাব ঘটলেও এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও সরকারি ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা কাজ করে।[২১] বিশেষ করে উভয় সরকারের আমলে সরকারি ও বিরোধী দলের পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক এবং অসহযোগিতামূলক মনোভাবও এর জন্য দায়ী। এমনকি সামরিক শাসনে বিদ্যমান নানাবিধ অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডও অব্যাহত থাকে।[২২] ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উভয় সরকারের উদাসিনতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়ের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

১.২ বিচারবিভাগের স্বাধীনতা

বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিচার বিভাগের অদক্ষতা এবং আযাগ্যতা বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা আনয়ন করে। নিম্ন আদলতের বিচারক নিয়োগ, বদলি এবং পদোন্নতিতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় সরকারের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক সরাসরি প্রভাবিত হয়।[২৩] বিশেষ করে ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নে বিচার বিভাগ স্বাধীন নয়, এই মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[২৪] ওই সময়ে বিচারব্যবস্থায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নতুন করে নয়জন বিচারপতি নিয়োগে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ আপত্তি তোলেন দু'টি কারণে। এক. এ ব্যাপারে নিয়ম অনুযায়ী তার সাথে আলোচনা করা হয়নি। দুই. নতুন প্রস্তাবিত বিচারপতিদের নিয়োগের পেছনে সরাসরি বিএনপির নেতা ও কতিপয় দুর্নীতিবাজ আমলাও ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিচারপতি নিয়োগকে কেন্দ্র করে সরকারের ভূমিকার নিন্দা করে বিবৃতি দেয়।[২৫] অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ১৯৯৯ সালের ২৩ অক্টোবর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের প্রশ্নে বিচারপতিরা সমালোচনায় মুখর হন। তারা বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। স্বয়ং বিচারপতিগণও বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করায় দেশবাসী শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এভাবেই আওয়ামী লীগ

---

[২০] Rukhsana Ahmed, "Interface of Political Opportunism and Islamic Extremism in Bangladesh: Rhethorical Identification in Government Respons", *Communication Studies*, Vol. 60, No.1 (Jan.-Mar., 2009), p.86.

[২১] S. Aminul Islam, "Political Parties and Future of Democracy', in A. M. Chowdhury and Fakrul Alam (eds), *op.cit.* p. 68.

[২২] Rounaq Jahan, "The Challenges of Institutionalising Democracy in Bangladesh", *Institute of South Asian Studies* (Tower Block : Singapore : , ISAS Working Paper 2008), pp. 3-4.

[২৩] Rounaq Jahan, "The Chalenges of Institutinalizing Democracy in Bangladesh", *ISAS Working Paper* (Tower Block, Singapore : Institute of South Asian Studies, 2008), p. 20.

[২৪] মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস : ১৯৯০-১৯৯৯* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ৩১০-৩১১।

[২৫] *তদেব*, পৃ. ৩০৮-৩১৫।

সরকারের আমলেও আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই বিএনপি সরকারের মতোই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়।[২৬] বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কম-বেশি উদ্যোগ লক্ষ করা গেলেও কার্যকর অর্থে তা বাস্তবায়নে তাদের কোনো আন্তরিকতা ছিল না।

অতএব বলা যায়, বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি। উপর্যুক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) এবং আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) উভয় আমলেই বিচারিক কর্মকাণ্ডে সরকারি-নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান ছিল। বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

১.৩ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা

রাজনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা এবং বিরোধী দলের সংসদে অংশগ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিএনপি ও ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সংসদ বস্তুত অকার্যকর হয়ে পড়ে। উভয় আমলে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে অহি-নূকুল সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। বিরোধী দল নিয়মিতভাবে সংসদে অংশগ্রহণ করেনি। পঞ্চম সংসদের মোট ২২টি অধিবেশনের মধ্যে বিরোধী দল একটানা শেষের ৯টি অধিবেশন বর্জন করে। তেমনি সপ্তম সংসদের মোট ২৩টি অধিবেশনের মধ্যে বিএনপি এককভাবে তিনটি এবং জোটবদ্ধভাবে বিরোধী দলসমূহ শেষের ১০টি অধিবেশন বর্জন করে। সংসদের কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিরোধী দল যেসব অধিবেশনে উপস্থিত ছিল সেসব অধিবেশনে বিল সংশোধন ও শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপ অধিক হারে সম্পাদিত হয়েছে।[২৭] এছাড়াও পঞ্চম সংসদের তুলনায় (খালেদা জিয়ার আমল) সপ্তম সংসদ আমলে (শেখ হাসিনা আমল) গৃহীত বিলগুলোর মধ্যে অধ্যাদেশের সংখ্যা কম ছিল। পঞ্চম সংসদ আমলে মোট ১০১টি অধ্যাদেশ জারি করা হয় যার মধ্যে ৬৩টি বিল আকারে সংসদে গৃহীত হয় এবং তা ছিল পঞ্চম সংসদে গৃহীত সাধারণ বিলের ৪১%। অপরপক্ষে, সপ্তম সংসদে (শেখ হাসিনা আমল) মাত্র ২১টি অধ্যাদেশ জারি করা হয় যার মধ্যে বিল আকারে গৃহীত হয় ১৯টি যা ছিল সপ্তম সংসদে গৃহীত সাধারণ বিলের ১১%। সপ্তম সংসদ আমলে সংশোধিত আকারে গৃহীত বিলের অনুপাত ছিল ৩৭%। আর পঞ্চম সংসদে সংশোধিত আকারে গৃহীত বিলের অনুপাত ছিল সর্বনিম্ন ২৪% মাত্র। অর্থাৎ সপ্তম সংসদে সদস্যগণ সরকার কর্তৃক পেশকৃত বিল সংশোধনের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এমনকি পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে কমিটি ব্যবস্থাও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে মতবিরোধের কারণে কমিটিগুলো যথাসময়ে গঠন করা সম্ভব হয়নি। কমিটির

---

[২৬] Moudud Ahmed, *Bangladesh: A Study of the Democratic Regimes* (Dhaka: The University Press Limited, 2012), p. 347.

[২৭] Harun A Khan, "Democratization in Bangladesh", *Asian Profile*, Vol. 26, No.2, April 1998, p.42.

সুপারিশগুলোও সরকার বাস্তবায়িত করেনি।[২৮] প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কমিটিগুলো ব্যর্থ হয়। (বিস্তারিত দেখুন, সারণি ৫.১, ৫.২ এবং ৫.৩)

সারণি ০.১ : জাতীয় সংসদ সম্পর্কে সাধারণ বিবরণী (পঞ্চম এবং সপ্তম সংসদের তুলনামূলক চিত্র)

বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬)	পঞ্চম সংসদ	সপ্তম সংসদ
১. স্থায়িত্বকাল (মাস)	৫৬	৬০
২. অধিবেশন সংখ্যা	২২	২৩
৩. কার্যদিবস	৪০০	৩৮২
৪. বৈঠক কাল (ঘণ্টা)	১৮৩৪	১৬২৫
৫. সদস্যদের উপস্থিতির দৈনিক গড়	১৮০	১৬৫.
৬. সদস্যদের উপস্থিতির শতকরা হার	৫৪.৬	৫০

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ০.২ : জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কাজ (পঞ্চম এবং সপ্তম সংসদের তুলনামূলক চিত্র)

বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬)	পঞ্চম সংসদ	সপ্তম সংসদ
সরকারি বিল (সাধারণ)		
১. উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	১৬৫	২০৪
২. সংসদে গৃহীত বিলের সংখ্যা	১৫৩	১৭২
ক. মৌলিক বিল	৯০ (৫৯%)	১৫৩ (৮৯%)
খ. অধ্যাদেশ	১৯ (১১%)	১৯ (১১%)
গ. সংশোধিত আকারে গৃহীত	৬৪ (৩৭%)	৬৪ (৬৪%)
ঘ. সংশোধন ব্যতীত গৃহীত	১০৮ (৩৬%)	১০৮ (৬৩%)
বেসরকারি বিল		
ক. নোটিশ সংখ্যা	৭৫	৪৭
খ. সংসদে গৃহীত বিলের সংখ্যা	০০	০১

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ০.৩ : জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কাজ (পঞ্চম এবং সপ্তম সংসদের তুলনামূলক চিত্র)

বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬)	পঞ্চম সংসদ	সপ্তম সংসদ
সরকারি বিল (সাধারণ)		
১. প্রশ্নোত্তর (তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন)		
ক. নোটিশ সংখ্যা	৩৭,৮৯৮	*৩০,৩৫১
খ. স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	৯,৩৯১	৯,১৯১
গ. সংসদে উত্তর প্রদত্ত/আলোচিত	৮,২২১	৮,৫৫৯
২. মুলতবি প্রস্তাব		
ক. নোটিশ সংখ্যা	১,৮০৩	৪,৭৩৭
খ. স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	০৬	১,৫০২

[২৮] মো. রুহুল আমিন, "বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-এর কার্যকারিতা (১৯৮১-১৯৯৫)", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১; সেরিফা পারভীন, "বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা (১৯৯৬-২০০১) : একটি পর্যালোচনা", অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

গ. সংসদে আলোচিত	০৫	০০
৩. সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব		
ক. নোটিশ সংখ্যা	৮১১	৫৫৩
খ. স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	৮৫	২১
গ. সংসদে আলোচিত	৪০	০৭
৪. মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব		
ক. নোটিশ সংখ্যা	৫,৮৮০	১৫,১৯৮
খ. স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	৫৮১	৭৫৯
গ. সংসদে আলোচিত	৩৪০	৪১৯
৫. সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব		
ক. নোটিশ সংখ্যা	৫৫,৩২০	৫৭,৭৫২
খ. স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	১৮,৫০০	২৯,৮৬০
গ. সংসদে আলোচিত	১১২	৯০
ঘ. সংসদে গৃহীত	০২	০০
৬. অনাস্থা প্রস্তাব		
ক. নোটিশ সংখ্যা	০১	০০
খ. স্পিকার কর্তৃক গৃহীত	০১	০০
গ. সংসদে আলোচিত	০১	০০

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ।*

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারপদ্ধতি বা সংসদের মর্যাদা কিংবা সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেনি। সংসদীয় পদ্ধতিতেও জাতীয় সংসদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের আমলে বিরোধী দল পঞ্চম সংসদের মোট কার্যদিবস ২৬৫ দিনের মধ্যে ১৩৫ দিন সংসদের বাইরে ছিল এবং ১৩০ দিন উপস্থিত ছিল। অন্যদিকে ১৯৯৬-২০০১ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদের মোট কার্যদিবস ২১৯ দিনের মধ্যে বিরোধী দল ১৬৩ দিন সংসদের বাইরে ছিল এবং ৫৬ দিন উপস্থিত ছিল।[২৯] নিম্নে সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলো:

সারণি ০.৪ : পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি/ অনুপস্থিতির সংখ্যা (১৯৯১-২০০১)

সরকার	মোট কার্য দিবস	অনুপস্থিতির সংখ্যা	উপস্থিতির সংখ্যা
১৯৯১-১৯৯৬ (বিএনপি সরকার)	২৬৫ দিন	১৩৫ দিন	১৩০ দিন
১৯৯৬-২০০১(আওয়ামী লীগ সরকার)	২১৯ দিন	১৬৩ দিন	৫৬ দিন

[২৯] *দৈনিক আমাদের সময়*, ১১ নভেম্বর ২০১২।

চিত্র ০.১ পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি/ অনুপস্থিতির প্রবণতার তুলনামূলক চিত্র (১৯৯১-২০০১)

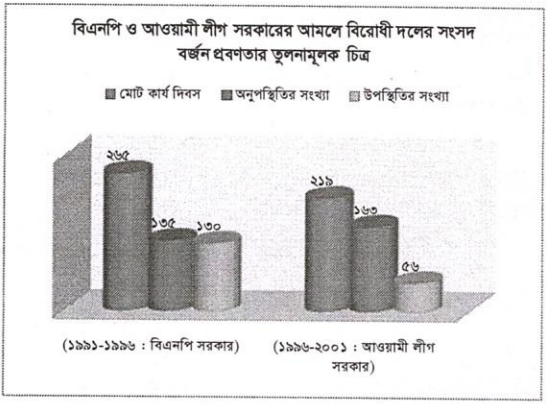

কাজেই, বাংলাদেশের পঞ্চম ও সপ্তম উভয় সংসদই আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। অনেক সময় বিরোধী দলের দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে পার্লামেন্ট একদলীয় সংসদে পরিণত হয়েছে। ফলে পার্লামেন্টের বৈধতা ও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে উভয় পার্লামেন্টেই বিরোধী দল সরকারের কর্মসূচিকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, বিরোধী দলগুলো (পঞ্চম সংসদে আওয়ামী লীগ এবং সপ্তম সংসদে বিএনপি) লাগাতার সংসদ বর্জন করে জাতীয় সংসদের অকার্যকারিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়নের যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের দাবি ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। তৎকালীন বিএনপি সরকার এ দাবি না মানলে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু সরকার নানা অজুহাতে এই পদত্যাগ কার্যকর না করে প্রায় দুই বছর একদলীয় সংসদ বহাল রাখে ।[৩০] আর সপ্তম সংসদে বিরোধী দলের প্রধান অভিযোগ ছিল সংসদে তাদেরকে কথা বলার পর্যাপ্ত সুযোগ না দেয়া। অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ ও আগাম নির্বাচনের দাবি করে তারা। আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দলের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং প্রায় দুই বছর বিরোধী দলবিহীন সংসদ চালু রাখে।[৩১] কোনো ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলকে সংসদে আনতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, কিংবা গ্রহণযোগ্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করে তাদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করতে চায় না।

---

[৩০] Abdur Rob Khan, "Political Challenges of Bangladesh The Twenty First Century" Paper Presented at the National Seminar on *Bangladesh Facing the Twenty First Century* Organized by *BIIS*, 5-6 February 1995.

[৩১] এস আর চৌধুরী, "দ্বিদলীয় রাজনীতির বাস্তবতা: বিকল্প ধারার উপলব্ধির কথা', *ভোরের কাগজ*, ২৮ জানুয়ারি ২০১০।

তারা পাঁচ বছর মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে চায়। অপরদিকে বিরোধী দলও সংসদে অংশগ্রহণ করা তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেনি। তারা সংসদে থেকে তাদের দাবি পূরণের জন্য আন্দোলন করতে পারতো। কিন্তু তা না করে তারা সংসদ বর্জনের সাথে হরতাল ও বিভিন্ন সহিংস কার্যকলাপের মাধ্যমে সরকারকে এবং গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলকে অস্থিতিশীল করে। বিরোধী দল হয়তো সংসদ বর্জন করে সরকারের ওপর অধিকতর চাপ দিতে চায়, কিন্তু একথা ভাবে না যে, ক্ষমতায় থাকা কালে যেখানে নিজেরা বিরোধী দলের সংসদ বর্জনে বিচলিত বোধ করে না সেখানে অন্য পক্ষ কেন করবে। এভাবে বিরোধী দল যে সংসদের অপরহির্য অংশ এই সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। আর সাধারণ ভোটারদের রাজনৈতিক চিন্তার মান এমনই যে, তারা সংসদ বর্জনকে দোষের বলে মনে করে না। তাই দেখা যায় পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ বর্জনকারী বিরোধী দলই পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হয়েছে।[৩২]

এছাড়াও ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিরোধী দলগুলোর ওপর প্রতিপক্ষের আচরণ, সংসদ থেকে বিরোধী দলের বয়কট, ওয়াকআউট প্রভৃতির মধ্যে বিএনপি সরকার থেকে কোনো পার্থক্য ছিল না বললেই চলে। স্পিকার সবসময়ই ক্ষমতাসীন দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কাজ করেছেন। জননিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে বিরোধী দলের প্রতি প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধমূলক আচরণ অব্যাহত থাকে। সরকারি ও বিরোধী দলের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস এবং নিজ নিজ দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য দেয়ায় পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদকে জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংকট মোচনের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সংশ্লিষ্ট সকল দলের ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়।[৩৩] ফলে উভয় সরকারের সময় রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

১.৪ নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা

১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনে নির্বাহী বিভাগকে সংসদের নিকট দায়িত্বশীল করা হয়। কিন্তু সংবিধানে ৭০ নং অনুচ্ছেদ সংযোজিত হলে প্রকৃত নির্বাহী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি শুধু তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবেই থেকে যায়। সংসদ-সদস্যকে ক্রসভোটিং এর সুযোগ না দেয়া, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি প্রধানমন্ত্রীর হাতকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তাছাড়া নির্বাহীর জরুরি ক্ষমতাসহ বিশেষ ক্ষমতাও চালু থাকে, যা অদ্যবধি বলবৎ রয়েছে। কাজেই বলা যায়, ১৯৯১-২০০১ সালে (বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকার) বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতেও নির্বাহী ক্ষমতা যথেষ্ট

---

[৩২] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, "বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ", তারেক শামসুর রেহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশে রাজনীতির চার দশক* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৫৪।

[৩৩] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ* (ঢাকা : অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ২৪৩-৪৪।

শক্তিশালী এবং এর বিশেষ ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকায় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব হয়নি।[৩৪]

এমনকি ক্ষমতার লোভে সংসদ-সদস্যদের মধ্যে দল পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগের ঐকমত্যের সরকারে যোগদান নিয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ৯ ফেব্রুয়ারি চাঞ্চল্যকর দল পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে যখন বিএনপি দলীয় সাংসদ (সিরাজগঞ্জ-৭) হাসিবুর রহমান স্বপন মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেন। বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি উপমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ তাকে শপথবাক্য পাঠ করান। তাকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেয়ায় বিএনপি থেকে তাকে বহিষ্কারও করা হয়। ১৯৯৮ সারের ১১ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, আমাদের একজন থার্ড ক্লাস এমপিকে নিয়ে মন্ত্রী করেছে সরকার ।[৩৫] এরপর আবার ১৯৯৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপি দলীয় আরেক সাংসদ ডা. মো. আলাউদ্দিন (রাজশাহী-৫) মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। ডা. মো. আলাউদ্দিনকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার পর ১৯৯৬ সালের ৭ মে বিএনপিতে যোগ দেন। মূলত '৯৬-এর ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন না-পাওয়াতেই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ কের বিএনপিতে যোগ দেন এবং বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে তিনি নির্বাচিতও হন।[৩৬] এভাবে দেখা গেছে যে, কোনো সরকারের সময়ই নির্বাহীর জবাবদিহিতা এবং ৭০ অনুচ্ছেদের প্রভাবে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

২. জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা

জবাবদিহিতার প্রশ্নটি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জবাবহিদিতার ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ, গণমাধ্যম ও সিভিল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৯১-১৯৯৬ এবং ১৯৯৬-২০০১ সালে যথাক্রমে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে কোনো আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এর একটা অদ্ভুত দিক চোখে পড়ে। সেটি হলো, যেকোনো প্রকার সংবাদ প্রকাশ করার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও সরকারের পক্ষে নয় এমন কোনো সংবাদ ছাপা হলে সংবাদপত্র ও রিপোর্টারদের ওপর নির্যাতন লক্ষ্য করা যায়।[৩৭] বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়া অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া এবং জরিমানা করাও এ

---

[৩৪] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, "বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ", তারেক শামসুর রেহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশে রাজনীতির চার দশক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

[৩৫] *দৈনিক সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

[৩৬] S. A. Kochanek, "Bangladesh in 1996 : The Year of Independence," *Asian Survey*, Vol. 37. No. 2. 1997, pp. 136-142.

[৩৭] সুলতান মাহমুদ রানা, "সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৩ এপ্রিল ২০১৪।

ধরনের সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক সরকারি পদক্ষেপ।[৩৮] অন্যটি হলো সম্পাদক থেকে রিপোর্টার পর্যন্ত যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা এবং অনেক সময়ে পুলিশী হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাদের ওপর নির্যাতন করা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ ধরনের নির্যাতন সরকারিভাবে হলেও এ সম্পর্কে কোনো রিপোর্টের বিরুদ্ধেই কোনো সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকে না। এদিক দিয়ে সংবাদপত্রগুলো পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।[৩৯]

১৯৯১-২০০১ সালে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ আমলে বাংলাদেশে গণমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যম মোটামুটিভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাইরে ছিল।[৪০] এ সময়ে জনগণের স্বাধীনতাসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যৌক্তিক বিধি-নিষেধের ক্ষেত্র ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল। বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকার সাধারণত বাক স্বাধীনতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল, এমনকি মুক্ত সমালোচনাও সহ্য করেছে। দেশে যেখানে সেখানেই সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনাস্বরূপ সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা হয়। ১৯৯১-২০০১ সালে সরকার বাক ও প্রকাশনার ওপর তেমন কোনো বিধি-নিষেধ আরোপের চেষ্টা করেনি যেমনটা পূর্ববর্তী সামরিক শাসকরা করেছিলেন।[৪১] তবে সরকার রেডিও টেলিভিশনে বিরোধী দলকে সমান সুযোগ না দেয়ার নীতি উভয় সরকারের আমলেই অব্যাহত ছিল। এ সময়ে (উভয় সরকারে সময়ই) বিরোধী দল কিংবা সরকারি দল নিজ দলীয় স্বার্থের বাইরে সংবাদ প্রচার হলে সংবাদপত্র অফিসে হামলা চালিয়েছে।[৪২] ১৯৯৩ ফেব্রুয়ারি মাসে *দৈনিক বাংলাবাজার* পত্রিকার অফিস তছনছ করা হয়। পুলিশ তদন্ত করে ঘটনার কোনো ক্লু খুঁজে বের করতে বা কাউকে সন্দেহভাজন বলে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়নি। পত্রিকাটি এমন কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেগুলো সরকারি দলের জন্য প্রীতিকর ছিল না, তবে ওই হামলার সাথে প্রতিবেদনের কোনো যোগসূত্রও খুঁজে বের করা যায়নি।[৪৩] ফেব্রুয়ারি মাসেই ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ নামক একটি বেসরকারি বার্তা সংস্থা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ঘোষণার আগেই বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার পর পরই ওই সংস্থার অফিসে হামলা চালানো হয়। জুন মাসে অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারীরা *মর্নিং সান* পত্রিকার অফিসে হামলা চালিয়ে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়। এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে *দৈনিক আজকের কাগজ* অফিসে বোমা হামলা চালালে তাতে পত্রিকার ৭ জন সদস্য আহত হন।

বাংলাদেশের সম্প্রচার মাধ্যমের অনেক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে। এসব সম্প্রচার মাধ্যমে বিরোধী দলের চেয়ে সরকার ও সরকারি দলের কর্মকাণ্ড ও খবরাখবরের

---

[৩৮] *তদেব।*
[৩৯] বদরুদ্দীর উমর, *বাঙলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র* (ঢাকা : সাহিত্যিকা, ২০০৩), পৃ. ২২১।
[৪০] *তদেব।*
[৪১] নজরুল ইসলাম, *আগামী দিনের বাংলাদেশ* (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ২৮৮।
[৪২] M. Rashiduzzaman, "Political Unrest and Democracy in Bangladesh", *Asian Survey*, Vo. 37, No.3 (March, 1997), p. 256.
[৪৩] মোনায়েম সরকার, *রাজনীতির চালচিত্র* (ঢাকা : নালন্দা, ২০০৮), পৃ. ৪২।

ওপর অনেক বেশি কভারেজ ও গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ আমলে বিটিভিতে সরকারের খবর এত পরিমানে প্রচার করা হয় এবং বিরোধী দলের কোনো খবর প্রচার না হওয়াতে ১৬ জুলাই বিএনপি ও জামায়াতসহ সমমনা ৭ দল দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে।[৪৪] তবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সরকারের জবাবদিহিমূলক কর্মকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ ছিল। তিনি নিজে সরাসরি বিটিভি ও অন্যান্য টিভি চ্যানেলে সাংবাদিক, জনগণ ও সিভিল সমাজের উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। বিটিভিতে জাতীয় সংসদ কার্যক্রম সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় যা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নজির হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া রেডিও-টেলিভিশনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা দু'জনেই ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। সে সময় শেখ হাসিনা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে, নির্বাচনে তাঁদের জয় হবে ও তাঁরা সরকার গঠন করবেন। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে তিনি কোনো দৃঢ় মতামত ব্যক্ত না করে অথবা প্রতিশ্রুতি না দিয়ে যা বলেছিলেন সেটা ছিল 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ধরনের ব্যাপার।

বিএনপি ইলেকট্রনিক মাধ্যমকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা বললেও ক্ষমতাসীন হয়ে তারা তাদের প্রতিশ্রুতির ধারেকাছে না গিয়ে বেতার-টেলিভিশনকে যথাসম্ভব দলীয়করণ করে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের এই দলীয়করণ আওয়ামী লীগের পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। কারণ তারা বিএনপি সরকারের আমলে এর কঠোর সমালোচনা করতো এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময়ে ওয়াদা করেছিল যে, জয়লাভ করে সরকার গঠন করলে বেতার-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বেতার-টেলিভিশনকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করেনি।

গণতান্ত্রিক শাসনে (১৯৯১-২০০১) মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় চলে যায়। ১৯৯৪ সালের সংসদ উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে সংসদ বর্জন করতে থাকে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটে। ১৯৯৫ সালেই এক আদালতে ৫০০০ হাজারের বেশি সহিংস অপরাধ মামলা, এর মধ্যে ১১০০ খুন ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মামলা হয়।[৪৫] সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা কর্তৃক প্রতি বছর গড়ে ৪১ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।[৪৬] বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রবণতা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

---

[৪৪] *দৈনিক দিনকাল*, ১৭ জুলাই ১৯৯৮।

[৪৫] G. Hossain, "Bangladesh in 1995 : Politics of Intransigence," *Asian Survey*, Vol. 36. No. 2, 1996, pp. 196-203.

[৪৬] US Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices* (Washington, DC : US Department of State, Years : 1993-1996.

চিত্র ০.২ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রবণতা (১৯৯১-২০০১) : বছরভিত্তিক

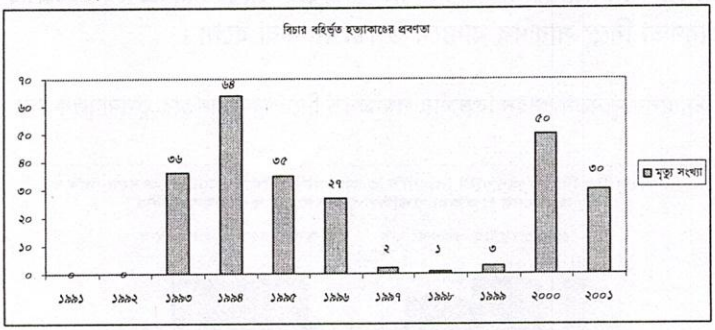

উৎস : US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices (Washington, DC : US Department of State, Various Years)

এ অবস্থা পরবর্তী সরকারে (১৯৯৬-২০০১) কিছুটা উন্নতি হয়। ১৯৯৬-২০০১ সালে কারাগারে মৃত্যুসহ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রতিবছর গড়ে ১৯ জন যা বিগত সরকারের (১৯৯১-১৯৯৬) প্রায় অর্ধস্তরে বিদ্যমান হলে রাজনৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ডের উন্নয়ন ঘটে।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জবাবহিদিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ প্রায় সমভাবেই রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জবাবদিহিতার মান ছিল খুব নিম্নমানের।

১৯৯১-১৯৯৬ সালের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিল নির্বাহী অধ্যাদেশে প্রণীত হয়। আইনবিভাগীয় প্রক্রিয়ায় খুব কম বিলই পাশ হয়। বিরোধী দলের দাবি সত্ত্বেও অনেক বিল সংসদীয় কমিটিতে প্রেরণ করা হয়নি। বস্তুত কমিটি ১৭৩টি বিলের মধ্যে মাত্র ৭টি বিল কমিটিতে যাচাই বাছাই করা হয়।[৪৭] উপনির্বাচনে কারচুপির ফলে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে রাজপথে আন্দোলনে চলে আসে। ১৯৯১-১৯৯৬ সালে পঞ্চম সংসদে বিল আকারে ৬৭% আইন প্রণয়ন সংসদীয় প্রক্রিয়ায় হয়েছে অন্যদিকে ১০০ ভাগ বিল কমিটিতে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও মাত্র ৪% বিল কমিটিতে প্রেরিত হয়েছে। আবার সপ্তম সংসদে দেখা গেছে যে ১০০ ভাগ আইন সংসদীয় প্রক্রিয়ায় পাশ না হয়ে ৯৭ ভাগ হয়েছে, তবে ১০০ ভাগ বিলই কমিটিতে প্রেরিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সপ্তম সংসদ গঠিত হলে প্রথম দেড় বছর ভালোভাবেই পরিচালিত হয়। বিএনপি ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিরোধী দল যথারীতি পূর্ববর্তী সরকারের বিরোধী দলের মতো সংসদ বর্জন করতে শুরু করে। তবে ১৯৯৬-২০০১ সালে ৯৭% বিল সংসদে পাশ হয় (অধ্যাদেশ ব্যাতীত)। এবং

[৪৭] Nizam Ahmed, "From Monopoly to Competetion : Party Politics in the Bangladesh Parliament (1973-2001)," *Pacific Affairs*, Vol. 76. No. 1. pp. 55-80.

সবগুলো বিলই সংসদীয় কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই হয়।[৪৮] রাজনৈতিক উন্নয়নের ন্যূনতম নির্দেশক প্রবণতা নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ০.৩

রাজনৈতিক উন্নয়নের ন্যূনতম আইন বিভাগীয় পদ্ধতিগত নির্দেশক প্রবণতার তুলনামূলক চিত্র : (১৯৯১-২০০১)

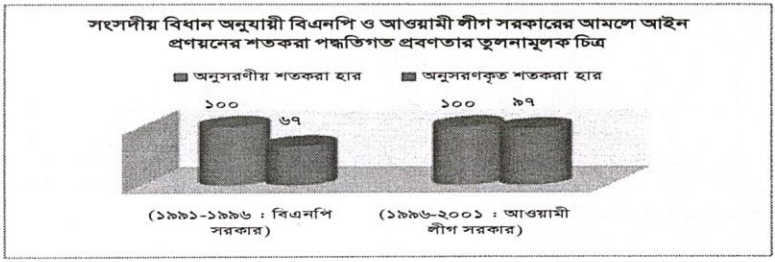

চিত্র ০.৪ : রাজনৈতিক উন্নয়নের ন্যূনতম আইন বিভাগীয় পদ্ধতিগত নির্দেশক প্রবণতার তুলনামূলক চিত্র : (১৯৯১-২০০১)

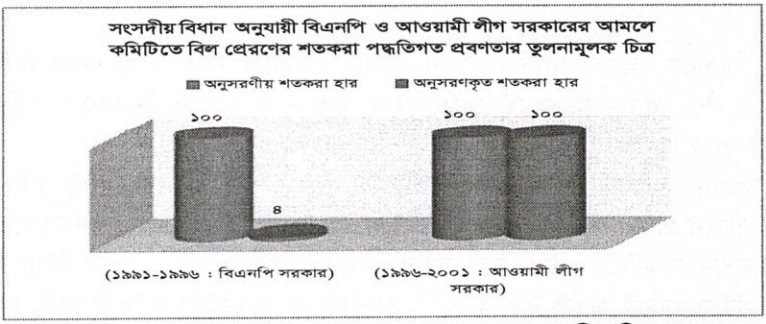

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিএনপি সরকারের তুলনায় আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রাজনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতিগত নির্দেশকের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে যা রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে আশার বাণী সঞ্চার করে। নিম্নে রাজনৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতিগত প্রবণতা সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ০.৫ : রাজনৈতিক উন্নয়নের ন্যূনতম পদ্ধতিগত নির্দেশক প্রবণতা

সরকার	নির্বাচনী পদ্ধতি	আইনবিভাগীয় পদ্ধতি	অধিকার সংক্রান্ত পদ্ধতি
১৯৯১-১৯৯৬ বিএনপ সরকার	১৯৯১ : অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন, ৬২% ভোট প্রদান ১৯৯৬ (ফেব্রু) : একদলীয় ভোট, ১০% ভোট প্রদান,	৬৭% আইন প্রণয়ন সংসদীয় প্রক্রিয়ায় ৪% বিল সংসদীয় কমিটিতে প্রেরণ	গড়ে ৪১ জন সরকারি বাহিনী কর্তৃক বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড*
১৯৯৬-২০০১ আওয়ামী লীগ	১৯৯৬ (জুন) : অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন, ৭৫% ভোট প্রদান, স্থানীয় পর্যায়ের ভোটও অবাধ, নিরপেক্ষ	৯৭% আইন প্রণয়ন সংসদীয় প্রক্রিয়ায় ১০০% বিল সংসদীয় কমিটিতে প্রেরণ	গড়ে ১৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে নিহত

[৪৮] *Ibid.*

* ১৯৯৩-১৯৯৬ সালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

৩. সিভিল সমাজের ভূমিকা

বাংলাদেশে জবাবদিহিতা, আইনশৃঙ্খলা এবং স্বচ্ছতার মতো রাজনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হয় । শাসনব্যবস্থায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রায় অনুপস্থিত এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশে নিয়মিত বিষয়। বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘদিন সামরিক শাসন (১৯৭৫-১৯৯০) থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। ১৯৯১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হতে পারেনি। সময় মতো নির্বাচন হলেও দেশ পরিচালনায় নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য উপায়ে সরকার পরিবর্তন ঘটানোই একসময় বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। গণতান্ত্রিক যাত্রার দু-দশক পার হলেও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে বিতর্কের শেষ নেই। গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়টি নিশ্চিত হলে হয়তো জনগণ স্বস্তির জায়গায় পৌঁছাতে পারতো। কিন্তু এই স্বস্তি ও ন্যায্যতার পরিবেশ সৃষ্টি ও শান্তির জন্যে যে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি-সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে সে কথাগুলো স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে সিভিল সমাজভুক্ত সংগঠনগুলো উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সিভিল সমাজ গঠনের কোনো বিকল্প নেই। ১৯৯১-২০০১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ এবং আমলাতন্ত্র মিলে যেভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করেছে তাতে জনগণের হতাশার জায়গাটি অনেক বেড়ে গেছে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম-এসবই এখন জনগণের চাহিদার পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে এনজিও এবং গণমাধ্যম এদেশে খানিকটা হলেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে । ১৯৭৫-১৯৯০ সালে নিয়ন্ত্রিতভাবে সিভিল সমাজ নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা পালন করলেও ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর সিভিল সমাজ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা শুরু করলেও পরবর্তীতে দলীয়করণের মাত্রার বাইরে আসতে পারেনি।[৪৯] তবে বাংলাদেশে এসব প্রতিষ্ঠানের চাপে এবং সরকারের কোনো কোনো অংশের ইতিবাচক ভূমিকার কারণে বেশ কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতিও হয়েছে।[৫০] বাংলাদেশে ৯০ এর গণআন্দোলনে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবহিদিহিতার ক্ষেত্রে সিভিল সমাজ অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। সরকারকেই সবসময়ই মনিটরিং ও প্রশ্নের সম্মুখীন রেখে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে।

---

[৪৯] আতিউর রহমান, "নাগরিক সমাজ ও সুশাসন"; ফকরুল চৌধুরী (সম্পা.), *সিভিল সোসাইটি : তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিচার* (ঢাকা : কথা প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১২৬-১২৭।

[৫০] Abul Haseeb Khan, "Emergence of NGOs, Civil Society and Democracy in Bangladesh" in Mufleh R. Osmani & Shaheen Afroze (edi.), in *Democracy, Governance and Security Reforms : Bangladesh Context* (Dhaka : Academic Press and Publishers Library in association with Bangladesh Institute of International and Stretegic Studies, 2008), pp. 71-90.

১৯৯১-১৯৯৬, ১৯৯৬-২০০১ সালে যথাক্রমে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সিভিল সমাজ সংগঠনগুলো রাজনৈতিক প্রভাব থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি।[৫১] এমনকি আওয়ামী লীগপন্থী ও বিএনপিপন্থী সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে এনজিওগুলো সরকারের মাধ্যমে নিবন্ধিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় অনেক এনজিও সংগঠন সংশ্লিষ্ট সরকারপন্থী সিভিল সমাজ সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয় সরকারের সময় বিএনপিপন্থী ও আওয়ামী লীগপন্থী সিভিল সমাজ হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে অনেকটাই স্পষ্ট করেছে।

ট্রেড ইউনিয়িন, কৃষক সংগঠন, নারী গোষ্ঠী, মানবাধিকার এবং পরিবেশবাদী কর্মী পেশাজীবী গোষ্ঠী, ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো ১৯৯১-১৯৯৬ এবং ১৯৯৬-২০০১ সালে যথাক্রমে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অধিক সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সিভিল সমাজের অগ্রণী ভূমিকা রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের সময় উপনির্বাচনে কারচুপি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ফলে এবং অবাধ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সিভিল সমাজ ক্রমাগত আন্দোলন অব্যাহত রাখে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জামায়াত ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং সফলও হন। সিভিল সমাজ সংগঠন ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে পরিশুদ্ধকরণে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছে। কাজেই লক্ষ্য করা যায় যে, সিভিল সমাজ যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দল ও রাজনীতি থেকে পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি।[৫২] বিশেষ করে ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে অনেক সিভিল সমাজ সংগঠনই রাজনীতির প্রভাবমুক্ত হয়নি।

মূল্যায়ন

সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রাজনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য হলেও বাস্তবিকভাবে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব, দলীয় ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সমস্যা, অকার্যকর জাতীয় সংসদ, রাজনৈতিক অচলাবস্থা, অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকার ও ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মোটামুটি সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। উভয় সরকারের সময় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে অবিশ্বাস ও

---

[৫১] Md. Sultan Mahmud and Bibi Morium, "Civil Scoiety and Political Party in Electoral Democracy: Bangladesh Perspective", *Asian Studies*, Vo. 32 (June 2013), p. 137.

[৫২] Sreeradha Datta, "Bangladesh's Political Evolution: Growing Uncertainities', *Stratagic Analysis*, Vol. 27, No. 2 (2003), p. 244.

দুরত্ব অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরোধীদলে থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে দাবি-দাওয়া বা প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেছে সরকারি দলে গিয়ে তারা সেটা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সকল দলই গণতন্ত্র রক্ষার নামে রাজনৈতিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখলেও সরকারি দল ও বিরোধী দল গণতন্ত্রের রক্ষার নামে পারস্পরিক বিরুদ্ধ বিবৃতি ও বক্তব্য দিয়েছে।

১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠিত হলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা নানা দিক থেকে বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে ১৯৯৬ সলের ১২ জুনের নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র রক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতবদ্ধ হলেও বাস্তবিকভাবে পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের অনুরূপ কার্যক্রমে লিপ্ত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি এতই নিম্নস্তরে নেমে যায় যে, সরকারপ্রধান কিংবা দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত বিষয়ে কটূক্তি করতে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা দ্বিধা করেন না। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অন্যদিকে বিএনপির নেতাকর্মীরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অশ্লীল কটূক্তি করতেও ছাড় দেননি, যা রাজনৈতিক উন্নয়নের ন্যূনতম মানদণ্ডেও বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মাধ্যমে আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়টি উভয় সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হওয়া সত্ত্বেও কোনো সরকারই তা কার্যকর অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেনি। স্বয়ং বিচারপতিরাই বিচার বিভাগের কার্যক্রম ও রায় দেয়ার স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করার প্রশ্নটি ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে জনগণের ন্যায্য দাবি হিসেবে পরিণত হলেও পরবর্তী ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারে বিরোধী দলের একই ধরনের কর্মকাণ্ড ও সরকারি দলের আচরণে সংসদ অকার্যকর হয়ে ওঠে। ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকার ও ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিরোধী দলগুলোর ওপর প্রতিপক্ষের আচরণ, সংসদ থেকে বিরোধী দলের বয়কট, ওয়াকআউট প্রভৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না বললেই চলে।

সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের জবাবদিহি করবে কিংবা দায়িত্বশীল থাকবে-কিন্তু সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদ সংযোজিত থাকায় দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি শুধু তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবেই থেকে যায়। এ অনুচ্ছেদের ফলে অর্থাৎ সংসদে ক্রসভোটিং পদ্ধতি চালু না থাকায় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব আরো অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে ঐকমত্যের সরকার গঠনের আহ্বান জানালে দু'টি রাজনৈতিক দল সরকারে যোগদান করে।

সমোঝাতার অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম সংসদ নির্বাচন ও সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালে সপ্তম সংসদ নির্বাচন রাজনৈতিক ঐকমত্যের জায়গায় পৌছালেও পরাজিত রাজনৈতিক শক্তি নির্বাচনের ফলাফল মানতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যবেক্ষকদল কর্তৃক নির্বাচনগুলো গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়। জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে

সরকারগুলো অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ সকল ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় বাধা হিসেবে কাজ করেছে। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি প্রায় সমভাবেই বিদ্যমান ছিল যা স্বচ্ছ সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়নের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সময়ই রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হিসেবে সিভিল সমাজের ভূমিকা ১৯৯১-১৯৯৬ ও ১৯৯৬-২০০১ সালে যথাক্রমে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক অবদান ও সিভিল সমাজের সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ১৯৭৫-১৯৯০ সালে নিয়ন্ত্রিতভাবে সিভিল সমাজের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করে। ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর সিভিল সমাজ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে দলীয়করণের বাইরে থেকে ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়।

কাজেই একথা খুবই সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা, জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সিভিল সমাজের ভূমিকার ক্ষেত্রে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকার যথাযথ অবস্থানে উঠতে সক্ষম হয়নি।

সুপারিশমালা

রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে রাজনৈতিক উন্নয়নকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাত্রায় পৌছাতে যে বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনায় আনা দরকার, সেগুলো হলো: ১.একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে স্বার্থান্বেষীদের বদলে সৎ ও যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন; ২. সংসদকে সত্যিকারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; ৩. গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা; ৪. অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক দল গঠন; গণতান্ত্রিক মনোনয়ন প্রক্রিয়া; ৫. দলীয় আয় ও ব্যয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি; ৬. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অযোগ্য, অদক্ষ ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং দলীয় মদদপুষ্ট বিচারকদের অপসারণ; ৭. প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন; ৮. স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসিত, শক্তিশালী ও কার্যকর করা; গণমাধ্যমের ওপর সব নিবর্তনমূলক বিধিনিষেধের অবসান ঘটিয়ে এর স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিতকরণ এবং ৯. ফায়দাতন্ত্র ও হুমকি-ধামকির অবসান ঘটিয়ে দলনিরপেক্ষ সিভিল সমাজ গড়ে ওঠার পথকে সুগম করা এবং যথাযথ রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল গোষ্ঠীর সমর্থন নিয়ে সক্রিয় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন। উল্লিখিত সুপারিশগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের পথকে সুগম করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে প্রধান দু'টি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি আন্তরিক ও অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২১, ১৪২০

বাংলায় খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার (১৫০১-১৯৪৭)

মোঃ আব্দুল হান্নান*

Abstract: Christianity is in one of the major religions of the world preached by Jesus Christ. It is a monotheistic religion with a difference introduced by Saint Paul's Doctrine of Trinity Combining the father, the son, and the Holy Spirit in one God. The source of this religion is the New Testament of Bible. The Christians are divided into three branches— Roman Catholic, Orthodox and Protestant. Their mission is the same despite the differences in structure. Their religious belief is 'Jesus is the son of God and saviour'. Various missionaries are playing an important role to preach and spread Christianity in the world. This paper aims at throwing light on the spread of Christianity in Bengal, (West Bengal in India and Bangladesh.

ভূমিকা

খ্রিস্ট ধর্ম হলো আবহমান ধারার উপর একটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম। এটি একটি ঐতিহাসিক ও বিশ্বজনীন ধর্ম। বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপরই এ ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত।[১] যিশু খ্রিস্ট এ ধর্মের প্রবর্তক। যিশু খ্রিস্টের জীবন চরিত, বাণী, নৈতিক আদর্শ ও মানবতাবোধই খ্রিস্ট ধর্মের উৎস। রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির উপর এ ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানব জাতির বিবর্তনের সঙ্গে এ ধর্ম ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কোন সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানের উপর এ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উপরই প্রতিষ্ঠিত।[২] খ্রিস্ট ধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্মে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান

---

* ড. মোঃ আব্দুল হান্নান , সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ , রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] Richard Ince, *A Dictionary of Religion and Religious* (New Delhi: Cosmo Publication, 2004), p. ৬১.

[২] Alister E. McGrath, *Christian Theology* (UK: Blackwell Publishers Inc. 2000), pp. ২৩৯-২৪২.

এবং সবকিছুর স্রষ্টা।[৩] কিন্তু সেন্ট পৌল ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট ধর্মে 'ত্রিত্ববাদ' প্রবর্তন করেন। 'পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা'– তিন সত্তার সমন্বয়ে এক ঈশ্বর।[৪] বাইবেলের নিউটেস্টামেন্ট খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় উৎস।[৫] 'পোপ' হলেন এ ধর্মের ধর্মগুরু। বিশ্বে খ্রিস্ট সম্প্রদায় প্রধান তিনটি শাখা তথা রোমান ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্ট নামে বিভক্ত। গঠনতন্ত্রে অমিল থাকলেও তাদের মিশন এক ও অভিন্ন। 'যিশু ঈশ্বরের পুত্র এবং পরিত্রাতা' এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। এককথায় খ্রিস্টীয় আদর্শ প্রচার করাই তাদের ঐশী কর্তব্য।[৬] খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে বিশ্বব্যাপি জেসুইট সংঘ, ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি, অ্যাংলিকন চার্চ, স্যালভেশন আর্মি ইত্যাদি উপসংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে বাংলায় (ভারতে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের (১৫০১-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণ বিধৃত হলো। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রবন্ধে ১৫০১ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ মিশনারিরা এশিয়া মহাদেশে বিশেষ করে বাংলায় ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে একই অভিনব ধারা ও কৌশল অবলম্বন করেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতার অভাব দেখা দিলে মিশনারিদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফলে তাঁরা ধর্ম প্রচারে বিভিন্ন কৌশল ও পন্থা অনুসরণ করেন।

খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার

খ্রিস্টধর্মের সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে এশিয়া মহাদেশে। এটি ইউরোপে পৌঁছার পূর্বে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দিতে ভারতবর্ষে আগমন করে। যিশু খ্রিস্টের অন্যতম শিষ্য সেন্ট টমাস ৫২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মালাবার উপকূলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। টমাসের ব্যক্তিত্ব, সদাচারণ, সাধারণ জীবন-যাপন এবং তাঁর মুখ নিঃসৃত যিশুর ক্ষমা ও প্রেমের বাণী, ক্রুশের উপর যিশুর আত্মোৎস্বর্গের বেদনাদায়ক ঘটনা শ্রবণ করে সহস্রাধিক হিন্দু ব্রাহ্মণসম্প্রদায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এমনকি খ্রিস্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা অবগত হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কালক্রমে সেন্ট টমাস মালাবার অঞ্চলে সাধারণ জনগণের আর্থিক সহায়তায় হিন্দু মন্দিরের আদলেই সাতটি গির্জা স্থাপন করেন।[৭] এভাবে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দিতে এডেসার বিশপ এর নেতৃত্বে কিছু

---

[৩] Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion* (Delhi: Mothilal Banarsidass, 1992), p. ১৩২.

[৪] *Ibid.*

[৫] *The world Book Encyclopedia*, Vol-2 (USA: World Book Inc, 1988), pp. ২৮২-২৮৪.

[৬] Pritibhushan Chatterji, *Studies in Comparative Religion* (Calcutta: Das Gupta Co. Private LTD, 1971), pp. ৩১৪-৩১৬.

[৭] ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য* (কলিকাতা: রূপসী বাংলা, ২০১২), পৃ. ১৩।

সিরীয় খ্রিস্টান মালাবার উপকূলে আশ্রয় নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে খ্রিস্টধর্মের প্রচার করেন। এ প্রচারাভিযান বহু শতাব্দিকাল মালাবার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষ দশকে প্রথম ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মযাজক জন মন্টি করভিনোরের নেতৃত্বে মিশনারিরা ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্মের প্রচার করেন। তবে তারা যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারেনি। এক পর্যায় ভারতে খ্রিস্টমণ্ডলী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেও খ্রিস্টধর্ম বিলুপ্ত হয়নি।[৮] ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, 'খ্রিস্টধর্ম প্রায় দেড় হাজার বছর যাবৎ ভারতে নিঃসঙ্গ হয়েও একমাত্র হিন্দুদের উদার মানসিকতা ও সহনশীল মনোভাবের কারণেই অস্তিত্ব বজায় থাকে'।[৯] অবশেষে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২৭শে মে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা মালাবার কালিকুট শহরে অভিনব কৌশলে পুনরায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার অব্যাহত রাখেন।

১৫০১-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ

ষোড়শ শতাব্দির প্রথমাংশে ইউরোপীয় বণিক তথা পর্তুগিজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও দিনেমারেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন। তন্মধ্যে পর্তুগিজ মিশনারিরাই সর্বপ্রথম বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পর্তুগিজ প্রথম রাজ প্রতিনিধি হিসেবে দোম ফ্রান্সিসকো আলমিদা ১৫০৫-১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় পাশ্চাত্য জাতির আধিপত্য বিস্তারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আল-বুকাক দ্বিতীয় রাজ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে বাংলার লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এজন্য তিনি পর্তুগিজ ও বাঙালীদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের জন্য উৎসাহ দিতেন। ফলে বাংলায় বর্ণ-সংকর ফিরিংগি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং ধর্ম প্রচারের পথ সুগম হয়। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক দশম পোপ-লিও ও পোর্তুগালের রাজার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে পর্তুগিজরা বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের একছত্র অধিকার লাভ করে।[১০]

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে প্রথম পর্তুগিজ বণিক কোয়েলহো (Coelho) চট্টগ্রামে আগমন করেন। ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে সিলভেরা (Silveira) নামে আরও একজন পর্তুগিজ বণিক বাংলার দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান রাজ্যে আগমন করেন। এই দুই বণিক প্রতিবছর গোয়া থেকে বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য যাতায়াত করতে থাকেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে দ্য মেল্লো নামে পর্তুগিজ বণিককে বাংলায় অবৈধ কার্যকলাপের জন্য দণ্ডিত হয়ে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কারাগারে দীর্ঘদিন বন্দি জীবন যাপন করতে হয়। কালক্রমে বাংলায় পর্তুগিজ বণিকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব

---

[৮] লুইস প্রভাত সরকার, *বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়* (১৫৭৬-১৯৬০), ১ম খণ্ড (কলিকাতা: প্রভু যীশু গীর্জা, ২০০২), পৃ. ৪।

[৯] *তদেব*।

[১০] লুইস প্রভাত সরকার, 'মহা প্রভুর দেশের প্রভু যিশুর দূত', *মোহনা সাময়িকী পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৬৯।

করেন। বিহারের শাসনকর্তা শের খাঁর গৌড় আক্রমনের সময় পর্তুগিজরা বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহকে সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে। ফলে মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের সহযোগিতা ও বন্ধুত্বমূলক আচরনে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করার অনুমতি দেন। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে পর্তুগিজরা বসতি স্থাপন করে এবং তথায় দুইটি পর্তুগিজ উপনিবেশ গড়ে তোলে। উপনিবেশদ্বয়ে মিশনারিরা খ্রিস্টধর্মের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বাংলায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। মিশনারি কর্মকে আরও গতিশীল করার জন্য বিশিষ্ট ধর্মযাজক ফাদার জুলিয়ানো পেরেইরাকে গোয়ার বিশপের ভিকার জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে গোয়া ধর্ম প্রদেশকে কোচিন ও মালাক্কায় দু'টি ধর্ম প্রদেশ গঠন করা হয়। ফলে বাংলার মিশনক্ষেত্রকে কোচিন ধর্ম প্রদেশের অন্তভুর্ক্ত করা হয়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে কোচিনের বিশপ বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ লক্ষ্যে তিনি দুইজন কতর্ব্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ন জেসুইট ক্যাথলিক ধর্মযাজক ফাদার আন্তনি-ভাজ ও ফাদার পেদ্রো ডায়াসকে বাংলায় প্রেরণ করেন।[১১]

এমতাবস্থায় আরাকানরা চট্টগ্রাম বন্দর অধিকার করলে পর্তুগিজরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পর্তুগিজ ক্যাপটেন পোদ্রো তাভারেজ হুগলিতে একটি স্থায়ী বন্দর নির্মাণের আবেদন পত্র নিয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের (১৫৫৫-১৬০৫) ফতেহপুর সিক্রির রাজদরবারে উপস্থিত হন। পৌর্তুগিজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের লক্ষ্যে সম্রাট আকবর বন্দর নির্মাণের জন্য ক্যাপটেন তাভারেজকে লিখিত অনুমতি পত্র দেন। পত্রের বিষয়বস্তু হলো- 'অতঃপর ক্যাপটেন তাভারেজ হুগলিতে বন্দর নির্মান করতে পারবেন। হুগলির সন্নিহিত অঞ্চল অধিগ্রহণ করতে পারবেন।...বাংলায় মিশনারিগণ খ্রিস্টধর্ম প্রচার, গির্জা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে পারবেন এবং যে সমস্ত ভারতীয় খ্রিস্টীয় সুসমাচার এবং খ্রিস্টধর্মের বিধানসমূহ মান্য করে চলার আগ্রহ প্রকাশ করবে, তাদের নির্দ্বিধায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারবেন।'[১২] এরূপ ধর্মীয় উদার নীতির ফলে খ্রিস্ট ধর্মযাজকরা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁকে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। ফলে বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারির কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন স্থানে গির্জা ও খ্রিস্টীয়মণ্ডলী স্থাপনের পথ সুগম হয়। এক পর্যায়ে ধর্মযাজকগণ ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরকেও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পদক্ষেপ নেন, যদিও তা সফল হয়নি।[১৩]

১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে ৩রা মে ফাদার ফার্নাদেজ ও ডোমিঙ্গ সোমা ভারতের কোচিন থেকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন। তারা বাংলাদেশের বৃহত্তম পর্তুগিজ পল্লী চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে কোচিন থেকে প্রথমে হুগলিতে পৌঁছেন। হুগলিতে অবস্থানের পর

---

[১১] *তদেব; বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ১৫-১৬।

[১২] *মোহনা সাময়িকী পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ৬৯।

[১৩] *বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬।

১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর ফাদারগণ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম ব্যান্ডেলের পথে যাত্রা করেন। যাত্রা পথে তারা যশোর রাজ্যে উপস্থিত হন। এ সময় যশোরের রাজা ছিলেন বার ভূঁইয়া নামে খ্যাত প্রভাবশালী রাজা প্রতাপাদিত্য। সেনাবাহিনীর চাকরি অথবা ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে বহু পর্তুগিজ তৎকালীন যশোর রাজ্যে বসবাস করত। তাদের দ্বারা ধর্মান্তরিত কিছু দেশীয় খ্রিস্টানও ব্যান্ডেলগুলোতে অবস্থান করত। এ সমস্ত পর্তুগিজদের নেতৃত্বে বাংলায় তথা যশোর অঞ্চলে সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কার্যক্রম শুরু হয়।[১৪]

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আমন্ত্রণ পেয়ে গোয়া থেকে ফাদার সোমা, ফাদার ফনসেকা ও ফাদার ফার্ণান্দেজ নামক তিনজন জেসুইট পুরোহিত যশোর রাজ্যে আগমন করেন। যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল চাঁদেকান, যা বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলার ৫০ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন সংলগ্ন প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত দুর্গ নগরীর ধ্বংসাবশেষ 'ঈশ্বরীপুর' নামে পরিচিত।[১৫] যেভাবেই হোক ফাদারগণ ঈশ্বরীপুর তথা চাঁদেকানে আগমন করেন এবং রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন। রাজা প্রতাপাদিত্য খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দান করেন। ফাদার ফার্ণান্দেজ ও ডোমিঙ্গ সোমা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই যশোর রাজ্যে প্রায় দুইশত জনকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।[১৬] অতপর ডোমিঙ্গ সোমাকে চাঁদেকানে রেখে ফাদার ফার্ণান্দেজ পুনরায় চট্টগ্রাম ব্যাণ্ডেলে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি অপর সহকর্মী ফাদার ফনসেকাকে অর্পিত দায়িত্ব নির্বাহের জন্য যশোর রাজ্যে প্রেরণ করেন। তিনি ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে নভেম্বর চাঁদেকানে উপস্থিত হয়ে ফাদার ডোমিঙ্গ সোমার সঙ্গে দেখা করেন এবং একটি খ্রিস্টীয় উপাসনালয় নির্মাণের অভিপ্রায় নিয়ে দুজনে রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। রাজা তাদের ইচ্ছা পূরনের জন্য জমি ও অর্থ দান করেন। রাজার পৃষ্টপোষকতা ও স্থানীয় পর্তুগিজদের আর্থিক সহযোগিতায় চাঁদেকানে তথা ঈশ্বরীপুরে জেসুইট ফাদারগণ একটি সুদৃশ্য গির্জা নির্মাণ করেন। এই গির্জার নামকরণ হয় 'যিশুর গির্জা' (Church of Jesus)। বাংলায় এটিই জেসুইটদের নির্মিত প্রথম গির্জা।[১৭]

১৬০১-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কোচিনের বিশপ জেসুইটদের সহযোগী হিসেবে কয়েকজন ডমিনিকান মিশনারি খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ফাদার গ্যাসপর দ্য আসামসাঁও, ফাদার মেলকিওর দ্য লুজ, ফাদার জন দ্য চাগস, ফাদার মানুয়েল দ্য গামা, ফাদার ফ্রান্সিস আভেলার এবং ফাদার গ্যাসপার দ্য আন্দ্রায়েত প্রমুখ। তাঁরা ১৬০১-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায়

---

[১৪] *তদেব*, পৃ. ২৬।

[১৫] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলিকাতা: দেজ পাবলিশিং হাউস, ২০০১), পৃ. ৭০০; হোসেন উদ্দীন হোসেন, *যশোরাদা দেশ* (ঢাকা: বুক সোসাইটি, ১৯৭৪), পৃ. ২৫।

[১৬] *Encyclopedia of Britanica*, vol- 19 (Scotland: Society of Gentleman, 1987), p. ১০৮; *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২০।

[১৭] *তদেব*।

অবস্থান করেন এবং দিয়াঙ্গা নামক স্থানে ধর্মীয় প্রধান কার্যালয় ও গির্জা স্থাপন করেন। অতঃপর ফাদার ফার্ণান্দেজ নবাগত ডমিনিকান মিশনারিদেরকে সন্দীপে প্রেরণ করেন। সেখানে তারা একটি গির্জা নির্মাণ করেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। একপর্যায়ে প্রচারাভিযান যখন সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সন্দীপে গির্জার উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। সন্দীপ দ্বীপকে কেন্দ্র করে পর্তুগিজ ও আরাকানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলার প্রথম ফাদার ফার্ণান্দেজ মৃতুবরণ করেন। ফলে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম, দিয়াঙ্গা, সন্দীপ ও চাঁদেকানে জেসুইট মিশনারিদের গির্জাসমূহ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।[১৮]

১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি পোপ পঞ্চম পল এর নির্দেশে পুনরায় আগস্টিন মিশনারিরা শ্রীপুর থেকে ক্রমান্বয়ে ঢাকা, নারিকুল, কাত্রাবু প্রভৃতিস্থানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তারা উক্ত স্থানসমূহে গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ফলে বাংলায় খ্রিস্টমণ্ডলীর এক গৌরবময় সোনালী অধ্যায়ের সূচনা হয়।[১৯]

১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গিরের তৃতীয় পুত্র সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.) দিল্লির মোঘল সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলিম এবং খ্রিস্টধর্মের প্রতি চরম বিদ্বেষী। বাংলায় যেন কোনক্রমেই খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করতে না পারে, সেজন্য তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান মোঘল বাহিনীকে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। দীর্ঘ তিনমাস যুদ্ধের পর পর্তুগিজরা পরাজিত হয় এবং অনেক মিশনারি মিশন ও গির্জা ধুলিসাৎ হয়। যুদ্ধে চারজন আগস্টিন মিশনারি, তিনজন জেসুইট মিশনারি, সাতজন ফাদারসহ সহস্রাধিক খ্রিস্টানকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।[২০] ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহাজাহান বাংলায় নিজের আধিপত্য ও ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার স্বার্থে হঠাৎ এক অভূতপূর্ব নাটকের আবতারণা করেন। তিনি অনুভব করেন যে, খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা আর কখনই মোঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। তাই তিনি বন্দি পর্তুগিজদের মুক্তি দিয়ে মিশনের প্রধান ফাদারকে শর্তসাপেক্ষে নজিরবিহীন ক্ষমতা প্রদান করেন। তাহলো ক. ব্যান্ডেল মিশন সংলগ্ন ৭৭৭ বিঘা জমি ব্যান্ডেল মিশনের খাস জমি হিসেবে গণ্য হবে। এ জমিতে মোঘল দরবারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। খ. কোন মুসলমান রাজকর্মচারী খ্রিস্টীয় ধর্ম উপাসনায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। গ. কেবলমাত্র নর হত্যা ছাড়া অপরাধমূলক কাজের বিচার ও শাস্তির বিধান করতে পারবে।[২১]

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ধর্মযাজকগণ বাংলার সুবাদারের সমকক্ষ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পাওয়ার পর পুনরায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসার করতে থাকেন। তারা বাংলায় বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও গির্জা নির্মাণ করেন। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে মিশনারিযাজকগণ ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আরও

---

[১৮] *মোহনা সাময়িকী পত্রিকা*, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ৬৪।

[১৯] *তদেব*, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ৬৯।

[২০] *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৩-২৪; *বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬।

[২১] *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৫

ব্যাপকভাবে প্রসারের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারা আগিস্টন মিশন কর্তৃক হুগলি, ঢাকা, নারিকূল, চন্ডীপুর, বাঞ্ছা, পিপলি, যশোর, খিজলী, চট্টগ্রাম, তেজগাঁ ইত্যাদি স্থানে ১৩টি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে দোম আন্তনিও এর মিশন একসংগে ত্রিশ হাজার লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দোম আন্তনিও অনুভব করেন যে, বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলা ভাষা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য তিনি ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।[২৩]

১৭০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ

পর্তুগিজ মিশনারিরা সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। তারা বাংলা ভাষা আয়ত্ব করে সমাজে ধর্ম প্রচারের জন্য কতিপয় খ্রিস্টীয় পুস্তিকা রচনা করেন। সে গুলো মুদ্রণের অভাবে কালের আর্বতে বিলীন হয়ে যায়। তবে ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম জেসুইট ধর্মযাজকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[২৪] ১৭১২-১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আন্তনিও ক্লোদিয়াস বারবিয়ার এর নেতৃত্বে ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলায় আগমন করেন। তিনিই একমাত্র দোভাষীর সাহায্যে বাংলা ভাষা আয়ত্ব করেন এবং খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে আগস্টিন মিশনারিরাও বাংলা ভাষায় ধর্মীয় পুস্তিকা রচনা করে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের পথ অব্যাহত রাখেন। এভাবে পোর্তুগিজ ক্যাথলিক মিশনারিরাও ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা পুস্তিকা প্রণয়ন করে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন।[২৫] তন্মধ্যে মানো-এল-দা-আসসুম্পসাঁও-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে বাংলা ভাষার পুস্তিকা রচনা করেন।[২৬]

বাংলায় ক্যাথলিক মিশনারিদের ধর্মীয় প্রচারাভিযান ক্রমান্বয়ে যখন দূর্বল হয়ে পড়ে; তখন প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। জার্মানির মার্টিন লুথারের (১৪৮৩-১৫৪৬) নেতৃত্বে প্রোটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী ধর্মমতের উদ্ভব হয়। তিনি ক্যাথলিক চার্চের একজন দার্শনিক, শাস্ত্রজ্ঞানী ও বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি তৎকালীন ভোগবাদী যাজকদের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হন। সমাজের প্রধান ধর্মগুরু ও পোপগণ মার্টিন লুথারকে এ প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ দেন। কিন্তু মার্টিন লুথার তাদের আদেশ অমান্য করে নিজস্ব বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, পোপের ব্যক্তিগত কোন মতবাদ খ্রিস্টীয় মিশন

---

[২২] *মোহনা সাময়িকী পত্রিকা*, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ৮৯।

[২৩] *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৬।

[২৪] রেভারেন্ড জে.পি. মিস্ত্রী, *কলকাতার ক্রমবিকাশ ও খ্রিস্ট সমাজ* (কলিকাতা: বঙ্গীয় ঈশতাত্ত্বিক সাহিত্য সমিতি, ১৯৯৪), পৃ. ২।

[২৫] *তদেব*, পৃ. ১৬-১৭; অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৫ম খণ্ড (কলিকাতা: মর্ডান বুক এজেন্সি, ১৯৮৫), পৃ. ১৫৮-১৬০।

[২৬] প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত, *বাংলাদেশ খ্রিস্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস* (চাঁদপুর: খ্রিস্টিয়ান লিটারেচার সেন্টার, ১৯৮৫), পৃ. ১৫।

পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। একমাত্র ধর্মসভায় সিদ্ধান্তগুলো শুধু পোপ কার্যকর করবেন। মার্টিন লুথারের ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব সমন্বিত মতবাদই প্রোটেস্ট্যান্ট মিশন।[২৭] তারা ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য। তন্মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশনারির সোসাইটি (B.M.S. ১৭৯২), চার্চ মিশনারি সোসাইটি (C.M.S. ১৭৮৩), লন্ডন মিশনারি সোসাইটি (L.M.S. ১৭৯৫), ওয়েসলিয়ান মেন্থোডিস মিশনারি সোসাইটি (W.M.M.S. ১৭৩৮) উল্লেখযোগ্য। বাংলায় আগত প্রোটেস্ট্যান্ট সদস্যের মধ্যে একমাত্র C.M.S.-এর সদস্যরা এ্যাংলিকান চার্চের অনুমোদিত সদস্য। অন্যান্য সম্প্রদায় এ্যাংলিকান চার্চের প্রতিবাদী সদস্য।[২৮]

প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারি যাজক রেভারেন্ড জন জাকারিয়া কিরানদার ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলায় খ্রিস্ট বাণী প্রচারের জন্য আসেন। তিনি সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে নিজস্ব অর্থব্যয়ে পশ্চিম বাংলায় 'ওল্ড মেশন চার্চ' নামে প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা নির্মাণ করেন। আর এখানেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। রেভারেন্ড কিরানদারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ধর্মযাজকেরা বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।[২৯] পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড লাট্টোর, রেভারেন্ড রাবস ও রেভারেন্ড স্মিথ তিন ধর্মযাজককে বাংলায় প্রেরণ করা হয়। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজের শল্য চিকিৎসক হিসেবে জন টমাস (১৭৫৬-১৮০১) কে বাংলায় প্রেরণ করা হয়। তিনি ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ১লা নভেম্বর বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে ইউরোপীয় সমাজের সহযোগিতার জন্য একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। চার্লস গ্রান্ট, ইউলিয়াম চেম্বার্স, ডেভিড ব্রাউন ও জর্জ উডনীসহ অনেকেই সহযোগিতার আশ্বাস দেন।[৩০] ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন টমাস বাংলায় খ্রিস্ট বাণী প্রচারের জন্য বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের প্রস্তাব দেন। ব্যাপ্টিস্টদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে মিশনারি তৎপরতা চালাতে থাকেন। এসময় ইউলিয়াম কেরি, রেভারেন্ড এন্ড্রু ফুলার, রেভারেন্ড জন রাইল্যান্ড, রেভারেন্ড স্যামুয়েল প্রমুখ খ্রিস্ট ভক্তদের প্রচেষ্টায় বৃটিশ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির জন্ম হয়। তাঁদের প্রথম দুইজন মিশনারি ইউলিয়াম কেরি ও জন টমাস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারে তাঁদের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।[৩১]

---

[২৭] *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৩; *মোহনা সাময়িকী পত্রিকা*, ৭ম সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৩-৬৪।

[২৮] Kanti Prasenna Sen Gupta, *The Christian Missionaries in Bengal* 1793-1833 (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1971), pp. ৯-১৪.

[২৯] *বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়*, পৃ. ৯২।

[৩০] *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩২।

[৩১] ফাদার এম.সি. চক্রবর্তী, *ভারতে খ্রিষ্টের বাণী প্রচারক* (কলিকাতা: ক্যালকাটা খ্রিষ্টিয়ান এন্ড বুক সোসাইটি, ১৯৫৯), পৃ. ৯১; ড. সুনীল লাহিড়ি, *গ্রাম শহর মহানগর কলকাতা* (কলিকাতা: গ্রেট বেঙ্গল, ২০০০), পৃ. ১৫।

১৮০১-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ

উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে রেভারেন্ড ইউলিয়াম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) নেতৃত্বে যশুয়া মর্শিম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭ খ্রি.) ও ইউলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩ খ্রি.) বাংলায় প্রথম সংঘঠিত খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য গঠনমূলক শিক্ষা প্রদান, ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণয়ন ও ইনস্টিটিউটসমূহ গড়ে তোলেন। তাঁরা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান-অখ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলা, বিজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এটি খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।[৩২] উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষায় প্রথম 'বাইবেল' অনুবাদ করেন। তাছাড়া মিশনারিরা বাংলায় ধর্মপ্রচারের জন্য বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে দিক দর্শন (১৮১৮), সমাচার দর্পন (১৮১৮), গসপেল ম্যাগাজিন (১৮১৯), খ্রিস্টের রাজ্য বৃদ্ধি (১৮২২), উপদেশ (১৮৪৭), সত্য প্রদীপ (১৮৫০), সাপ্তাহিক সংবাদ (১৮৫৮), খ্রীষ্টিয় মহিলা (১৮৮১), বঙ্গবন্ধু (১৮৮২) ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।[৩৩] আর এ সমস্ত পত্রিকাসমূহ খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৮২০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড বাংলায় নারীদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ইংরেজ নারীদের অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথম নারী ধর্ম প্রচারক মিস কেরী অ্যান কুক ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি সোসাইটির সাহায্যে কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৩০০ ছাত্রী নিয়ে ১৫টি ধর্মীয় স্কুল স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরাও এ ধরনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩৪] ১৮২৩-১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশনারিরা ব্যাপকহারে বাংলায় তথা বহরমপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে মেয়েদের স্বতন্ত্র স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম প্রচারকদের স্ত্রীগণ সাধারণত তাঁদের নিজ নিজ ধর্মপ্রচার আবাসস্থলে স্কুল কলেজগুলোর দায়িত্বভারও গ্রহণ করেন। এখানকার পাঠ্যক্রম ছেলেদের স্কুলের পাঠ্যক্রমের অনুরূপ ছিল। স্কুল-কলেজসমূহে মেয়েদের সাফল্য নগন্য হওয়ায় ধর্ম প্রচারকগণ বোডিং স্কুলের উপর অধিক মনোযোগ দেন। এ স্কুলসমূহে অসহায় অনাথ ও নিঃস্ব মেয়েদের আশ্রয় ও খাদ্য প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলায় নিম্ন শ্রেণী লোকদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতকরণে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে। তাই আধুনিক বাংলার উন্নয়নে খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের ভাষাভিত্তিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁরা মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে, একমাত্র খ্রিস্টধর্মে মুক্তির পথ নিহিত। যদিও এ ক্ষেত্রে তাঁরা তেমন উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করতে পারেননি।[৩৫] ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলায় ধর্মীয় মিশন স্থাপন করা সত্ত্বেও তিন হাজারের বেশি লোককে ধর্মান্তরিত করতে পারেনি। তাদের ধর্মান্তর প্রক্রিয়া পরিবার ও সমাজ থেকে বহিস্কার এবং গ্রামে জমিদারদের বিরোধিতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়।

---

[৩২] *Banglapedia*, vol-4 (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003), pp. ৫১-৫২.

[৩৩] *ওনরফ*, ঢ়ঢ়. ৫২-৫৩; *বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ১৫২-১৫৪।

[৩৪] *Christian Missionaries in Bengal*, pp. ৩৮-৪১.

[৩৫] *Bangladepedia*, vol-4, pp. ৫৩-৫৫.

কারণ মিশনারি কর্তৃক খ্রিস্ট ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চলমান থাকলে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও জমিদারদের সমাজে নিম্নশ্রেণী লোকদের উপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ক্ষুন্ন হতে পারে। অপরদিকে বরিশাল অঞ্চলে ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় বেশ সাফল্য লাভ করেন। সেখানে নম:শূদ্র সম্প্রদায়ের ৪২৭৮ জন লোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।[৩৬]

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক মিশনারিরাও বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারকে তরান্বিত করেন। ইতোমধ্যে ইতালী থেকে আরও চারজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক বাংলায় আগমণ করেন। ফাদার মারিয়েত্তি যশোরে ধর্ম প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে যশোর অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া করে ক্যাথলিক মিশনের সূচনা করেন। তখন যশোরে নীলকরদের বেশ প্রভাব ছিল। মারিয়েত্তি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্মিথ নামক নীলকরদের নিকট থেকে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে একটি কুঠিবাড়ি ক্রয় করে তা উপাসনালয় ও বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৭ই আগস্ট তিনি কয়েকজনকে ক্যাথলিক মন্ডলীভূক্ত করেন এবং তাদের সন্তানদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এটি যশোরের মিশনস্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে। দুঃস্থ ও হত দরিদ্র লোকজন অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণে কুণ্ঠবোধ করেননি।[৩৭] অতঃপর ফাদার মারিয়েত্তির আহ্বানে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই মে ইতালী থেকে আরও তিনজন ক্যাথলিক মহিলা ধর্মযাজক তথা সিস্টার আর্গেরীটা বেল্লাসিনী, সিস্টার অগস্তিনা বিগো ও সিস্টার ব্রিজিদা জানেল্লা যশোর অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁরা যশোরের দুঃস্থ, দরিদ্র, বিধবা নারী ও এতিম বালিকাদের সেবাদানের মাধ্যমে যিশুর প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি তারা জেনানা পদ্ধতিতে (অন্যের গৃহে যেয়ে খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা প্রদান) খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ফলে এ পদ্ধতিতে বাংলায় অধিকাংশ দরিদ্র নারী খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়।[৩৮]

খ্রিস্টধর্ম ও বাংলায় ধর্মসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধর্মযাজকগণ ইসলামের অনুসারীদের প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হন। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হিসেবে মুসলমানগণ খ্রিস্টধর্মে 'ত্রিত্ববাদ' মতবাদকে গ্রহণ করেনি। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি প্রেস থেকে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে আপত্তিকর সংবাদ প্রচার করলে তা মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। শ্রীরামপুর ত্রয়ী এ প্রকাশনাটিকে একটি অবিবেচনা প্রসূত কাজ বলে রায় দেয়। ফলে মুসলমানদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে যাজকগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন।[৩৯] এমনিভাবে যশোর অঞ্চলেও মিশনারিদের কার্যক্রম ও প্রচারণা সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ 'আল-কুরআন' সম্পর্কে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পাদ্রী জন জমির উদ্দীন আপত্তিকর প্রশ্ন উপথাপন করলে মুসলমানগণ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তা খণ্ডন করেন। এমনকি তারা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। আর এ ক্ষেত্রে মুন্সী মেহেরুল্লাহ সাহসী ও বলিষ্ট ভূমিকা পালন

---

[৩৬] *Ibid.*

[৩৭] *Ibid,* pp. ৫৪-৫৬

[৩৮] *ওনরফ.*

[৩৯] M. Mohar Ali, *The Bengali Reaction of Christian Missionary Activities (1833-1857)* (Chittagong: 1965), pp. ৮১-৮৫.

করেন। তিনি জন জমির উদ্দীনের সহিত বাকযুদ্ধে লিপ্ত হন। বাকযুদ্ধে জন জমির উদ্দীন আত্মসমর্পণ করেন এবং খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে মুন্সী মেহেরুল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৪০] ফলে যশোর অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার বেশ সংকটের মধ্যে নিপতিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে ধর্মযাজকগণ বাংলায় উপজাতিদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পদক্ষেপ নেন। তাঁরা সর্বপ্রথম সাঁওতালদের আর্থ-সামাজকি অবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এরপর উপজাতিদের ধর্মান্তরিতকরণের প্রক্রিয়া হিসেবে চার্চ মিশন সোসাইটি ও ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি নামে দু'টি প্রচার সমিতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। চার্চ মিশন সোসাইটির পরিচালক ই, ডিয়োয়েস ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার কাজ আরম্ভ করেন। ফলে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালরা মিশনারিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দমনের নতুন পরিকল্পনা হিসেবে চার্চ মিশন সোসাইটি ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে একটি স্বতন্ত্র সাঁওতাল মিশন প্রতিষ্ঠা করে। সাঁওতাল মাঝিদের সহযোগিতায় ই.এল পাক্সলি কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাঁওতালীকরনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাক্সলি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল ভাষায় বাইবেলের ইতিহাস, সেইন্ট ম্যাথিউর উপদেশবলি ও গির্জার ব্যবহৃত প্রার্থনা পুস্তক রচনা করেন। তিনি ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালদের শিক্ষিত জাতি হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৩৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এগুলো খ্রিস্টান ধর্মের দিকে চালিত করার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৭১-১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মযাজকগণ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে খেরওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফলে সাঁওতালরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়।[৪১]

১৯০১-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

বিংশ শতাব্দিতে বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসার চরম বিকাশ লাভ করে। ধর্মীয় গির্জাসমূহ নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে। তাই এ শতাব্দিকে 'ধর্মপ্রচারকাজে বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সামাজিক কল্যাণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও শিক্ষাদানের পুরাতন পদ্ধতিসমূহকে প্রতিস্থাপিত করে। মিশনারিরা অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সমূহের প্রতি অধিক যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের নতুন ধারাসমূহকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণের ভিন্ন উপায় হিসেবে চিন্তা করতে শুরু করে। 'ধ্বংস সাধন নয়, বরং প্রতিপালন করা' এ ঐশ্বরিক নির্দেশ তাঁদের নীতিবাক্যে পরিণত হয়। ইউরোপ কেন্দ্রিক অভিমত পরিত্যাগ করে তাঁরা আন্তর্জাতিক, আন্তঃগোত্রীয় ও আন্তঃসম্প্রদায়গত গির্জা গঠনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মিশনারিরা যিশুর সুসমাচার প্রচার কার্যে অনড় থাকেন। তারা নতুন নতুন মণ্ডলী স্থাপন করে অবহেলিত মানুষের মধ্যে যিশুর বাণী পৌঁছাতে থাকেন।[৪২]

---

[৪০] নাসির হেলাল, *মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচনাবলী* (ঢাকা: মেসহেরুল্লাহ ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯), পৃ. ৫২-৬৩।

[৪১] *Bangladepedia*, vol-4, pp. ৫৪-৫৬.

[৪২] *Ibid.*

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে ইংরেজ সরকারী কর্মকর্তারা চলে যান। কিন্তু ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তানের সর্বত্র ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ শাসনামলে দু'শো বছরে যে পরিমাণ মানুষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, বরং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্বপাকিস্থানে ২৫ বছরে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ খ্রিস্টান হয়েছিল।[৪৩] সে সময়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেও ব্যাপকবাবে মিশনারি তৎপরতা অব্যাহত ছিল। আর এ ক্ষেত্রে পাকিস্থান সরকার মিশনারি কর্মকাণ্ডে কোন প্রকার বাঁধা প্রদান করেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্থানে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান দেশগুলো দুস্থ মানবতার সেবার নামে বিভিন্ন মিশনারি সংস্থা পাঠায়। এ সমস্ত মিশনারি মূলত অনুন্নত ও অনগ্রসর এলাকাগুলোতে আস্তানা গড়ে তোলে। তারা পাবর্ত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মগ, পাঙ্খোরা, বম, টিপরা, ময়মনসিংহে গারো, হাজং, রাজবংশী, কোচ, রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাঁও, রাজবংশী, সিলেটে মনিপুরী, খাসিয়া, বরিশাল, যশোর, খুলনা ও রংপুরে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ শুরু করে। এ সমস্ত এলাকায় মিশনারিরা দাতব্য চিকিৎসালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং পাশাপাশি গির্জা স্থাপন করে প্রচার ও প্রসারে আত্ম নিয়োগ করে। ফলে অনুন্নত এলাকায় অশিক্ষিত ও অবহেলিত জনসাধারণে অজ্ঞতা ও আর্থিক অনটনের কারণে বহুলোক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়।[৪৪]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলায় বসবাসরত সকল ধর্মের লোকদের নিকট যিশু খ্রিস্টের অমিয় বাণী পৌঁছে দেয়ায় ছিল পাশ্চাত্য খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রধান কাজ। তাঁরা অভিনব কৌশলে বিভিন্ন সেবা ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অসহায় ও দুস্থ নর-নারীদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। এ জন্য তাঁদের অনেক কষ্ট, বাঁধা ও বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। মিশনারিরা বাংলার মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অতিসহজেই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়। আর এ ক্ষেত্রে খ্রিস্ট ধর্মযাজক জন টমাস, রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওর্য়াড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

---

[৪৩] এবনে গোলাম সামাদ, *রাজশাহীর ইতিবৃত্ত* (রাজশাহী: ১৯৯৯), পৃ. ১৯।

[৪৪] এ.বি.এম. নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারীদের তৎপরতা* (ঢাকা: কাউন্সিল ফর ইসলামিক সোসিওকালচারাল অর্গানাইজেশন্স, ১৯৮৫), পৃ. ১১।

IBS Publications

1976 The *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,*
i) English volums.1–33 (1976–2010) and
ii) Bangla volums 1–18 (1993–2011)

1977 David Kopf & S. Joarder, eds. *Reflections on Bengal Renaissance* (Seminar Volume 1).

১৯৭৯ এম.এস. কোরেশী, সম্পা. *ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য* (সেমিনার ভলিউম ৩).

1981 Enayetur Rahim. *Provincial Autonomy in Bengal (1937–1943).*

1981 M.K.U.Molla. *The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905–1911).*

1981 S.A.Akanda, ed. *Studies in Modern Bengal* (Seminar Volume 2).

1983 S.A.Akanda, ed. *The District of Rajshahi : Its Past and Present* (Seminar Volume 4).

1984 M.S. Qureshi, ed. *Tribal Cultures in Bangladesh* (Seminar Volume 5).

১৯৮৫ আমানুলাহ আহমদ। *বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা* (সেমিনার ভলিউম ৬).

1991 Abdul Karim. *History of Bengal : Mughal Period,* Vol 1.

1991 S.A.Akanda & M. Aminul Islam. *Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh.* (Seminar Volume 8).

১৯৯১ এস.এ. আকন্দ, সম্পা.। *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (সেমিনার ভলিউম ৭).

১৯৯২ আবদুল করিম। বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড।

1993 Md. Shahjahan Rarhi. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An Up-to-date Index.*

1995 Abdul Karim. *History of Bengal : Mughal Period,* Vol 2.

১৯৯৭ এম.এস. কোরেশী, সম্পা.। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা* (সেমিনার ভলিউম ৯)।

2002 Md. Shahjahan Rarhi. *Research Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses.*

2004 Pritikumar Mitra & Jakir Hossain (eds.). *Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm.*

2004 The Institute of Bangladesh Studies: An Introduction.

২০০৯ মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা.। *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ*

২০১০ মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা.। *বিশ শতকের বাংলা* (সেমিনার ভলিউম ১০)

2010 Md. Shahjahan Rarhi. *Annotated Bibliography of PhD Theses: Produced in the Institute of Bangladesh Studies, 1976–2010.*

2010 Md. Shahjahan Rarhi. *Index to the Journal of The Institute of Bangladesh Studies: Volume 1-32 (1976-2009)*

2011 Shahanara Husain. *Hisrtory of Ancient Bengal: Selected Essays on State, Society and Culture*

২০১২ মো. মাহবুবর রহমান, সম্পা. *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান,* ১ম খণ্ড

২০১২ মো. মাহবুবর রহমান, সম্পা. *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান,* ২য় খণ্ড

২০১২ শাহানারা হোসেন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*

২০, ১৪১৯ সংখ্যার সূচিপত্র

এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম	মাঝোপাড়া মসজিদ : একটি অপ্রকাশিত প্রত্নসম্পদ	৭
মো. জাহাঙ্গীর আলম	মহাস্থানগড়: বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গ	১৯
মোঃ সামছল আলম	পাবনার তাড়াশ জমিদার বংশ : উদ্ভব ও বিকাশ ১৫৫১-১৯৫০	৩১
নূরুল ইসলাম	বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার কৃষক সমাজের গঠন	৪৯
মোঃ আবদুল মজিদ	অনীক মাহমুদের কবিতা: আখ্যানের কথকতা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার	৭৩
এ. এস. এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া	রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে দার্শনিক উপাদান : প্রসঙ্গ দ্বৈতবাদ শিক্ষাতত্ত্ব ও বিকল্প অধুনিকতা	৮৭
আবেদা আফরোজা	বেগম রোকেয়া : জাতীয় জীবনের দুঃসময়ের একান্ত সঙ্গী	১০৫
মোঃ শহীদুল ইসলাম	বাংলাদেশে বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কিশোর অপরাধের ধরন : রাজশাহী মহানগরীতে পরিচালিত একটি সমীক্ষা	১১৭
ইকবাল হুসাইন	মাজারকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকাচার	১৩৩
এম. জাহাঙ্গীর কবির	বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট : বাজার প্রতিযোগিতা কাঠামো ও ভোক্তা আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান	১৫৫
আবু রাসেল মুহাঃ রিপন	গ্রামীণ গৃহস্থালিতে পশুসম্পদের ভূমিকা : একটি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান	১৬৭
মোঃ ফারুক হোসাইন মোঃ আখতার হোসেন মজুমদার	বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক চিত্র : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেক্ষিত	১৮৩
এস. এম. ফারুক হোসাইন	বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনায় নির্দেশকের শিল্পভাবনা	২০৩
শেখর মণ্ডল	বাংলা সঙ্গীতে স্বর ব্যবস্থা	২০৬